
অনীশ দেব
boidownload24.blogspot.com



ভ্যাম্পায়ারটার মুখ লম্বাটে। সারা গা ফ্যাকাশে সাদা। চোখ আর ঠোঁট লাল। গায়ে কাদামাটি মাখা। একটা দাঁড়াশ সাপ যেভাবে গাছ বেয়ে ওঠে ঠিক সেভাবে নিলির গা বেয়ে সড়সড় করে উঠে দাঁড়াল ভ্যাম্পায়ারটা। এক ঝাপটায় ছিঁড়ে নিল নিলির গলার রুমাল।

১৩টি অলৌকিক কাহিনি।

সবক'টাই নতুন। এবং ভয়ংকর।

পত্র ভারতী

www.bookspatrabharati.com

চোখের পলকে ঝুরো মাটির আবরণ সরিয়ে ভ্যাম্পায়ারটা এক ঝটকায় উঠে বসল। ওটার গা বেয়ে মাটির গুঁড়ো ঝরে পড়তে লাগল।

ভ্যাম্পায়ারটার মুখ লম্বাটে। সারা গা ফ্যাকাশে সাদা। চোখ আর ঠোঁট লাল। মাথা ভরতি ঢেউখেলানো ঝাঁকড়া চুল। গায়ে কাদামাটি মাখা একটা ফুলস্লিভ শার্ট, আর গাঢ় ছাই রঙের চকচকে একটা প্যান্ট।

একটা দাঁড়াশ সাপ যেভাবে গাছ বেয়ে ওঠে ঠিক সেভাবে নিলির গা বেয়ে সড়সড় করে উঠে দাঁড়াল ভ্যাম্পায়ারটা। এক ঝাপটায় ছিঁড়ে নিল নিলির গলার রুমাল।

নিলি চোখ বড় করে চিৎকার করতে শুরু করল।

১৩টি অলৌকিক কাহিনি।
সবকটাই নতুন। এবং ভয়ংকর।



জন্ম ২২ অক্টোবর ১৯৫১, কলকাতায়। স্কুলের পড়াশোনা : হিন্দু স্কুল। সাম্মানিক পদার্থবিজ্ঞানে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক এবং ফলিত পদার্থবিজ্ঞানে বি. টেক., এম.টেক. ও পিএইচ.ডি.। পেয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের দুটি স্বর্ণপদক ও একটি রৌপ্যপদক।
কর্মজীবনে ১৯৮৩ সাল থেকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলিত পদার্থবিজ্ঞান বিভাগে লেকচারার। ১৯৯০ থেকে ওই বিভাগেই রিডার, আর ১৯৯৮ থেকে প্রফেসার।
লেখালেখির শুরু ১৯৬৮-তে, অধুনালুপ্ত 'মাসিক রহস্য পত্রিকা'য়।
প্রকাশিত কয়েকটি গল্পগ্রন্থ : **অনীশের সেরা ১০১, অশরীরী ভয়ংকর, দেখা যায় না শোনা যায়, তেইশ ঘন্টা ষাট মিনিট, ষাট মিনিট তেইশ ঘন্টা, বারোটি রহস্য উপন্যাস, পাঁচটি রহস্য উপন্যাস, ভয়পাতাল, কিশোর কল্পবিজ্ঞান সমগ্র, বিশ্বের সেরা ভয়ংকর ভূতের গল্প, ভৌতিক অলৌকিক, সেরা সায়েন্স ফিকশন সমগ্র** ইত্যাদি।
জনপ্রিয়-বিজ্ঞান গ্রন্থ : **বিজ্ঞানের হরেকরকম, সহজ কথায় ইন্টারনেট, কেমন করে কাজ করে যন্ত্র, রোমাঞ্চকর ধূমকেতু** ইত্যাদি।
প্রধান নেশা : রহস্য-গোয়েন্দা, অলৌকিক ও কল্পবিজ্ঞান কাহিনি লেখালেখি, জনপ্রিয় বিজ্ঞানচর্চা, বিজ্ঞান গবেষণা এবং কম্পিউটার।
পুরস্কার : প্রাচীন কলাকেন্দ্র সাহিত্য পুরস্কার (১৯৯৮), ড. জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ জাতীয় পুরস্কার (১৯৯৯), **পাই নিয়ে রূপকথা** বইয়ের জন্য দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের নরসিংহ দাস পুরস্কার (২০১২) ও দীনেশচন্দ্র স্মৃতি পুরস্কার (২০১৩)।
সম্পাদনা করেছেন অল্পকালজীবী কয়েকটি মাসিক পত্রিকা ও বিমল করের 'গল্পপত্র' পত্রিকার বিশেষ কল্পবিজ্ঞান সংখ্যা।

প্রচ্ছদ **সৌজন্য চক্রবর্তী**

অশরীরী ভয়ংকর

প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর ২০১৪

ASARIRI BHAYONKAR
Collection of supernatural stories & novels
by
Anish Deb

ISBN 978-81-8374-329-7

প্রচ্ছদ
সৌজন্য চক্রবর্তী

অলংকরণ
সুদীপ্ত মণ্ডল

মূল্য
২৮০.০০

Publisher
PATRA BHARATI
3/1 College Row, Kolkata 700 009
Phones 2241 1175. 94330 75550 98308 06799
e-mail patrabharati@gmail.com *website* www.bookspatrabharati.com
visit us at www.facebook.com/ Patra Bharati
Price ₹ 280.00

ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক পত্র ভারতী, ৩/১ কলেজ রো, কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে প্রকাশিত এবং হেমপ্রভা প্রিন্টিং হাউস, ১/১ বৃন্দাবন মল্লিক লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে মুদ্রিত।

শাশ্বত সেন

স্নেহাস্পদেষু

এক মিনিট, আপনাকে বলছি

অশুভ তেরোর সঙ্গে তাল মিলিয়ে পেশ করলাম এই তেরোটি কাহিনি। এগারোটি গল্প, এবং দুটি, মাপে বড় হওয়ায়, 'উপন্যাস'। এই তেরোটি কাহিনি আমার কোনও বইয়ে আগে আসেনি—ছাপা এই প্রথম। এদের ধরন যে কীরকম সেটা বইয়ের নাম থেকেই স্পষ্ট। কিন্তু গল্পগুলো কেমন—ভালো, খারাপ, না মাঝারি? সেটা তো ঠিক করবেন আপনি, যিনি বইটা হাতে নিয়ে ভাবছেন: কিনব কি কিনব না।

তাড়াতাড়ি সিদ্ধান্ত নিন, কারণ আমার বরাদ্দ এক মিনিট শেষ হয়ে আসছে। শেষ পর্যন্ত বইটা যদি আপনি কিনে ফেলেন এবং পড়ে ফেলেন, তা হলে 'কথা' হতে পারে ই-মেলে।

ডিসেম্বর ২০১৪

অনীশ দেব
[illegible]

ফলিত পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
রাজাবাজার বিজ্ঞান কলেজ
কলকাতা ৭০০ ০০৯



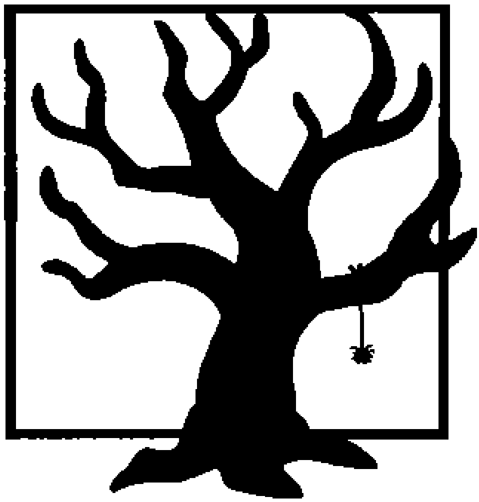
সূচিপত্র

গল্প

উপন্যাস



গল্প



অন্তরে সাপ ছিল

নাইট ক্লাবটার নাম ‘ব্লু হেভেন’। নীল রঙের নিওন সাইনে সেটা বেশ সুন্দর ছাঁদের আঁকাবাঁকা অক্ষরে লেখা রয়েছে।

ঘড়ি দেখলাম। রাত দশটা। কেকে-র সঙ্গে দেখা করার ঠিক সময়। তাই গাড়ির দরজা খুলে আমি আর মুন্নি নেমে পড়লাম।

ড্রাইভার ছেলেটি রোগা চেহারার, তবে চোখ-মুখ বেশ ধারালো। ওকে বললাম, গাড়ি ছেড়ে না যেতে। কারণ, যখন আমি ‘ব্লু হেভেন’ থেকে বেরিয়ে আসব তখন আমার খুব তাড়া থাকবে।

ক্লাবের সামনের রাস্তাটা নির্জন এবং চওড়া। দুপাশে বেশ কয়েকটা প্রাইভেট কার আর মোটরবাইক দাঁড়িয়ে রয়েছে।

ক্লাবের রংচঙে দরজার দিকে এগোনোর সময় উগ্র মিউজিকের ওঠানামা কানে আসছিল।

আমার হাত ধরে হাঁটতে-হাঁটতে মুন্নি জিগ্যেস করল, ‘মাম, ব্লু হেভেন মানে কী?

‘ব্লু’ মানে ও জানে। তাই বললাম, ‘হেভেন মানে স্বর্গ...।’

ও এমনভাবে ‘ও—’ বলল যেন ‘স্বর্গ’ ব্যাপারটা ওর জানা।

ক্লাবের দরজায় দুজন ‘বাউন্সার’ দাঁড়িয়ে। চেহারা দেখে মনে হয় দুটো

যমজ ষাঁড়। বো. টিউনিক ইত্যাদি পরে বেশ সেজেগুজে থাকলেও রাফ অ্যান্ড টাফ ক্যারেকটারটা বোঝা যাচ্ছে।

আমাকে দেখে ষাঁড় দুটো হাসল। মুন্নিকে যেন দেখেও দেখল না।

আমার পোশাক আজ একটু কম-কম, শরীর একটু বেশি-বেশি। বাউন্সার দুজন যতটা সম্ভব চেটে নিল। আমি হাসি মুখে দাঁড়িয়ে রইলাম---ওদের চাটার সময় দিলাম।

তারপর ছোট্ট করে বললাম, 'কেকে-র সঙ্গে দেখা করতে এসেছি· অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে·—।

ওরা হাসল। দরজা খুলে ধরল। একজন বলল, 'য়ু আর ওয়েলকাম, ম্যাম।'

কেকে এই নাইট ক্লাবের মালিক। এই শহরের আগমার্কা ডন। ওর অনেকরকম সাদা কালো ব্যাবসা আছে। তার মধ্যে 'ব্লু হেভেন' একটা।

আমি আর মুন্নি ভেতরে ঢুকলাম।

আমি এখানে আগে বেশ কয়েকবার এসেছি- একাই· আজ মুন্নি আমার সঙ্গে এসেছে। কারণ, আজ ও কাছে থাকা দরকার। ও আমাকে ভরসা দেবে, সাহস দেবে।

নাইট ক্লাবের ভেতরটা যেমন হয় ভেতরটা ঠিক সেইরকম। মিউজিকের তেজি ঝাপটা আমার কানে প্রবল ধাক্কা দিল। মুন্নির দিকে তাকিয়ে দেখি ও নির্বিকার। যেন সবটাই ওর জানা।

ডানদিকে ডান্স ফ্লোর। সেখানে রঙিন বাতির ঝলক পাগলের মতো চমকাচ্ছে। সেই চকমকি আলো গায়ে মেখে পুরুষ আর মহিলার ঝাঁক বেদম নাচছে। পাশেই মিউজিক স্টেজ। সেখানে চারজন ঝাঁকড়াচুলো লোক সাপের মতো শরীর বাঁকিয়েচুরিয়ে গাইছে আর বাজাচ্ছে। শূন্যে ভেসে বেড়াচ্ছে অসংখ্য রঙিন তারা। হলোগ্রাম ইমেজ।

বাঁ-দিকে অনেক টেবিল-চেয়ার। প্রায় সব টেবিলেই বোতল আর গ্লাস। বাতাসে সিগারেটের ধোঁয়া আর মদের গন্ধ। প্লেট আর চামচের ঠোকাঠুকির টুং-টাং আওয়াজ।

আমি একটা খালি টেবিলের কাছে এগিয়ে গেলাম। একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসলাম· দেখলাম মুন্নিও কখন বসে পড়েছে

কাঁধে ঝোলানো কালো রঙের লেডিজ ব্যাগটা পাশের একটা খালি চেয়ারে নামিয়ে রাখলাম। এই মুহূর্তে ব্যাগটা আমার সব। কারণ, ওটার ভেতরে নানারকম অস্ত্র রয়েছে। কেকে-কে শায়েস্তা করার অস্ত্র। ওকে খতম করার

অকল্পনীয় সব মারণাস্ত্র।

ঘেন্নায় আমার গলায় থুতু উঠে এল। আমার জীবনের সবকিছু কেকে কেড়ে নিয়েছে।

মাত্র ছ'মাস আগের কথা। আমার মেয়ে সায়োনারা স্কুল থেকে পিকনিক করতে গিয়েছিল। ওরা যখন পিকনিক থেকে ফিরে আসছিল তখন হঠাৎই একটা টাটা সুমো ওদের স্কুল-ভ্যানটায় ধাক্কা মারে। ভ্যানটা রাস্তা থেকে ছিটকে পড়ে সাত ফুট নীচের নালায়। গাড়ির ড্রাইভার আর দুজন মেয়ে স্পটেই মারা যায়। তার মধ্যে একজন সায়োনারা।

রাস্তার পাশের দোকানদার কিংবা পথচারীরা—যারা নিজের চোখে দুর্ঘটনাটা দেখেছে—পুলিশকে বলেছে, টাটা সুমোটা রং সাইড দিয়ে যাচ্ছিল। এমন আঁকাবাঁকা ঢঙে ছুটছিল যেন কোনও পাগলের হাতে স্টিয়ারিং পড়েছে।

পরে সব জানা গিয়েছিল। গাড়ি চালাচ্ছিল কেকে। এমনিতেই ও মদ খেয়ে ছিল। তার ওপরে ওর পাশে ছিল নয়না নামে একটা মেয়ে। নয়নার সঙ্গে কেকে ফস্টিনস্টি করছিল। গাড়ির স্টিয়ারিং-এর দিকে ওর মন ছিল না। তাই 'অ্যাক্সিডেন্ট'।

তদন্তে পুলিশ সব জানতে পেরেছিল। কিন্তু কিছু করতে পারেনি। কারণ, কেকে আগমার্কা ডন। মন্ত্রীরা সবসময় ওর ডান আর বাঁ-পকেটে থাকে। তাই পুলিশ 'অ্যাক্সিডেন্ট' বলেই ওদের কেসফাইল ক্লোজ করেছিল।

বেয়ারা আমার কাছে এসে সেলাম ঠুকল। অতিরিক্ত মনোযোগ আর বিনয়ের সঙ্গে বলল, 'ম্যাডাম, আপনাকে কী দেব?'

আমি ওর শ্রদ্ধা আর সম্ভ্রমের বহর দেখে বুঝলাম, ও আমাকে নিশ্চয়ই কেকে-র সঙ্গে আগে দেখেছে।

আমি হেসে খাবারের অর্ডার দিলাম। তার সঙ্গে একটু হুইস্কির কথাও বললাম। সায়োনারা চলে যাওয়ার পর থেকে আমি কোল্ড ড্রিংক ছেড়ে ড্রিংকের দিকে গেছি।

বেশ মনে আছে, ওই অ্যাক্সিডেন্টের পর আমি ভীষণ একা হয়ে গিয়েছিলাম। প্রতিটি মুহূর্তেই মরে যেতে ইচ্ছে করত। কিন্তু প্রতিশোধের আগুনের ওম আমাকে বাঁচিয়ে রাখল, বারবার মনে উঁকি মারছিল বিদেশি সেই প্রবাদটাঃ রিভেঞ্জ ইজ আ ডিশ বেস্ট সার্ভ্‌ড কোল্ড।

স্বামী ছেড়েছিলাম সায়োনারা মারা যাওয়ার চার বছর আগেই। কারণ, নিয়মহীন, বল্গাহীন, স্বার্থপর একটা পুরুষের সঙ্গে বেশিদিন থাকা যায় না।

আমি অনেক চেষ্টা করে সম্পর্কটাকে সাত বছর টিকিয়ে রেখেছিলাম। সাতের পর আর নয়।

ভেবে দেখলাম, আমার সেই স্বামীটাকে আমি শেষ দুটো মাস যে জঘন্য ঘৃণা করতাম, কেকে-কে করি তার চেয়েও একশো গুণ বেশি।

হঠাৎই সেই 'একশো গুণ বেশি' লোকটাকে দেখতে পেলাম। নাইট ক্লাবের দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকল।

চওড়া কাঁধ, বক্সারদের মতো থ্যাবড়া নাক, কদমছাঁট চুল, হাইট মাঝারি, গায়ের রং বাদামি।

গলায় সোনার ভগ চেন, দু-হাতের আঙুলে ছ'টা মোটা-মোটা সোনার আংটি।

কেকে-র গায়ে একটা নীল রঙের ফুল স্লিভ শার্ট, পায়ে কালো ট্রাউজার্স কোমরে বেল্ট।

চোখ ছোট-ছোট, মুখ-নাক কাটা-কাটা। দেখে বুদ্ধিমান বলে মনে হয়। তার সঙ্গে রয়েছে ওভার কনফিডেন্সের জ্যোতি। কিন্তু তাতে ডন-ডন ভাবটা চাপা পড়েনি।

ওর হাঁটা দেখে বেশ বোঝা যাচ্ছিল ও এই নাইট ক্লাবের মালিক।

কেকে ক্লাবে একা ঢোকেনি। ওর ঠিক পিছনেই রয়েছে তিনটে শক্তপোক্ত খুচরো চামচে। এরা একই সঙ্গে ওর শাগরেদ, বডিগার্ড এবং চাকর।

ইচ্ছে করলে আমি এই মুহূর্তেই কেকে-কে খতম করতে পারি। কেউ বুঝতেও পারবে না আমি ওকে খুন করলাম।

আমার ব্যাগে রয়েছে সিগারেটের মাপের একটা ব্লো-পাইপ। সেটার ডগাটা এক সেন্টিমিটার মতন সত্যিকারের তামাক ঠাসা সিগারেট। তার পরেই রয়েছে অ্যান্টি-থার্মাল হার্ড পলিমারের ব্লো-পাইপ।

সিগারেট ধরিয়ে কিছুক্ষণ ধোঁয়া ছাড়ার পর পাইপের ঠোঁটের দিকটায় বিষমাখানো পিনটা গুঁজে দিলেই হল। তারপর টানের বদলে জোরালো একটা ফুঁ।

কেকে যদি আমার আড়াই মিটারের মধ্যে থাকে তা হলে পিনটা ওর গলায় বা মুখে কোথাও বিঁধে গেলেই হবে। ডাক্তার ডাকার দরকার পড়বে না। এক ফুঁয়ে সব শেষ। কাম তামাম।

আমি ব্যাগ খুলে ব্লো-পাইপটা বের করলাম। দু-এক লহমা দেখলাম।

ছড়ানো টেবিল-চেয়ারের মাঝের অলিপথ ধরে কেকে এগিয়ে আসছে।

আমার টেবিলের দেড় মিটারের মধ্যে দিয়েই ও যাবে।

কিন্তু না। ওকে আমি এভাবে মারব না। এই মৃত্যুটা বড্ড কোমল হবে। সফ্‌ট কিলিং। সায়োনারার মৃত্যুর বদলে একটা হার্ড কিলিং কেকে-র পাওনা।

আমার ব্যাগে রিভলবার আছে। স্মিথ অ্যান্ড ওয়েসন চিফ্‌স স্পেশাল মডেল। ০.৩৮ স্পেশাল ক্যালিবার। হালকা—ওজন মাত্র ৩৮৫ গ্রাম। ডাব্‌ল অ্যাকশন। পাঁচ রাউন্ড গুলি ছোড়া যায়।

কেকে-র জন্যে এতগুলো গুলি লাগবে না জানি, কিন্তু তাও পাঁচটা গুলিই আমি চেম্বারে ভরে রেখেছি।

গুলি করে কেকে-কে খুন করার পর জানি আমি ধরা পড়বই। তখন ওর চ্যালাচামুণ্ডারা আমাকে কুচি-কুচি করে ফেলবে। কিন্তু তাতেও দুঃখ নেই। কারণ, বাঁচার ইচ্ছেটাই আমার মধ্যে আর নেই।

ভাবতে-ভাবতে বোধহয় আনমনা হয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎই দেখি বেয়ারা আর কেকে দুজনেই আমার টেবিলের দিকে আসছে। কেকে হাত নেড়ে ওর চামচেদের অন্দরের দিকে এগিয়ে যেতে বলল।

বেয়ারা এক প্লেট চিকেন রেশমি কাবাব টেবিলে নামিয়ে রাখল। স্পাইসেস অ্যান্ড সসেস-এর পোর্সিলেন ট্রে-টা আমার সামনে এগিয়ে দিল।

কেকে সামনে এসে ওর ভারী গলায় বলল, 'হাই, বিউটি, সাতদিন কোথায় ছিলে?' হাসল ডন।

সাতদিন আমি 'ব্লু হেভেন'-এ আসিনি। তাই কেকে আমাকে দেখতে পায়নি। ওর চোখে মুখে খিদেটা আমি দেখতে পেলাম। বাউন্সার দুজনের মতো ও আমাকে চাটতে লাগল।

প্রথম দিন থেকেই কেকে আমাকে 'এই এদিকে এসো—এসো না—' চোখে দেখছে। সুন্দরী তরুণীকে একা দেখলে—বিশেষ করে নাইট ক্লাবে—কোন পুরুষ না উৎসাহিত হবে!

'কোথায় ছিলে সাতদিন?' বলতে-বলতে একটা চেয়ার টেনে আমার মুখোমুখি বসে পড়েছে কেকে। তারপর বেয়ারাকে চেঁচিয়ে ডেকে বলেছে, 'এই ম্যাডাম আমার গেস্ট। কোনও বিল বানাবে না—।'

'থ্যাংক্‌স—' আমি হেসে বললাম, 'এই সাতদিন কী করছিলাম? আই ওয়াজ মেকিং আপ মাই মাইন্ড...।'

কাঠি গেঁথে রেশমি কাবাব মুখে দিলাম। কেকে-কেও ইশারায় অফার করলাম।

ও বলল, 'থ্যাংকস।' তারপর জিগ্যেস করল, 'কোন ব্যাপারে ডিসাইড করছিলে?'

'টু ডু—অর নট টু ডু...।'

কেকে ওর মতো করে কথাটার অর্থ করে নিল। একগাল হাসল। হাসলে ওর ডন-ডন ভাবটা ফিকে হয়ে যায়।

মুন্নি চাপা গলায় আমাকে জিগ্যেস করল, 'লোকটা কে, মাম?'

আমি নীচু স্বরে ওকে বললাম, 'কেকে। এই ক্লাবের মালিক। ডন...।'

'ডন?' মুন্নির কপালে ভাঁজ পড়ল। ও এই শব্দটার মানে জানে না। এই ছোট বয়েসে জানার কথাও নয়।

'তো কী ডিসাইড করলে?' কেকে মুচকি হেসে জিগ্যেস করল। ওর চোখ লাল। সেই সঙ্গে লালাও ঝরছে।

'ডিসাইড করে ফেলেছি। স্রোত যে দিকে নিয়ে যাবে সেদিকেই যাব।' কাবাবে কামড় বসালাম।

'তার মানে, টু ডু।' কেকে-র ঠোঁটের কোণে হাসি।

হ্যাঁ, আজকেই খতম করব তোমাকে। এক প্লেট প্রতিশোধ এগিয়ে দেব তোমার সামনে। ঠান্ডা—সাপের মতো।

একটি মেয়ে কখন যেন ক্যাবারে নাচতে শুরু করেছিল। রোগা শরীর। ভারী বুক। সবমিলিয়ে কলমের বেল গাছ।

মেয়েটার গায়ে দু-টুকরো লাল কাপড় কোনওরকমে লেপটে আছে। ও শরীরের প্রবল ঝাঁকুনিতে সেগুলো খসিয়ে ফেলার চেষ্টা করছিল।

কেকে আমাকে খুঁটিয়ে দেখছিল। আমি কে ও জানে না। আমি কেন এই ক্লাবে প্রায়ই আসি, ও জানে না। শুধু বুঝতে পারে আমার মধ্যে কোনও অতৃপ্তি আছে। কিংবা আমি পারভার্ট।

কিন্তু তাতে ওর কোনও অসুবিধে নেই। ওর সম্পর্কে যেটুকু খোঁজখবর নিয়েছি তাতে মেয়েদের শুধু বাইরেটাই ওর দারকার—ভেতরটা নিয়ে ওর কোনও মাথাব্যথা নেই।

আমি পাশের চেয়ার থেকে ব্যাগটা কোলে তুলে নিলাম। ইচ্ছে করলে ব্লো-পাইপটা আমি এখন বের করে নিতে পারি। তারপর...। কিন্তু না—হার্ড কিলিং। তার জন্যে জীবন বাজি।

নাঃ, কেকে ভাবতেও পারবে না কতরকম অস্ত্র আছে আমার ব্যাগে।

ব্লো-পাইপ। ০.৩৮ চিফ্‌স স্পেশাল। হাই ভোল্টেজ স্টান-গান। সায়ানাইড

ক্যাপসুল। বিষ মাখানো সুইচব্লেড। এ ছাড়া স্পেশাল টাইপের এক্সপ্লোসিভ।

এইসব অস্ত্র একসঙ্গে ব্যবহার করতে পারলে একটা ছোটখাটো সেনাবাহিনীর মোকাবিলা করা যায়। আর কেকে তো কেকে।

অস্ত্রশস্ত্রের ব্যাপারে আমি মোটেই বিশেষজ্ঞ নই। এ ব্যাপারে আমার টেকনিক্যাল এক্সপার্ট হচ্ছে রণজয় সিং। আমি 'আর-না-স্বামী' হওয়ার পর থেকে ও আমার 'তুমি আর আমি'। মুন্নি কিংবা সায়োনারা ওকে 'আঙ্কল' বলে ডাকে, ডাকত। রণজয় আমার 'লিভ-ইন' বয়ফ্রেন্ড।

রোগা, ফরসা, লম্বা। চোখে চশমা, গালে চাপদাড়ি, মাথার চুল কাঁধ পর্যন্ত চলে এসেছে। যখন-তখন সিগারেট ধরায়। আমার কথা কখনও শোনে, কখনও শোনে না। তবে আমাকে পাগলের মতো ভালোবাসে।

রণজয় আমার সবকিছু জানে। সায়োনারার ঘটনা, কেকে-র নাইট ক্লাব, প্লট সাজানো ঠান্ডা প্রতিশোধ, কেকে-র সঙ্গে বন্ধুত্বের চেষ্টা—সব। আমার মতো ও-ও চায় কেকে খতম হয়ে ধুলো হয়ে যাক।

রণজয় এক্সপার্ট লাভার। আবার একইসঙ্গে এক্সপার্ট খতমের কারিগর। পুলিশ ফোর্স আর ডিফেন্স-এর অনেক ইউনিটই রণজয় সিং-এর ক্লায়েন্ট। অভিনব সব মারণাস্ত্র তৈরির ব্যাপারে রণজয় সিং আনকনটেস্টেড জিনিয়াস।

কেকের লোভাতুর মুখের দিকে তাকিয়ে আমার রণজয়ের কথা মনে পড়ছিল। আজ যদি জিততে পারি তো সেটা রণজয়ের জন্যে।

কেকের দিকে তাকিয়ে আমি মিটিমিটি হাসছিলাম। আমার মন বলছিল, আজ ও আমাকে ভেতরের অফিস ঘরে কিংবা তারও পেছনের ঘরে ডাকবে

খুব মোলায়েম গলায় ও বলল, '[illegible], ভেতরে গিয়ে একটু নিরিবিলি কথা বলি। তোমার সঙ্গে আমার দরকার আছে...।'

আমি মুন্নির দিকে তাকালাম। ও একমনে ক্যাবারে নাচিয়ে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে। হয়তো অবাক হয়ে ভাবছে মেয়েটা হিস্টিরিয়া রুগির মতন ওরকম হাত-পা ছুড়ছে কেন।

আমি কেকে-র দিকে তাকিয়ে চোখ ঠারলাম। যার অর্থ, ব্যাপারটা কী? হঠাৎ ভেতরে ডাকছ কেন? মাথায় দুষ্টুমির কোনও প্ল্যান আছে না কি?

কেকে আর ধৈর্য ধরতে পারল না। ড্রিংকের গ্লাসটা ঝট করে তুলে নিল। তিন ঢোকে হুইস্কিটা মেরে দিল। তারপর ঠোঁট মুছে টেবিলের ওপর দিয়ে হাত বাড়াল। এবং আমার বাঁ-হাত চেপে ধরল। খসখসে গলায় বলল,

'কাম! কাম!'

ও ইংরেজি বলল, না বাংলা, সেটা আমার কাছে গুলিয়ে গেল। কিন্তু যা-ই বলুক না কেন তার ফলাফল একটাই : ওর সঙ্গে ভেতরে যেতে হবে।

এই সুযোগ! এই সুযোগের মুহূর্তটা আমি দিনের পর দিন কত কষ্ট করে তৈরি করেছি! এটা নষ্ট করার কোনও মানে হয় না।

সুতরাং ব্যাগটা হাতে নিয়ে উঠে পড়লাম। দু-টুকরো কাবাব প্লেটেই পড়ে রইল।

কেকে-ও চটপট উঠে দাঁড়িয়ে অন্দরমহলের দিকে পা বাড়িয়েছে।

আমি মুন্নিকে ইশারায় ডেকে নিলাম। ভেসে বেড়ানো সিগারেটের ধোঁয়া আর হলোগ্রাম তারার ঝাঁক ভেদ করে আমরা হাঁটতে লাগলাম।

মুন্নি জিগোস করল, 'লোকটার সঙ্গে যাচ্ছ কেন, মাম?'

আমি ওর দিকে ঘুরে তাকিয়ে বললাম, দেখতেই পাবি—

নাইট ক্লাবের ওপেন জোন পেরিয়ে কেকে-র প্রাইভেট জোন। দেওয়ালে বসানো দরজাটা এমনভাবে রং করা যে, চট করে দরজা বলে বোঝা যায় না।

দরজাটা পেরিয়ে কেকে-র নিজস্ব অফিস। কিন্তু সেটা ভেদ করে আমরা এগিয়ে গেলাম আরও ভেতরের স্তরে।

সরু করিডর। ডানদিকে ঘষা কাচের তৈরি দুটো বাথরুম। সে-দুটো পেরিয়ে আরও এগিয়ে একটা পালিশ করা দরজা। গোটা দরজা জুড়ে খোদাইয়ের অপরূপ কারুকাজ। স্বর্গের দরজা বোধহয় কল্পনায় এরকম হতে পারে।

করিডরে কেকে-র বুটের শব্দ হচ্ছিল। সেই শব্দ থেকে আত্মবিশ্বাস ঠিকরে বেরোচ্ছিল। ওর স্পর্ধা আমাকে অবাক করছিল। মুন্নি যে আমার সঙ্গে রয়েছে সে-ব্যাপারটা ও ভ্রূক্ষেপই করছিল না।

চাবি ঘোরানোর শব্দ হল। দরজার পাল্লা খুলে গেল।

বিশাল মাপের একটা ঘর। একই সঙ্গে বেডরুম কাম ড্রয়িংরুম। ওঃ, আবার 'কাম' শব্দটা আমার মাথায় খোঁচা মারল।

ঘরের মেঝেতে দামি কোমল কার্পেট। চার দেওয়ালে পালিশ করা উড প্যানেলিং। সিলিং-এ এখানে-সেখানে ছোট মাপের স্পটলাইট লাগানো। ঘরের এককোণে বড় টেবিল, রিভলভিং চেয়ার, টেবিলে কয়েকটা ফাইলপত্র, দুটো মোবাইল ফোন, একটা গোলাপি রঙের টেবিল-ঘড়ি।

ঘরে বিছানা যেটা পাতা আছে সেটা এত প্রকাণ্ড যে, ঘোড়দৌড়ের মাঠ

বলে ভুল হতে পারে। সেখানে একসঙ্গে চারজন মেয়েকে নিয়ে হাজাররকম কেলি বা কেলো করা যায়।

খাটটা সাধারণ নয়, পালিশ করা কাঠের পালঙ্ক—আর সম্ভবত অ্যান্টিক। বিছানার সবকিছুই ধবধবে সাদা—চাদর, বালিশ, পাশবালিশ—সব।

রুম ফ্রেশনারের চড়া গন্ধ বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে। তারই মধ্যে জোনাকির মতো উড়ছে হলোগ্রাম তারা।

ঘরের বাঁ-দিকটায় একটা খাটো টেবিল—আর তাকে ঘিরে দুটো চেয়ার। টেবিলে মদের বোতল আর গ্লাস

কেকে আমার হাত ধরল। একটা চেয়ারের দিকে নিয়ে গেল।

ঘরের দরজাটা খট করে বন্ধ হয়ে গেল।

আমি চেয়ারে বসে ব্যাগটা কোলের ওপরে রাখলাম। ব্যাগের দিকে না তাকিয়ে জিপটা খুব ধীরে খুলে ফেললাম এবার কিছু একটা করতে হবে। আর দেরি করা ঠিক হবে না।

আমার ব্যাগের জিপ খোলার ব্যাপারটা কেকে খেয়াল করেনি। ও তখন কোথা একটা ছোট্ট রিমোট ইউনিট তুলে নিয়ে দেওয়ালের একটা জায়গা তাক করে বোতাম টিপতে ব্যস্ত। বোতাম টেপার সঙ্গে-সঙ্গে হালকা মিউজিক শুরু হয়ে গেল

কেকে আমার কাছে এসে বসল একটু জড়ানো গলায় বলল 'প্রথম দিন থেকেই তোমাকে মনে-মনে চেয়েছি।'

এসব স্ট্যান্ডার্ড ডায়ালগ অনেকেরই অনেকবার শোনা। তাই আমি শুধু হাসলাম

মুন্নি দেখলাম ঘরের এখানে-ওখানে ঘোরাফেরা করছে, কৌতূহলে এটা-ওটা দেখছে।

আমার নজর লক্ষ করে কেকে সেদিকে একবার তাকাল। তারপরই তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে ঠোঁট বাঁকিয়ে আবার আমার দিকে।

'এনার্জি খরচ করার আগে একটু এনার্জি নিয়ে নাও—।' এই বলে মদের বোতল খুলে গ্লাসে এনার্জি ঢালতে লাগল কেকে

এখন আর আমার ফেরার পথ নেই। কেকের চোখের দিকে তাকিয়ে হাসলাম। হাসিটা কি বোকা-বোকা দেখাল?

হঠাৎই মুন্নির দিকে চোখ পড়তে দেখি ও আমাকে ইশারা করছে। যে-সংকেতটা 'ডিকোড' করলে দাঁড়ায় 'আর দেরি কোরো না!'

আমি কেকে-র দিকে দেখলাম। দেখলাম হুইস্কি ঢেলে দেওয়া গ্লাসের দিকে।

আমি এখন ড্রিংকের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিয়েছি। সায়োনারার সেই বুক-ফেটে-যাওয়া ঘটনাটার পর বেশ চেষ্টা করে নিজেকে 'ব্লু হেভেন'-এর সঙ্গে খাপ খাইয়েছি, কেকে-র সঙ্গেও খাপ খাইয়েছি।

কেকে-কে এক প্লেট ঠান্ডা প্রতিশোধ খাওয়াব বলে আমি নিজে কত কী ছাইপাঁশ খাওয়া অভ্যেস করেছি!

আমি জানতাম কেকে আমাকে ড্রিংক করার জন্যে জোরাজুরি করবে। তাই ওকে বললাম, 'আমি এসব খাব না। আমার কাছে স্পেশাল ভাইটালিটি জুস রয়েছে—ককটেল জুস।' কথা বলতে-বলতে দুটো জুসের বোতল আমি ব্যাগ থেকে বের করে টেবিলে রাখলাম। পলিমারের বোতলে বন্দি হালকা গোলাপি তরল। বোতলের গায়ের লেবেলে এই ককটেল জুসের বহুমুখী উপকারিতার কথা বেশ সগর্বে ঘোষণা করেছে ব্র্যান্ডেড কোম্পানি। আর শুধু আমি নয়, এ-শহরের সবাই জানে এই জুসের সুখ্যাতির কথা।

কেকে হুইস্কির গ্লাস এগিয়ে দিল আমার দিকে। জড়ানো গলায় বলল, 'এখন হুইস্কির সময়—জুসের নয়।'

সেটা আমি জানি। জেনেও যে কেন বললাম, তাও আমি জানি।

কেকে একটা গ্লাস তুলে নিয়ে চটপট সেটা খালি করে দিল। আর আমাকেও খালি করার জন্যে বেদম তাড়া মারতে লাগল।

মুন্নি কখন যেন বিছানার ওপরে বসে পড়েছিল। সেখানে বসে-বসেই ও উদাসীন চোখে মামের মদ খাওয়া দেখতে লাগল। তবে সান্ত্বনা এটাই যে ও সব জানে। সায়োনারা, রণজয়, কেকে, নাইট ক্লাব, আমার প্রতিশোধ নেওয়ার পাগল করা টান—সব।

মিউজিকের তালে-তালে কেকে মাথা নাড়ছিল, গুনগুন করছিল। হঠাৎই আমার হাত ধরে টান মারল। অর্থাৎ, আর দেরি নয়—এবার বিছানায়।

হঠাৎই আমার মাথার মধ্যে একটা বিস্ফোরণ ঘটে গেল। মূল্যবোধের পোকা নড়ে উঠল। এ আমি কী করছি! একটা নোংরা ক্রিমিনালের সঙ্গে বিছানায় যাচ্ছি।

অথচ এতদিন ধরে যখন প্রতিশোধের কথা ভেবেছি তখন হিসেবে এই চূড়ান্ত ব্যাপারটাও ধরে নিয়েছিলাম। ধরে নিয়েছিলাম, কিছু পেতে গেলে কিছু দিতে হয়। সিম্প্‌ল 'গিভ অ্যান্ড টেক'।

কিন্তু এখন, এই চূড়ান্ত মুহূর্তে, অবাক হয়ে দেখলাম, আমি কেকে-র সঙ্গে

ধস্তাধস্তি করছি।

কেকে-র টেবিলে রাখা একটা মোবাইল ফোন বাজতে শুরু করল। তার প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই ব্যাগের ভেতরে রাখা আমার মোবাইলটাও বাজতে লাগল।

কেকে একপলকের জন্যে ওর মোবাইলের দিকে চোখ ফিরিয়েছিল। সেই ফাঁকে আমি ব্যাগের ভেতরে হাত ঢুকিয়ে দিয়েছি। রিসিভ করার জন্যে 'অ্যাকসেপ্ট' বোতাম টিপে দিয়েছি।

রণজয় ফোন করেছে।

কিন্তু ফোনটা কানে দেওয়ার আগেই কেকে আমার হাত ধরে আবার এক হ্যাঁচকা টান মেরেছে।

আমার হাত থেকে মোবাইল ছিটকে পড়ল কার্পেটের ওপরে। ব্যাং-বাজির মতো দুবার লাফাল। কোলের ব্যাগটা পড়ে গেল নীচে। হাতের গ্লাস ছিটকে পড়ল। টেবিলটা উলটে গেল। গ্লাস-বোতল সব মেঝেতে। ককটেল জুসের বোতল দুটোও এদিক-ওদিক ছড়িয়ে গিয়ে গড়াতে লাগল।

কেকের টানে আমি প্রায় উড়ে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়েছি ওর বুকে। ও ঘরের অবস্থা দেখে 'শিট' বলল। আর একইসঙ্গে একহাতে আমাকে জাপটে ধরল। তারপর কোনও বাচ্চাকে কোলে নেওয়ার মতো অনায়াসে আমাকে শূন্যে তুলে নিয়ে গেল বিছানায়।

পরের কাণ্ডটা ভেবে আমার ঘাম পাচ্ছিল। আর মেঝেতে পড়ে থাকা ব্যাগটার দিকে তাকিয়ে বুক ধড়াস-ধড়াস করছিল। রিভলভারটা কিংবা সুইচব্লেডটা ব্যাগ থেকে বাইরে বেরিয়ে আসেনি তো?

না, আসেনি।

'অনেক ওয়েট করিয়েছ, সুইটি—আর নয়।' কেকে জড়ানো গলায় বলল।

আমি অসহায়ভাবে মুন্নির দিকে তাকালাম। ও চাপা ধমকের গলায় বলল, 'তুমি এত দেরি করলে কেন, মাম? কেন এত দেরি করলে!'

আমার কান্না পাচ্ছিল। মোবাইল ফোনে রণজয় হয়তো এখনও 'হ্যালো! হ্যালো!' বলছে। হয়তো ঘরের সব আওয়াজ, কথাবার্তা শুনতে পাচ্ছে!'

হুড়োতাড়া করে কলার খোসা ছাড়ানোর মতো করে কেকে নিজের গা থেকে পোশাক খুলল। তারপর হিংস্র ক্ষুধার্ত পাহাড়ের মতো আমার ওপরে নেমে এল।

শুরু হয়ে গেল ওর একরোখা এনকাউন্টার। আর তার ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক হিসেবে ওর মোবাইল ফোনটা বেজেই চলল।

আমার চোখে জল। ঘরের সিলিং-এর দিকে তাকিয়ে সায়োনারার কথা ভাবতে লাগলাম। কোথা থেকে কী হয়ে গেল! প্রতিশোধ নেওয়ার সুযোগ কি আর আমি পাব?

কানে আসছে কেকের হাঁপানি আর গর্জন। নাকে আসছে রুম ফ্রেশনারের সঙ্গে মেশানো মদের গন্ধ।

রণজয়ের কথা মনে পড়ছিল। ও বারবার বলেছিল, 'বাড়তি রিস্‌ক নিয়ো না। কেকে লোকটা একটা নোংরা সাপের বাচ্চা। কোনও কিছু করতে ওর আটকায় না। তুমি চাইলে আমি তোমার সঙ্গে থাকতে পারি—।'

আমি মাথা নেড়েছিলাম : 'না। তুমি থাকলে আমরা কেকে পর্যন্ত পৌঁছতে পারব না...।'

রণজয় আমার জেদটা টের পেয়েছে। তাই চুপ করে থেকেছে।

আর আমি মনে-মনে ভেবেছি, সায়োনারা আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার। ওর চ্যাপ্টারটা আমাকে একাই ক্লোজ করতে হবে।

একসময় পাহাড়ের ওজন সরে যেতেই বুঝলাম এনকাউন্টার শেষ।

কেকে বিছানার একপাশে বসে পড়ল। হাঁপাতে-হাঁপাতে বলল, 'এটা আমার লাইফের বেস্ট টাইম...।' আমার গা ঘিনঘিন করছিল। স্নান করতে পারলে খুব ভালো হত।

ভেতরে রাগ আর অপমান দাউদাউ করে জ্বলছিল। ভয় হচ্ছিল, এই বুঝি সেই হলদে আগুনের শিখা নাক-মুখ-চোখ দিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসবে।

আমি বিছানা থেকে নেমে এলাম। জামাকাপড় ঠিকঠাক করতে করতে আড় চোখে মুন্নির দিকে তাকালাম। ও বারের টেবিলটার কাছে একটা চেয়ারে চুপ করে বসে আছে। চোখের দৃষ্টি এমনই যে, মনে হল বলছে, 'মাম, শক্ত হও! ভুলে যেয়ো না তুমি কী কাজে এখানে এসেছ...মাম...।'

ওইটুকু বাচ্চা, কিন্তু কীভাবে আমাকে ভরসা দিচ্ছে!

আমি মনের জ্বালা-পোড়া ডিঙিয়ে সায়োনারার কথা ভাবলাম। তারপর কেকের কাছে গিয়ে ওর কপালে একটা চুমু খেলাম। ও একপলক অবাক হয়ে তারপর আমাকে জড়িয়ে ধরল। গায়ে হাতে বুকে কয়েকটা চুমু ফিরিয়ে দিল।

আমি ওর বাঁধন ছাড়িয়ে মেঝেতে পড়ে থাকা খাটো টেবিলটার কাছে গেলাম। মুন্নির দিকে তাকিয়ে চোখের ইশারায় বললাম, 'এবার দ্যাখ আমি কী করি!' তারপর টেবিলটা দাঁড় করিয়ে ঠিক ভাবে রাখলাম। মেঝেতে পড়ে

থাকা গ্লাস-বোতল, জুসের বোতল, আমার মোবাইল ফোন আর ব্যাগ—সব আবার ঠিকঠাক সাজিয়ে রাখলাম।

ক্লান্ত লাগছিল। কিন্তু এখন ক্লান্ত লাগলে চলবে না। শেষ চেষ্টা করতে হবে। কেকে-কে যে-কোনো ছলছুতোয় এই টেবিলের কাছে নিয়ে আসতে হবে, চেয়ারে বসাতে হবে।

কেকে-র কাছে গিয়ে ওর হাত ধরে আলতো টান মারলাম ঃ 'চলো, ওখানে বসবে চলো। তোমার সঙ্গে অনেক কথা আছে—।'

ও আমার দিকে মুখ তুলে তাকাল। প্যান্টটা পরে নিতে-নিতে বলল, 'আমারও অনেক কথা বলার আছে। মনে হচ্ছে, আমি কেমন একটা টানে তোমার সঙ্গে জড়িয়ে গেছি—।'

'অথচ তুমি আমার নামও জানো না।' আমি বললাম, 'সেইজন্যেই তো কথা বলতে চাইছি। রাত হয়ে যাচ্ছে...আমাকে বাড়ি ফিরতে হবে।'

'ভেবো না। আমি তোমাকে বাড়িতে ড্রপ করে দেব—।' কথাগুলো বলতে-বলতে কেকে টেবিলটার দিকে হাঁটা দিল। রঙিন হলোগ্রাম তারাগুলো ওর মুখের ওপরে ছায়া ফেলে গেল।

টেবিলটা মাঝে রেখে আমরা মুখোমুখি বসলাম।

'সত্যি, সুইটি, তোমার নাম কী?'

হেসে বললাম, 'পরে বলছি। আপাতত সুইটিতেই কাজ চলুক না!'

মুন্নি কখন যেন আমার গায়ের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। ফিসফিস করে বলল, 'মাম, এবার যা করবার তাড়াতাড়ি করো।'

আমার গলা শুকিয়ে আসছিল। হাত বাড়িয়ে একটা ককটেল জুসের বোতল তুলে নিলাম। সেটা আনমনাভাবে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখতে-দেখতে বললাম, 'তোমার নামে যা-যা শুনেছি তুমি তার চেয়ে অনেক ভালো—।'

'তাই?' ভুরু উঁচিয়ে হাসল কেকে।

'জুস চলবে না কি?' ওকে অফার করলাম।

ও বলল, 'তুমি খাও, তারপর আমি খাচ্ছি—।'

আমি শব্দ করে বোতলের সিল ভাঙলাম। তারপর এঁটো না করে খানিকটা জুস গলায় ঢেলে নিলাম।

কেকে আমার কাছ থেকে বোতলটা চেয়ে নিল। দু-ঢোকে বাকি জুসটা শেষ করে দিল।

'তুমি আবার কবে আসবে, সুইটি?'

'হয়তো কাল—নয় পরশু...।'

'গুড। তোমার মোবাইল নম্বরটা আমাকে দাও।' কেকে ওর মোবাইল ফোনটা পকেট থেকে বের করল।

তখনই আমার মোবাইল বাজতে শুরু করল।

ফোনটা ব্যাগ থেকে বের করলাম: রণজয় সিং। রাত বাড়ছে বলে আমার জন্যে চিন্তা করছে।

'এক্সিট' বোতাম টিপে ফোনটা কেটে দিলাম। তারপর কেকে-কে আমার মোবাইল নম্বর দিলাম। ও নিজের ফোনের বোতাম টিপতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

আমার ফোনটা ব্যাগে রেখে হালকা গলায় বললাম, 'ওই জুসটাও শেষ করে দাও। শুধু-শুধু ব্যাগের ওজন বাড়াব না। এমনিতেই হাবিজাবিতে আমার ব্যাগ বেশ ভারী...।'

কেকে হেসে বলল, 'কী আছে তোমার ব্যাগে, দেখ—।'

আমার বুক ধড়াস করে উঠল। তাড়াতাড়ি জুসের দ্বিতীয় বোতলটা ওর কাছে এগিয়ে দিলাম।

ওর বোধহয় এখনও তেষ্টা পাচ্ছিল। বোতলটার দিকে একটুক্ষণ তাকিয়ে তারপর 'কটকট' শব্দ করে ছিপির সিল ভাঙল।

ও জুস খেতে শুরু করল। আমার বুকের ভেতরে খুশি টগবগ করে উঠল মুন্নির দিকে তাকিয়ে দেখি ও মিটিমিটি হাসছে।

রণজয় বলেছিল, জুস অর্ধেকটা খেলেই কাজ হবে। কেকে জুসটা অর্ধেকেরও বেশি খেয়ে ফেলল। তারপর জুসের বোতলটা আমার দিকে এগিয়ে দিল। আমি হেসে ওটা নিলাম। টেবিলে রাখলাম।

কেকে জড়ানো গলায় বলল, 'কী আছে তোমার ব্যাগের মধ্যে, দেখি!'

'তোমার দেখার মতো কিছু নেই—।'

'না, দেখি—' বলে জেদি বাচ্চার মতো আমার ব্যাগটা ধরে টান মারল।

আমি আতঙ্কে ব্যাগ খামচে ধরলাম। এখুনি ও অস্ত্রশস্ত্রগুলো দেখতে পাবে! আমাদের দুজনের ব্যাগ টানাটানি চলতে লাগল।

যখন বুঝলাম, ওর সঙ্গে পারব না তখন অন্য স্ট্র্যাটেজি নিলাম।

'ছাড়ো, আমিই সব দেখাচ্ছি...।'

একে-একে অস্ত্রগুলো বের করতে লাগলাম। ০.৩৮ চিফ্‌স স্পেশাল, সুইচব্লেড, স্টান-গান—সব।

কেকে অবাক হয়ে গেল।

আমি হেসে বললাম, 'সেলফ ডিফেন্স...!'

পালটা হাসল জানোয়ারটা : 'তোমার এত ভয়!'

'না, আর ভয় নেই। এগুলো সব তুমি রাখতে পারো। আমার আর লাগবে না—আমার কাজ শেষ। বরং তোমার এখন প্রোটেকশান দরকার—যদিও তার সময় পেরিয়ে গেছে...।'

রিভলভারটা হাতে নিয়ে কেকে নাড়াচাড়া করছিল। শেষ কথাটা শোনার পর বোকা-বোকা চোখে আমার দিকে তাকাল।

আমি ব্যাগটা হাতে নিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম। ওকে ছ'মাস আগের অ্যাক্সিডেন্টটার কথা বলতে লাগলাম।

টাটা সুমোর কথা বললাম। ওর আর নয়নার ফস্টিনস্টির কথা বললাম। স্কুল ভ্যানটার কথা বললাম। বললাম সায়োনারার কথা।

নেশায় ধোঁয়াটে হয়ে থাকলেও কেকে গোল-গোল চোখে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। বোধহয় ছ'মাস আগের ব্যাপারগুলো মনে করার চেষ্টা করছিল।

'তুমি...তুমি কে? এই জুসে কি বিষ মেশানো ছিল?' ওর গলা কেঁপে গেল।

আমি হাসলাম। বললাম, 'না, বিষ নেই। বিষ থাকলে সেটা শর্ট কিলিং হয়ে যেত।'

তারপর ব্যাগের ভেতরে হাত ঢুকিয়ে দেশলাই-বাক্সের মাপের একটা রিমোট কন্ট্রোল ইউনিট বের করলাম। আমি জানি এটার কোন বোতামে চাপ দিলে কাজ হবে। রণজয় আমাকে শিখিয়ে দিয়েছে।

'সত্যিই তো। আমি সায়োনারার কে হতে পারি? কে এতবড় ঝুঁকি নিয়ে "ব্লু হেভেন"-এর মতো নোংরা নাইটক্লাবে দিনের পর দিন আসবে? মেয়ে মারা যাওয়ার শোধ নিতে কে তোমার মতো পচা আবর্জনার কাছ থেকে অপমান আর ঘাম গায়ে মাখতে পারে? হুঁঃ! এই আই.কিউ. নিয়ে তুমি ডনগিরি করো।'

কেকে ঠিক বুঝতে পারছিল না আমি কী করতে চলেছি। অবশ্য ওর বুঝতে পারার কথাও নয়।

মুন্নি কখন যেন আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল। ঘেন্নার চোখে কেকে-র দিকে তাকিয়ে ছিল।

আমি পায়ে-পায়ে কেকে-র কাছ থেকে পিছিয়ে দূরে সরে এলাম—দরজার কাছে। মুন্নিও আমার পাশে-পাশে পিছিয়ে এল।

'সুইটি, তোমার কথা আমি কিছুই বুঝতে পারছি না!' কথা বলতে-বলতে কেকে রিভলভারটার সেফটি ক্যাচ পরখ করছিল।

আমি মুন্নিকে আঙুল দিয়ে দেখালাম। বললাম, 'ওর দিকে ভালো করে তাকাও তা হলে সব মনে পড়ে যাবে। এই যে, আমার মেয়ে মুন্নি, ভালো নাম সায়োনারা। ভালো করে দ্যাখো—।'

কেকে তাকাল, কিন্তু মুন্নিকে দেখতে পেল না। এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। মুন্নিকে আমি ছাড়া আর কেউ দেখতে পায় না। অ্যাক্সিডেন্টের পর থেকে শুধু আমিই ওকে দেখতে পাই।

আমি বললাম, 'কেকে, তুমি কিন্তু এখন আর বেঁচে নেই। ওই ককটেল জুস খাওয়ার পর থেকেই তুমি মরে গেছ—।'

'মানে?' দেখলাম, এসি থাকা সত্ত্বেও কেকে-র কপালে ঘাম : 'তুমি কি ওতে বিষ মিশিয়ে দিয়েছ?' আবার জিগ্যেস করল কেকে। গলার কাছে হাত নিয়ে গেল।

আমি হেসে বললাম, 'না, না, বিষ নয়। ওসব সেকেলে টেকনিক। ওই ককটেল জুসের বোতলে ইনজেক্ট করে লিকুইড এক্সপ্লোসিভ মেশানো ছিল। এর কোনও স্বাদ নেই, রং নেই, গন্ধ নেই—শুধু ক্ষমতা আছে...।'

কেকে রিভলভারটা আমার দিকে উঁচিয়ে ধরল।

কিন্তু ওই পর্যন্তই।

কারণ, ঠিক সেই মুহূর্তে আমি রিমোট ইউনিটের বোতামে চাপ দিয়েছি। আর সঙ্গে সঙ্গে কেকে একটা বোমার মতো প্রচণ্ড শব্দে ফেটে গেছে।

শব্দ। আগুন। ধোঁয়া।

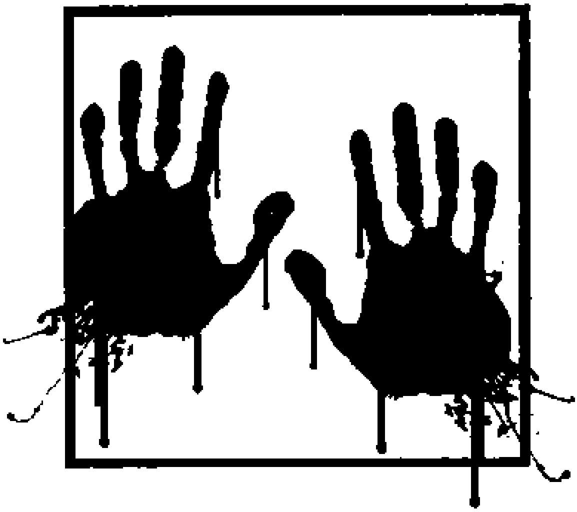
বিস্ফোরণের সঙ্গে-সঙ্গে আমি করিডরে ছিটকে পড়লাম। ডনের ছিন্নভিন্ন টুকরোর ঝাপটা এসে লাগল আমার গায়ে।

কোনওরকমে উঠে দাঁড়িয়ে ছুটলাম বাইরের দিকে।

চারিদিক ধোঁয়ায় ঝাপসা। তারই মধ্যে ধাক্কাধাক্কি, ছুটোছুটি, হইচই।

আমি চোখ ফেরাতেই মুন্নিকে দেখতে পেলাম। শূন্যে ভাসছে, হাসছে, হাত নেড়ে টা টা করছে। 'সায়োনারা' জাপানি ভাষায় 'বিদায়'।

তারপরই আমার মেয়ের ছায়াটা বাতাসে মিলিয়ে গেল।



রুপোলি ফ্লাস্ক

প্রথম কবে রূপক সরকারের সঙ্গে দেখা হয়েছিল মনে নেই। তবে এটুকু মনে আছে, পার্ক স্ট্রিটের 'ফাউন্টেন' বারে প্রায় প্রতিদিন সন্ধেবেলাতেই ওঁর সঙ্গে আমার দেখা হত। রূপক সরকারের দিকে আমার একবার নজর গেলে চোখ ফেরানো মুশকিল। এবং এই নজরবন্দি হওয়ার কারণ রূপকের রূপ নয়, ওঁর ফ্যাকাসে মুখ। সে-মুখে রক্তের যেন ছিটেফোঁটাও নেই।

রূপক সরকারের চেহারা মাঝারি, বয়েস মোটামুটি পঁয়তাল্লিশ, গভীর কালো চোখ, এবং ওঁর ফ্যাকাসে সাদা মুখে এই দুটো কালো বৃত্ত ছাড়া আর কোনো রঙের প্রলেপ নেই। মুখ নয়, সাদা চকচকে রুপোর পাতে তৈরি একটা মরণ-মুখোশ। প্রথম নজরে ওঁকে দেখে আমি চমকে উঠেছিলাম।

বারে ওঁর আসা-যাওয়া ছিল দারুণ নিয়মমাফিক। ঠিক সাড়ে সাতটায় আসেন, কোণের একটা টেবিল বেছে নিয়ে গেলাসের পর গেলাস বিয়ার-হুইস্কি খেয়ে চলেন। তারপর সওয়া ন'টা বাজলেই অস্বস্তিভরে বারবার তাকান ঘড়ির দিকে, চারপাশে ইতিউতি চোখ বুলিয়ে নেন। তারপর ঠিক সাড়ে ন'টায় বেরিয়ে যান। 'ফাউন্টেন'-এর বেয়ারাদেরও এই নিয়ম মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল। সওয়া ন'টা বাজলেই ওরা বিল নিয়ে এসে হাজির হত সরকারের টেবিলে।

একদিন রাত আটটা নাগাদ 'ফাউন্টেন'-এ ঢুকে দেখি কোণের টেবিলে

যথারীতি রূপক সরকার উপস্থিত ও নেশায় নিমগ্ন। টেবিলের দ্বিতীয় চেয়ারটা খালি দেখে আলাপ জমানোর উদ্দেশ্যে সোজা এগিয়ে গেলাম ওঁর কাছে। বললাম, 'বসতে পারি?'

'ওহ শিওর,' জড়ানো লাজুক গলায় বললেন সরকার।

ধন্যবাদ জানিয়ে বসলাম। হেসে বললাম, 'আমার নাম নিশানাথ সান্যাল। আপনাকে প্রায় রোজই এখানে দেখি—'

'আমি রূপক সরকার—' হাত বাড়িয়ে দিলেন তিনি—'ফাউন্টেন আমার ফেভারিট জায়গা। আই লাইক ইট।' আমরা পরস্পরের হাত ঝাঁকালাম।

এভাবেই আলাপের সূত্রপাত, এবং বিভিন্ন বিষয়ে আমাদের কথা শুরু হল। ভারতের বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থা, কলকাতার ফুটবল, অ্যাপল, নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের মূল্যবৃদ্ধি, ইত্যাদি বহু জিনিস নিয়েই আমরা আলোচনা করলাম।

সাড়ে ন'টা পর্যন্ত আমাদের কথাবার্তা গতিহীন, ক্লান্তিহীন। রাতের পর রাত আমাদের আলাপ ক্রমে ঘন হয়ে উঠতে লাগল। হয়তো একটা বন্ধুত্বও গড়ে উঠল দুজনের মধ্যে।

একদিন দুজনে একই সঙ্গে বার ছেড়ে বেরোলাম। হাঁটতে শুরু করলাম নির্জন পথ-ধরে।

কথায় কথায় জেনেছি রূপক সরকার পেশায় ডাক্তার, থাকেন কাছেই ক্যামাক স্ট্রিটে, একটা ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়ে। আজ অন্যদিনের মতো ট্যাক্সি ডাকার চেষ্টা না করে তিনি হাঁটতে শুরু করেছেন, এবং আমাকেও ছাড়তে চাননি। একসময় হঠাৎই সরকার বললেন, 'চলুন, আজ আমার বাড়ি চলুন —বিদেশি শ্যাম্পেন আছে, একসঙ্গে খাওয়া যাক—'

আমি অবাক হলাম। কিন্তু রূপক সম্পর্কে আমার নিজের যথেষ্ট কৌতূহল থাকায় ওঁর প্রস্তাবে রাজি হলাম। ওঁকে অনুসরণ করে পৌঁছলাম ওঁর ফ্ল্যাটে।

ফ্ল্যাটে ঢুকতেই বিলাসি সাজগোছের পরিচয় পেলাম। আকারে বিশাল ও প্রকারে রাজকীয় রূপকের আবাস। নিজেকে সামলে নেওয়ার আগেই সরকার হঠাৎ আমাকে বললেন, 'আপনি এক মিনিট বসুন, আমি আসছি—' উত্তরের অপেক্ষা না করেই তিনি ভেতরের কোনও একটা ঘরে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

বসবার ঘরে আমি একা দাঁড়িয়ে। ঘরের ওপর জারপ-নজর রেখে সরকারের অপেক্ষায় রইলাম। ডান দিকের দেওয়ালে সুদৃশ্য বইয়ের তাকে সুচারুভাবে সাজানো দেশি-বিদেশি বইয়ের মেলা আমাকে আকর্ষণ করল। সেদিকে এগিয়ে গেলাম। প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই পেছন থেকে শোনা গেল দরজা খোলার শব্দ, এবং

তাকে অনুসরণ করে দৃপ্ত পায়ের ছন্দ।

'কী দেখছেন, বই?' শুনতে পেলাম খুশি-খুশি সরকারের গলা ঃ 'বই পড়তে বুঝি ভালোবাসেন আপনি?'

'সেরকম পোকা নই, তবে মাঝে-মাঝে—' কথা বলতে বলতে আমি ওঁর দিকে ঘুরে তাকিয়েছি, আর সঙ্গে-সঙ্গে ভীষণভাবে চমকে উঠেছি।

আমার সামনে এক নতুন রূপক দাঁড়িয়ে।

গত কয়েকমাস যে রূপকের সঙ্গে আমি আলাপ করেছি, কথা বলেছি, এঁর সঙ্গে তাঁর কোনও মিল নেই। এখন রূপকের চোখমুখ প্রাণবন্ত, উজ্জ্বল, ফরসা গাল টুকটুকে লাল—যেন রক্তগোলাপ। বহু-চেনা ফ্যাকাসে ভাব কোথায় মিলিয়ে গেছে।

আমি অবাক চোখে নিষ্পলকে তাকিয়ে রইলাম।

'আমাকে দেখে চমকে গেছেন মনে হচ্ছে?' তিনি প্রশ্ন করলেন।

'হ্—হ্যাঁ। মানে, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। আপনি যেন পলকে ঝকঝকে টকটকে হয়ে উঠেছেন। কোনো জাদু-টনিক খেয়ে এলেন নাকি?'

ডক্টর সরকার একটু ভেবে বললেন, 'আপনাকে সব বলব। তবে তার আগে এক গেলাস করে হয়ে যাক।' সরকারের সুরে মনে হল তিনি যেন বেশ মজা পেয়েছেন। দ্রুত পায়ে এগিয়ে গেলেন দেওয়ালে গাঁথা ক্যাবিনেটের কাছে। দরজা খুলে বোতল বের করে দুটো গেলাসে ঢেলে নিলেন নেশা। কাছে এগিয়ে এসে একটা গেলাস আমার দিকে বাড়িয়ে দিলেন। হেসে বললেন, 'ঠিকই ধরেছেন, জাদু টনিকই বটে। রক্ত।'

'রক্ত? কী বলছেন আপনি?' বোকার মতো ওঁর কথার প্রতিধ্বনি তুলে আমি প্রশ্ন করলাম।

একটা সোফায় বসে শরীর এলিয়ে দিলেন রূপক সরকার। আমাকে বললেন, 'বসুন—' তারপর সরাসরি আমার চোখে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন, 'আপনি ভ্যাম্পায়ারে বিশ্বাস করেন?'

'না—মানে, ও নিয়ে তেমন ভাবিনি—' থতমত খেয়ে অগোছালো উত্তর দিলাম।

'বেশ, তা হলে এখন থেকে ভাবুন—' সরকারের হাসি ধীরে-ধীরে মিলিয়ে যাচ্ছে। অন্তরঙ্গ ভাবের বদলে এক অদ্ভুত দূরত্বের আবরণ ওঁর মুখের ওপরে নেমে এল। তারপরঃ 'ভ্যাম্পায়ার হল আসলে অ-মৃত। দিনের বেলা ওরা সাধারণ মৃতদেহের মতো নির্জীব হয়ে পড়ে থাকে লুকোনো কোনও জায়গায়,

আর রাতের অন্ধকার নেমে এলেই ওরা রক্তের খোঁজে চলাফেরা করে বেড়ায় জীবন্ত মানুষের জগতে। মানুষের রক্ত না হলে ওদের চলে না। আর যাদের রক্ত ওরা চুষে খায়, তারাও ধীরে-ধীরে ভ্যাম্পায়ার হয়ে যায়।'

এ সব কথার কোনও উত্তর হয় না। একবার মনে হল সরকার হয়তো আজ একটু বেশিই খেয়ে ফেলেছেন। সুতরাং হাতের গেলাসে একটা ছোট্ট চুমুক দিয়ে চুপ করে রইলাম।

সরকার বলে বললেন, 'আমাদের বংশে কয়েকশো বছরের পুরোনো এক অভিশাপ আছে। আমার ঠাকুরদার বাবা, ঠাকুরদা, আমার বাবা—সবাই মারা গেছে ভ্যাম্পায়ারের হাতে। ওরা আমাকেও মেরে ফেলার চেষ্টা করছিল-—বহু বছর ধরেই সে চেষ্টা করে চলেছে; কিন্তু বরাবরই আমি ওদের ফাঁকি দিয়েছি।'

ওঁর কথা বিশ্বাস করছি, এমন ভান করাটাই ভালো হবে বলে মনে হল। তা ছাড়া আমার বেশ কৌতূহলও হচ্ছে। সুতরাং জানতে চাইলাম, 'কী ভাবে ফাঁকি দিলেন?'

'বছর দুয়েক আগেও আমাকে ভীষণ সাবধানে থাকতে হত। নামকরা কোম্পানির যুৎসই তালা কিনেছি। সন্ধের পর থেকে সূর্য ওঠা পর্যন্ত বাড়ি ছেড়ে একটি পাও বেরোতাম না। কোনও লোকের সঙ্গে বন্ধুত্ব করিনি। কোনও মেয়ের সঙ্গে প্রেম করিনি। এমনকী বিয়ে পর্যন্ত করিনি।'

'তা হলে জীবনটা আপনার একা-একাই কেটেছে বলতে হয়।' নির্বিকারভাবে মন্তব্য করলাম।

রূপক সরকার দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, 'যা বলেছেন! তবে খুশির কথা বলতে হবে, ভ্যাম্পায়ারদের হাত থেকে বাঁচার একটা নতুন পথ আমি বের করেছি। ডাক্তারি করে বেশ ভালো পয়সাই আমার ইনকাম হত। এ ছাড়া চারটে বই লিখে আমি বেশ মোটা রয়্যালটি পেয়েছি। এই সমস্ত টাকা একজোট করে আমি গবেষণা শুরু করলাম গোপনে—কীভাবে নিজের সমস্যার সমাধান করা যায়, এই প্রশ্নের উত্তর ভেবে চললাম রাত-দিন। মাত্র বছর দুয়েক আগে আমার গবেষণা শেষ হয়েছে—সমস্যার সমাধান আমি পেয়েছি। আর তার পর থেকেই সন্ধের পর আমি রাস্তাঘাটে নিশ্চিন্তে ঘুরে বেড়াতে পারি। কোনও দুশ্চিন্তা আমার হয় না।'

'তার মানে, ভ্যাম্পায়ারের হাত থেকে বাঁচার টেকনিক আপনি পেয়ে গেছেন?' আমি জিগ্যেস করলাম।

'হ্যাঁ, অনেকটা সেইরকমই,' শব্দ করে হাসলেন সরকার, তারপর তড়াক করে উঠে দাঁড়ালেনঃ 'এক মিনিট—আপনাকে দেখাচ্ছি—' এই বলে দ্রুত পায়ে আবার অদৃশ্য হয়ে গেলেন ভেতরের ঘরের দিকে।

একটু পরেই তিনি ফিরে এলেন, হাতে একটা রুপোলি রঙের ফ্লাস্ক। সেটার গায়ের কারুকাজ ও শিল্পকলা মুগ্ধ হয়ে দেখার মতো।

আমি ওটা ছুঁয়ে দেখলাম। রুপোলি—তবে রুপোর তৈরি নয়। হয়তো পিতলের ওপরে প্লেটিং করা রয়েছে। খাঁটি রুপোর তৈরি হলে আমি ঠিক বুঝতে পারতাম। আমি খাঁটি রুপো চিনি।

'এটা আমাদের বংশের অনেক পুরোনো আমলের জিনিস—' সরকার বলতে শুরু করলেন, 'বহুদিন এটা এমনি পড়ে ছিল—ভাগ্যের পরিহাস বলতে হবে যে আজকাল এটা আমার ভীষণ কাজে লাগছে। এক কথায় আমার প্রাণ। আসল ব্যাপারটা এবার আপনাকে বলি' আবার সোফায় বসলেন, 'আমি একটা সিরাম ইনভেন্ট করেছি, সেটা ঘণ্টা কয়েকের জন্য মানুষের প্রাণ বাঁচিয়ে রাখতে পারে। নিজের শরীরে ওই সিরামটা ইনজেক্ট করে ঢোকানোর পর ইচ্ছে করলে আমি আমার বডির সমস্ত ব্লাড বের করে দিতে পারি—আমার তাতে কোনও অসুবিধেই হবে না...'

আমি ক্রমশ অবাক হতে লাগলাম।

'আর গত দু-বছর ধরে আমি ঠিক তাই করে চলেছি। সিরাম নেওয়ার পর বডির সমস্ত ব্লাড বের করে আমি এই রুপোলি ফ্লাস্কে ভরে রাখি। তারপর ফ্লাস্কটাকে একটা থার্মোস্ট্যাটিক বাথ-এ বেখে দিই, যাতে ভেতরকার রক্তের টেমপারেচারের কোনওরকম হেরফের না হয়। তারপর ব্লাডলেস বডি নিয়ে তিন-সাড়ে তিন ঘণ্টা আমি দিব্যি কাটিয়ে দিতে পারি। মন-প্রাণ খুলে ফুর্তি করি। কারণ আমি জানি, যে-মানুষের শরীরে এক ফোঁটা রক্ত নেই, তাকে নিয়ে কোনও ভ্যাম্পায়ারের কোনও মাথাব্যথা নেই। তারপর সময় হয়ে গেলে আমি চটপট ফিরে আসি, আবার রক্ত ভরে নিই শরীরে—নরম্যাল হয়ে যাই।'

অবিশ্বাসে মাথা নাড়লাম আমি : 'কিন্তু এ তো সিম্পলি ইমপসিব্‌ল!'

'না ইমপসিবল নয়-' সামনে ঝুঁকে এলেন রূপক সরকার, 'ফাউন্টেন বার-এ আপনি আমাকে দেখেছেন, আর একটু আগে রক্ত নেওয়ার পর আপনি আমার চেঞ্জটাও লক্ষ করেছেন। নিজের চোখে দেখা প্রমাণ কি কেউ অবিশ্বাস করতে পারে?'

'কী জানি, জানি না... একটু থেমে বললাম, 'তা আপনি এই সিরামটা পেটেন্ট নিয়ে বাজারে বিক্রি করার কথা ভাবেননি? ভ্যাম্পায়ারদের কথাটা যদি সত্যি হয় তা হলে তো এ সিরাম দারুণ বিক্রি হবে!'

প্রতিবাদে মুখর হয়ে সঙ্গে-সঙ্গে উত্তর দিলেন রূপক সরকার, 'না না সেটা করলে খুব বোকার মতো কাজ হবে। ওষুধের ফর্মুলা সবাই জেনে গেলে সাংঘাতিক বিপদ হবে। একবার ভেবে দেখুন তো, যদি কেউ—' হঠাৎই থমকে গেলেন তিনি। বোধহয় বুঝতে পারলেন, এই প্রথম তিনি তাঁর গোপন আবিষ্কারের কথা দ্বিতীয় কোনও ব্যক্তিকে বলছেন। তাঁর আশঙ্কার কারণ আন্দাজ করতে আমার অসুবিধে হল না।

এক অদ্ভুত নিস্তব্ধতা আমাদের ঘিরে ধরল। দুজনেই চুপচাপ।

নিজের গোপন কথা আমাকে হঠাৎ বলে ফেলায় কেমন যেন অস্বস্তিবোধ করছেন রূপক, আর ওঁর এই অস্বস্তি আমাকেও অস্বস্তির মধ্যে ফেলে দিয়েছে, তবু আমরা কথাবার্তা চালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলাম। সরকার অন্যমনস্কভাবে রুপোলি ফ্লাস্কটা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগলেন। মাঝে মাঝেই অদ্ভুত নীরবতা এসে জাঁকিয়ে বসতে লাগল আমাদের আলোচনার মধ্যে। সুতরাং প্রথম সুযোগেই হোঁচট খাওয়া সরকারের কাছে বিদায় নিলাম। হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললাম, 'ওরে বাবা! এগারোটা বাজে। আজ উঠি—'

রূপক সরকারের জড়ানো উত্তর স্পষ্ট বোঝা গেল না। তবে স্বস্তির ভাব ফুটে উঠল ওঁর চোখেমুখে। যাওয়ার আগে বলে গেলাম, 'ফাউন্টেন'-এ আবার দেখা হবে।

দেখা আমাদের হল। হতে থাকল। একদিন ডক্টর সরকারকে পালটা নেমন্তন্ন করলাম আমার ফ্ল্যাটে। লক্ষ করলাম, ওঁর বিচলিত ভাবটা অনেকখানি মিলিয়ে গেছে। আচরণ আবার সহজ-স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে। তবে আমাদের বন্ধুত্বের তালটা কেন জানি না কোন সূক্ষ্ম কারণে কেটে গেল। দেখা-সাক্ষাৎ হলে কুশল বিনিময় করলেও আন্তরিক আবেগটা যেন সরকারের ব্যবহার থেকে মুছে গেছে।

এরপর সপ্তাহ-দুয়েক আমাদের বিশেষ কথা হয়নি। অথচ দুজনেই একই বার-এ নিয়মিত হাজিরা দিয়ে গেছি। অবশেষে আবার একদিন রাত ন'টা নাগাদ আমরা 'ফাউন্টেন'-এ মুখোমুখি পড়ে গেলাম।

সরকার যথারীতি ভদ্রতাবশে হেসে জিগ্যেস করলেন, 'কেমন আছেন?'

আমার মন-মেজাজ বিশেষ ভালো ছিল না। সন্ধে থেকে সময়টা তেমন ভালো কাটেনি। সুতরাং দায়সারা জবাব দিয়ে ওঁকে এড়িয়ে গেলাম। বিদেশি মদও কেমন যেন বিস্বাদ লাগছে। শরীর আর মন—দুটোই কোনও কারণে অস্থির। একটু পরেই বার ছেড়ে বেরিয়ে পড়লাম। রওনা হলাম বাড়ির দিকে।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই বাড়ি ফিরে এলাম। হাত-মুখ ধুয়ে জামাকাপড় ছেড়ে নিলাম। রোজকার মতো খাওয়ার টেবিলে বসতে যাব, কলিংবেল বেজে উঠল।

অবাক হলাম। কে ডাকতে এল এত রাতে?

টেবিল ছেড়ে উঠে গেলাম দরজার কাছে। দরজা খুলতেই দেখি রূপক সরকার দাঁড়িয়ে। ওঁর কালো চোখে উদ্‌ভ্রান্ত বন্য দৃষ্টি। মুখ কাগজের মতো ফ্যাকাসে।

'কী ব্যাপার, এত রাতে?' আমি জিগ্যেস করলাম।

'ওটা চুরি হয়ে গেছে!' রুদ্ধশ্বাসে বলে উঠলেন সরকার।

'কোনটা?'

'রুপোলি ফ্লাস্কটা! আপনি ওদের বলে দিয়েছেন। নিশ্চয়ই সব বলে দিয়েছেন!'

এত রাতে আলটপকা হাজির হয়ে সরকারের এই ছেলেমানুষি অভিযোগে আমার বিরক্ত লাগল।

রূঢ় স্বরে ওঁকে বললাম, 'দেখুন, আমি কাউকে কিছু বলিনি। আর আপনার ওই গাঁজাখুরি ভ্যাম্পায়ারের গল্পে আমার এককোঁটা বিশ্বাস নেই! আপনি নিজেই হয়তো ফ্লাস্কটা ভুল করে অন্য কোথাও রেখেছেন। ভালো করে খুঁজে দেখুন গিয়ে।'

কর্কশভাবে তিক্ত হাসি হাসলেন রূপক সরকার : 'ভুল করব? নিজের রক্ত জায়গামতো রাখতে কখনও কারও ভুল হয়?...যে করে হোক ওটা আমাকে খুঁজে বের করতেই হবে—এক্ষুনি। হাতে আর সময় নেই। ওটা কোথায় যে গেল...?'

ঠান্ডা গলায় বলে উঠলাম, 'আপনার ফ্লাস্কের ব্যাপারে আমি কিছু জানি না, আর জানতেও চাই না। তবে বন্ধু হিসেবে একটা কথা আপনাকে বলি—এক্ষুনি কোনও হাসপাতালে যান, গিয়ে রক্ত নিন। এ ছাড়া আর কিছু করার নেই—।'

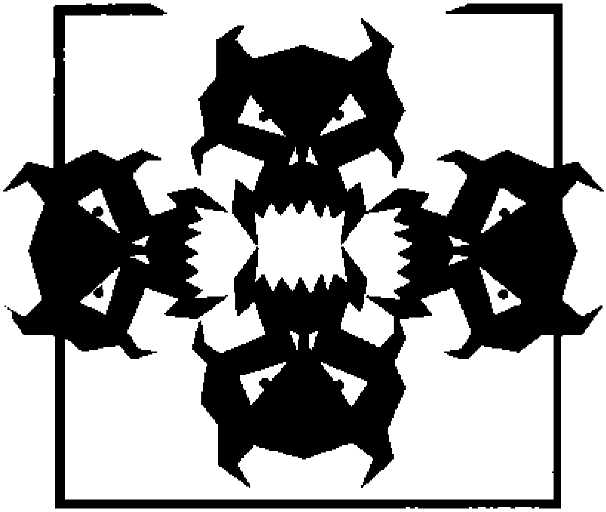
ওঁর মুখের ওপর দমাস করে দরজা বন্ধ করে দিলাম। সঙ্গে-সঙ্গে কলিংবেল আবার বাজতে শুরু করল। এক টানা।

আমি ভ্রূক্ষেপও করলাম না। সোজা এগিয়ে গেলাম খাওয়ার ঘরে। টেবিলে বসলাম।

এ[illegible]ারে কলিং বেলের শব্দ থেমে গেল।

এবারে [illegible]শলি ফ্লাস্কটা টেবিলের নীচে রাখা একটা বাক্স থেকে বের করলাম। ওটার ঢাকনা খুলে কাত করে ধরলাম আমার কাপের ওপর। নিয়মমাফিক কায়দার চেয়ে এভাবে খাওয়া অনেক ভালো। ইস্, দুনিয়ার সব ক'টা লোকই যদি রূপক সরকারের মতো হিসেবি হত, বুদ্ধিমান হত, তা হলে কত সুবিধে হত আমাদের!





ডাক যখন আসে

তখন ডাক্তাররা সাড়া না দিয়ে পারে না। এটাই ডাক্তারদের ধর্ম। রুগির কল এলে যেতেই হবে। সে তুমি এম. বি. বি. এস. কি এম. ডি. হও, কিংবা এল. এম. এফ. কি আর. এম. পি. হও—' কথা বলতে-বলতে ডক্টর পণ্ডিত হাসলেন ঃ 'আজকালকার অনেক ইয়াং ডাক্তার শুনি রাতবিরেতে ডাক এলে যায় না। হয় বউয়ের আড়ালে ঘাপটি মেরে থাকে, নয়তো ফ্যামিলির কেউ বারান্দা কি জানলা দিয়ে বলে দেয়, ডাক্তারবাবুর ভীষণ শরীর খারাপ কাল সকালে আসবেন'।

আমরা তিনজন বেশ মন দিয়ে অংশুদার কথা শুনছিলাম। অংশুদা মানে ডক্টর অংশবিহারী পণ্ডিত। ওঁর 'অংশবিহারী' নামের যে কী ছাতার মানে কে জানে! তাই আমরা প্রায় সবাই ওঁকে 'অংশদা'-র বদলে 'অংশুদা' বলে ডাকি। কিন্তু অংশুদা ওঁর নামের ব্যাখ্যা দিলে বলেন, 'শোন, আমাদের জীবদ্দশায় আমরা এই দুনিয়ার ছোট্ট একটা অংশেই শুধু ঘুরে বেড়াই। তাই আমার অংশবিহারী নামটা ভীষণ অ্যাপ্রোপ্রিয়েট, বুঝলি'

এরপর আর কোনও কথা চলে না।

অংশুদার বয়েস প্রায় সাতাত্তর-আটাত্তর হবে। লম্বা শালগাছের মতো চেহারা। মাথার লম্বা চুল ধপধপে সাদা—তবে মাথার মাঝখানটায় চুল

একেবারে ফিকে হয়ে গেছে। আর সেই অভাবটা পুষিয়ে দিয়েছে ধপধপে সাদা চাপদাড়ি।

অংশুদার গায়ের রং ঘোর তামাটে। তা না হয়ে যদি ফরসা হত তা হলে ওঁকে দিব্যি সাহেব বলে চালিয়ে দেওয়া যেত। এত বয়েসেও চেহারা যা রেখেছেন তাতে সাতাত্তরের বদলে ষাট-বাষট্টি বলে ভুল হয়।

ডক্টর পণ্ডিতের কথায় আমি একটু-একটু মাইন্ড করছিলাম—কারণ আমিও 'ডাক্তারি' নামের নোব্‌ল প্রফেশানে আছি। আর রত্নাকরও যে খুব সহজভাবে কথাগুলো হজম করছে তা নয়। কারণ, ও-ও আমার আর অংশুদার মতন ডাক্তার।

শুধু কান্তিলাল অংশুদার কথায় সায় দিয়ে ঘাড় নাড়ছিল আর মাঝে-মাঝে 'হ্যা-হ্যা' করে মোসায়েবের মতো হাসছিল।

হাসবেই তো! ও ব্যাটা যে মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভ! ডাক্তার দেখলেই নমুনা ওষুধের ফাইল আর তেল দেওয়াটা ওর ফান্ডামেন্টাল অভ্যেস।

অংশবিহারী বললেন, 'বুঝলে, কত বছর ডাক্তারি করছি তার কোনও গাছপাথর নেই। আর সেই গাছের ডালে-ডালে আর পাথরের ফাঁকফোকরে কত যে ফ্যান্টাসটিক এক্সপিরিয়েন্সের মণি-মুক্তো জমে আছে তারও কোনও হিসেব নেই...।'

আমরা জানি, এবারে সেই মণি-মুক্তোর পাহাড় থেকে একপিস মণি কিংবা মুক্তো অংশুদা আমাদের প্রেজেন্ট করবেনই—সে আমরা চাই বা না চাই। এরকম মণি মুক্তোর পিস আমরা আগেও পেয়েছি।

হাতের সিগারেটে হুস-হুস করে চার-পাঁচবার টান দিয়ে অংশুদা চোখ বুজে ফেললেন। কিছুক্ষণ ওই পোজটা মেনটেন করার পর চোখ খুলে বললেন, 'আমার ছোটবেলায় একটা অদ্ভুত কেস হয়েছিল—।'

আমি ফস করে জিগ্যেস করলাম, 'আপনি কি ছোটবেলা থেকেই ডাক্তার নাকি?'

আমার প্রশ্নে রত্নাকরের মুখে একটুকরো বাঁকা তৃপ্তির হাসি খেলে গেল লক্ষ করলাম।

অংশুদা হেসে আমার দিকে তাকালেন : 'কী বুদ্ধি! আমি আমার ডাক্তারির ছোটবেলার কথা বলছি।' আরও দুবার সিগারেটে টান। আরও একবার চোখ বোজা পোজ। তারপর : 'শোনো, ডক্টর অভিনন্দন সরকার—গলায় স্টেথো ঝোলালেই কেউ ডাক্তার হয় না, গায়ে কালো কোট চাপালেই কেউ উকিল

হয় না। আসল ব্যাপার হল রেসপেক্ট টু ইয়োর প্রফেশান অ্যান্ড টু মেনটেন ডিগনিটি অফ ইয়োর প্রফেশান...।'

আজ সন্ধেবেলা এক ওষুধ কোম্পানির দেওয়া পার্টিতে আমরা জড়ো হয়েছিলাম। ওষুধ কোম্পানির প্রচার-বক্তৃতা, ডাক্তারি আলোচনা, খাওয়াদাওয়া, আড্ডা সবকিছু শেষ হওয়ার পর আমরা ছোট-ছোট দলে ভাগ হয়ে বিক্ষিপ্তভাবে বসে গ্যাঁজানি চালিয়ে যাচ্ছিলাম। ডক্টর অংশবিহারী পণ্ডিত মেডিসিনের খুব ঘ্যামটেক ডাক্তার। কিন্তু আমাদের তিনজনের অনেকদিনের চেনা বলে আমাদের কাছে 'অংশুদা' হয়ে গেছেন। ঠিক যেন আমাদের গার্জেন। ওঁর জ্ঞান আর গুণ আমাদের তিনজনকে খুব টানে। তাই ওঁর বকুনিতেও আমরা রাগ-টাগ করি না।

টানের পর টান মেরে সিগারেটটা খতম করলেন অংশবিহারী। তারপর গলাখাঁকারি দিয়ে শুরু করলেন। একটা মণি অথবা মুক্তো ওঁর পকেট থেকে বেরিয়ে এল।

আমি তখন খুব ছোট। মাত্র বছরতিনেক হল ডাক্তারি শুরু করেছি। তো আমাকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল পুরুলিয়ার কামারাগোড়া নামের একটা জায়গায়। সেখানে বিত্তি নামের একটা গ্রামে একটা মেডিক্যাল ক্যাম্প খোলা হয়েছিল। ওই ক্যাম্পে আমি ছিলাম 'নীলমণি' ডাক্তার—মানে, সবে ধন নীলমণি আর কী।

জায়গাটা পশ্চিমবঙ্গ আর বিহারের বর্ডারের কাছাকাছি। সময়টা নাইনটিন ফিফটি এইট কি ফিফটি নাইন হবে। সেসময়ে ওরকম একটা জায়গার অবস্থা বুঝতেই পারছ! দু-চার ঘর অবস্থাপন্ন মানুষ ছাড়া সবাই খুব গরিবগুরবো। গোটা গ্রামে একজন বৃদ্ধ কোবরেজ, একজন হোমিওপ্যাথ, আর একজন এল. এম. এফ.—ওঁরা তিনজনই ছিল বিত্তি গ্রামের টোটাল মেডিকাল স্ট্রেংথ। ওঁদের হাতে কেউ-কেউ সেরে উঠত, কেউ বা রোগ সারাতে না পেরে রোগের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিত, আবার যাদের কপাল তার চেয়েও খারাপ তারা রোগ-জ্বালার বালাই থেকে চিরবিদায় নিত।

আমার মেডিক্যাল ক্যাম্প বলতে একটা একতলা বাড়ি। পাকা দেওয়াল, মাথায় টিনের চাল, চারপাশে গাছপালা, আর খানিকটা তফাতে একটা টিউবওয়েল।

আমি ক্যাম্প খুলে বসতে না বসতেই রুগির আনাগোনা শুরু হয়ে গেল। ওদের কাছেই শুনলাম, শুরু-শুরুতে ওই তিনজন ডাক্তার রুগিদের বেশ আস্থাভাজন ছিলেন। সবাই ওদের বলত 'হামারা ডক্টর'। কিন্তু অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসা যে-ভদ্রলোক করতেন তার অপযশ এতটাই ছড়িয়ে পড়ল যে, তার চলতি নাম হয়ে গেল 'হ্যামার ডক্টর'—মানে, হাতুড়ে ডাক্তার আর কী!

আমি বেশ ভয়ে-ভয়ে চিকিৎসার কাজ শুরু করেছিলাম। খুব ভেবেচিন্তে ওষুধপত্র দিতাম। আর তাতে খুব অল্পসময়েই আমার হাতযশের কথা ছড়িয়ে গেল। রুগিরা খুশি হয়ে ওদের খেতের আনাজপাতি নিয়মিত আমাকে দিয়ে যেত। ধান, আখ, আখের গুড়, লাউ, কুমড়ো—যে যা পারত দিত। বারণ করলেও ওরা শুনত না। ওরা আমার নাম দিয়েছিল 'পণ্ডিত ডাক্তার'। শুধু নাম নয়, ওরা যে-সম্মান আমাকে দিয়েছিল সেটা ওই নামের সঙ্গে যথেষ্ট মানানসই ছিল। তাই ডাক্তার হিসেবে আমার দায়িত্ব ক্রমাগত বাড়ছিল।

ঘটনাটার সূত্রপাত হল বর্ষার মুখে।

গ্রামে স্মল পক্স—মানে, গুটিবসন্ত দেখা দিল। দিনসাতেকের মধ্যে একজন মারাও গেল। ব্যাপারটা এপিডেমিকের লেভেলে না গেলেও গ্রামের লোকজন বেশ ভয় পেয়ে গেল। কেউ-কেউ তো গ্রাম ছেড়ে পালিয়েই গেল।

স্মল পক্স এপিডেমিক যে কী জিনিস সেটা উনিশশো চুয়াত্তরের মহামারিতে বেশ ভালোরকম বোঝা গিয়েছিল। মাত্র পাঁচমাসে প্রায় পনেরো হাজার লোক বিহার, উড়িষ্যা আর ওয়েস্ট বেঙ্গলে মারা গিয়েছিল।

আমি কলকাতা থেকে স্মল পক্স ভ্যাকসিন আনানোর জন্যে পাগল হয়ে গেলাম। নিজেই বারচারেক কলকাতায় ছুটলাম। তোরা তো জানিস, ভ্যাকসিন মানে কাউ পক্সের সিরাম। মানে, গো-বসন্তের রস। কিন্তু এটা কি জানিস, 'ভ্যাকসিন' কথাটা ডক্টর এডওয়ার্ড জেনার প্রথম চালু করেছিলেন, আর শব্দটা তিনি নিয়েছিলেন ল্যাটিন ওয়ার্ড 'ভ্যাক' থেকে।

যাই হোক, ভ্যাকসিন জোগাড় করে আমি লড়াই চালাতে লাগলাম। কিন্তু যাদের গুটিবসন্ত ধরে গিয়েছিল তারা স্রেফ ভগবানের নাম জপতে লাগল। আর মরতেও লাগল। গ্রামের মানুষ ডেডবডি না পুড়িয়ে কবর দিতে লাগল। ওদের বিশ্বাস, মাটি চাপা দিলে পর গুটিবসন্তের জীবাণু আর বাইরে আসতে পারে না। বরং মৃতদেহ শ্মশানে পোড়াতে গেলে এই জীবাণু ছড়িয়ে পড়তে পারে—ডেডবডি নিয়ে যাওয়ার সময়, আবার পোড়ানোর সময়েও।

এইরকম একটা সময়ে বর্ষার প্রকোপ বেড়ে উঠল। একে বর্ষাকাল, তার

ওপরে শুরু হল নিম্নচাপের এফেক্ট। সেসময়ে তো আর আজকের মতো ওয়েদার ফোরকাস্ট করার আধুনিক প্রযুক্তি-টযুক্তি ছিল না! তাই আকাশের দিকে তাকিয়ে লোকজন রোদ কিংবা বৃষ্টির খোঁজে গণৎকারী চালাত। তো তখন বৃষ্টির কেমন এক ধক শুরু হয়ে গেল। যখন খুশি আসে, যখন খুশি জোরে কিংবা আস্তে হয়, আবার তার খামখেয়ালিপনায় কখনও বা হয়তো এক-দু ঘণ্টা বৃষ্টি থেমেই রইল।

টিনের চালে বৃষ্টির চড়বড়-চড়বড় শব্দ আমার কানে সয়ে গেছিল। তাই রাতে ঘুমোতে খুব একটা অসুবিধে হচ্ছিল না। কিন্তু একদিন রাতে ওই বৃষ্টির শব্দ ছাপিয়ে কার যেন ডাক শুনতে পেলাম।

'ডাক্তারবাবু—ডাক্তারবাবু গো—!'

ঘুম ভেঙে গেল। বালিশ থেকে মাথাটা সামান্য তুলে কান খাড়া করে রইলাম।

'ডাক্তারবাবু! ডাক্তারবাবু!' আবার কে যেন ডেকে উঠল।

গলাটা পুরুষ মানুষের। রাতবিরেতে মাঝে-মাঝেই রুগির লোকজন আমাকে ডাকতে আসে। আসে এই ভরসায় যে, এরকম ডাক যখন আসে তখন আমি কারুকে ফেরাই না। এটা মাত্র কয়েকমাসেই বিস্তির সব্বাই জেনে গিয়েছিল। তা ছাড়া 'পণ্ডিত ডাক্তার' বলে গ্রামের লোকজন আমাকে যে সম্মান দিত তাতে ডাক্তারি প্রফেশনের ইমেজকে গ্লোরিফাই করাটা ছিল আমার মেজর রেসপনসিবিলিটি।

রাতের ওই 'ডাক্তারবাবু' ডাকটার মধ্যে কী একটা যেন ছিল। একটা উদ্বেগ, একটা করুণ আর্তি আর তার সঙ্গে মিশে ছিল একজন সর্বহারার বুক ফাটা হাহাকার।

রুগির আত্মীয়স্বজনের কাতর ডাক আমি অনেক শুনেছি। কিন্তু এই ডাকটা ছিল তার থেকে আলাদা।

বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লাম। ঘরের এককোণে রাখা হ্যারিকেনের শিখাটাকে উসকে দিলাম। তারপর সেটা তুলে নিয়ে সদর দরজার কাছে এসে দরজা খুললাম।

বাইরে ঝমঝম করে বৃষ্টি পড়ছে। অন্ধকারে কিছুই প্রায় দেখা যাচ্ছে না।

হ্যারিকেনটা উঁচু করে তুলে ধরলাম। তাতে আগন্তুককে যত না দেখা গেল তার চেয়ে বেশি দেখা গেল সাদা-সাদা বৃষ্টির ফোঁটা।

দরজার বাইরে একটা জং ধরা টিনের শেড। সেখান থেকে অঝোর ধারায়

বৃষ্টির জল গড়িয়ে পড়ছিল। বৃষ্টির চিকের আড়াল ডিঙিয়ে একজন ছায়া-ছায়া মানুষকে দেখা গেল।

আমাকে দেখেই আবার সেই আকুল স্বরে ডেকে উঠল মানুষটা : 'ডাক্তারবাবু, জলদি করি একবার চলেন।'

'কী ব্যাপার, কী হয়েছে?'

'ডাক্তারবাবু, আমি প্রীতানন্দ।' কাঁদো-কাঁদো স্বরে বলল সে, 'আমার মুকুন্দবাবার অবস্থা এখন-তখন। সব্বাই তাঁকে ফেলে পলায়ে গেছে। আপনি দয়া করে একটিবার চলেন...।'

'আসছি— বলে আমি ঘরের ভেতরে চলে এলাম। এক মিনিটের মধ্যে চটপট তৈরি হয়ে বেরিয়ে পড়লাম। আমার সঙ্গে ছাতা, টর্চ আর ডাক্তারি ব্যাগ।

প্রীতানন্দ হাত বাড়িয়ে টর্চ আর ব্যাগটা নিল। তারপর টর্চের আলো ফেলে আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল। ছাতাটা আমি মাথায় দিয়েছিলাম বটে, তবে সেটা শুধু ছত্রধর হওয়ার সান্ত্বনা মাত্র। ঝমঝম বৃষ্টি আর মাতাল বাতাস আমাকে চেটেপুটে খেতে লাগল।

প্রীতানন্দের গায়ে হালকা নীল হাফ শার্ট আর চেক-চেক লুঙ্গি। সেটাও আবার ভাঁজ করে উরু পর্যন্ত তোলা। ওর যেটুকু আমার নজরে পড়ছিল তার সবটুকুই জল সপসপে। কিন্তু সেজন্যে ওকে এতটুকুও বিব্রত কিংবা কাহিল বলে মনে হল না।

প্রীতানন্দকে সরাসরি না চিনলেও ওর সম্পর্কে একটু-আধটু জানি। ওর মুকুন্দবাবার কথাও অল্পসল্প জানি।

'মুকুন্দবাবা' হলেন মুকুন্দশরণ অধিকারী। এ-গ্রামের বর্ধিষ্ণু বাসিন্দা। ওঁকে ছোটখাটো জমিদার বললেও ভুল বলা হয় না। ওঁর বিশাল মাপের তিনতলা বাগানবাড়িতে ওঁর স্ত্রী-ছেলে-মেয়ে ছাড়াও অনেক আত্মীয়স্বজন থাকে। সবমিলিয়ে জমজমে বাড়ি।

মুকুন্দবাবুর খাসবেয়ারা হচ্ছে ওই প্রীতানন্দ। ছোটবেলা থেকেই ওঁর কাছে থাকে। ওঁর জমিজমা চাষবাস দ্যাখে ফাইফরমাশ খাটে। ওঁকে 'মুকুন্দবাবা' বলে ডাকে। শুধু ডাকা নয়, প্রীতানন্দ ওঁকে খুব ভক্তিও করে। গ্রামের অনেকেই প্রীতানন্দকে নিয়ে আলোচনা করে। বলে, আগের জন্মে ও সত্যি-সত্যি মুকুন্দশরণের ছেলে ছিল।

প্রীতানন্দকে আমি আগে কখনও দেখিনি। আর এই রাতে ঝমঝম বৃষ্টিতে

ওকে যে ঠিকঠাক দেখতে পেয়েছি তাও নয়।

যেতে-যেতে প্রীতানন্দ কথা বলছিল। ও বৃষ্টির শব্দ ছাপিয়ে একটু চেঁচিয়ে কথা বলছিল, কিন্তু তারই মধ্যে কেমন একটা কান্না-কান্না ব্যাপার মিশে ছিল।

দিনসাতেক আগে মুকুন্দশরণের গুটিবসন্ত হয়েছে। তাতে বাড়ির সবাই ভয় পেয়ে যায়। এর মধ্যেই গ্রামে বিশ-বাইশ জন এই মারণ রোগে মারা গেছে। সুতরাং, নিজেদের প্রাণ বাঁচানোর জন্যে তারা আর দেরি করেনি। কোনওরকম নোটিশ না দিয়েই স্রেফ পালিয়ে গেছে। ওরা কোথায় গেছে প্রীতানন্দ জানে না। ওই খাঁ-খাঁ বাড়িতে প্রীতানন্দ একা ওর অসুস্থ মুকুন্দবাবাকে আঁকড়ে ধরে পড়ে আছে। যথাসাধ্য সেবা করে চলেছে।

আজ সন্ধে থেকেই মুকুন্দশরণের অবস্থা ভালো নয়। চোখ বুজে হাঁ করে বড়-বড় শ্বাস নিচ্ছেন। আর মাঝে-মাঝেই 'পিতু! পিতু!' বলে জ্বরের ঘোরে প্রীতানন্দকে ডাকছেন। যত রাত বেড়েছে, অবস্থা ততই খারাপের দিকে গেছে। তারপর...।

জল কাদায় মাখামাখি হয়ে আমরা মুকুন্দশরণের বাড়িতে গিয়ে পৌঁছলাম।

একতলার অন্দরমহলের একটা ঘরে ওঁকে শুইয়ে রাখা হয়েছিল। দু-চোখ বোজা। শরীরটা বিছানায় যেন মিশে আছে। গায়ের ওপরে একটা কালো কম্বল চাপানো।

মুকুন্দশরণের বয়েস বড়জোর ষাট-বাষট্টি হবে। কিন্তু যে-মুখটা কম্বলের বাইরে বেরিয়ে আছে সেটা বেশ বুড়োটে। ফ্যাকাশে মুখ, গাল ভেতরে ঢুকে গেছে। কপাল অনেকটা বড়। তার একপাশে একটা শিরা ফুলে রয়েছে। মাথার চুল তেলহীন রুক্ষ।

ঘরে শুধু একটা বাল্‌ব জ্বলছিল। মাথার ওপরে সিলিং ফ্যান থাকলেও সেটা চলছিল না। আলোটা বিছানার মাথার দিকে থাকায় মুকুন্দশরণের চোখের নীচে গাঢ় ছায়া তৈরি হয়ে কালো গর্তের মতো দেখাচ্ছিল। বসে যাওয়া গালেও ছিল একইরকম ছায়া।

বিছানার ডানদিকের দেওয়ালে দুটো জানলা খোলা ছিল। সে-দুটো দিয়ে জোলো বাতাস আসছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও ঘরের ভেতরে কেমন একটা গরম গুমোট ভাব থম মেরে আটকে ছিল। তার সঙ্গে ডেটল আর ফিনাইলের গন্ধ।

প্রীতানন্দ বিছানার পাশে একটা টুল ধরে দিল। আমার ডাক্তারি ব্যাগটা টুলের পাশে রেখে আলতো করে বলল, 'বসেন, ডাক্তারবাবু—।'

আমি বসলাম। মুকুন্দশরণের অবস্থা যা দেখলাম তাতে ডাক্তারি ব্যাগটা

আর খুলতে ইচ্ছে করল না।

ওঁর সারা মুখে গুটিবসন্তের গুটি ঘামাচির মতো ছেয়ে গেছে। বড়-বড় হাঁ করে শ্বাস টানছেন মুকুন্দ। শ্বাস টানার ঘড়ঘড় ফোঁস-ফোঁস শব্দ হচ্ছিল। অনেকক্ষণ জলের নীচে ডুবে থাকার পর কেউ যখন জলের ওপরে উঠে এসে শ্বাস নিতে চেষ্টা করে তখন যেরকম শব্দ হয়, সেরকম শব্দও মাঝে-মাঝে হচ্ছিল. আমি অবাক হয়ে দেখছিলাম, একজন অসুস্থ রুগ্ন মানুষ কীভাবে মরিয়া হয়ে অক্সিজেন টানার চেষ্টা করছে।

বাইরে বৃষ্টির শব্দ হচ্ছিল। সেই শব্দ ছাপিয়ে ওঁর প্রায় কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে আমি গলা তুললাম। জিগ্যেস করলাম, 'কষ্ট হচ্ছে? কী কষ্ট হচ্ছে?'

ওঁর মুখের হাঁ আরও বড় হল। মুখ দিয়ে 'আঁ-আঁ—' করে একটা জড়ানো শব্দ বেরোল।

আমি কম্বলের নীচ থেকে ওর হাতটা বের করে পালস দেখার চেষ্টা করলাম। কিন্তু আঙুল ছোঁয়াব কোথায়! সর্বত্রই হিজিবিজি গুটি।

তবুও দেখলাম।

যেটুকু বুঝলাম তাতে মনে হল সময় আর নেই।

হঠাৎই দেখি খোলা দরজা দিয়ে চারজন মানুষ কখন যেন ঘরে ঢুকে পড়েছে। চুপচাপ এসে মুকুন্দশরণের বিছানার পাশটিতে এসে দাঁড়িয়েছে।

এত রাতে এরা কারা?

আমার মুখের ভাবে প্রীতানন্দ নীরব প্রশ্নটা বুঝতে পেরেছিল। ও আমার কাছে এসে চাপা গলায় বলল, 'এঁরা আশেপাশেই থাকেন- মুকুন্দবাবাকে মাঝে মাঝে দেখতে আসেন।

আমি মানুষগুলোকে দেখছিলাম। ওদের মধ্যে কোথাও কোনও মিল নেই কারণ, ওদের চারজনের বয়েস চাররকম—সবচেয়ে ছোট যে, তার বয়েস ষোলো, আর সবচেয়ে যে বড়, তার বয়েস প্রায় সত্তর-বাহাত্তর। ওদের গায়ের রং ফরসা, তামাটে, কালো এবং মিশকালো। কিন্তু সবারই মুখে কেমন একটা বিষণ্ণ প্রশান্ত ভাব। যেন ওরা বুঝতে পারছে মুকুন্দশরণের সময় ফুরিয়ে এসেছে, ডাক এসে গেছে।

'কীরকম দেখছেন, ডাক্তারবাবু?' প্রীতানন্দ জিগ্যেস করল।

আমি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মাথা নাড়লাম। বললাম, 'সেরকম কোনও আশা দেখছি না, প্রীতানন্দ...।'

আমার কথায় অতিথি চারজনের মুখে বিষণ্ণতার ছায়া গাঢ় হল যেন। ওদের

মধ্যে যে সবচেয়ে বয়স্ক সে মুকুন্দর শিয়রের কাছে গিয়ে ওঁর কপালে হাত রাখল। বিড়বিড় করে কী যেন বলল।

সেদিকে তাকিয়ে বাকি তিনজনে মাথা নাড়ল। যেন বিড়বিড় করে বলা কথাগুলো ওরা শুনতে পেয়েছে।

প্রীতানন্দের মুখেও হতাশ ছায়ার পরত পড়েছে। সেটা লক্ষ করে আমি বললাম, 'প্রীতানন্দ, একবার কোরামিন ইনজেকশান দিয়ে চেষ্টা করে দেখি...।'

ডাক্তারি ব্যাগটা আমি কোলে তুলে নিলাম।

আমার জামাকাপড় বৃষ্টিতে অনেকটাই ভিজে গেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও বেশ গরম লাগছিল। গালে গলায় বেশ ঘাম হচ্ছিল। তাই প্রীতানন্দকে ইশারা করে সিলিং ফ্যানটা চালাতে বললাম।

তখনই খেয়াল করলাম, প্রীতানন্দের জামাকাপড় শুকনো।

অথচ ভেজা জামাকাপড়ে আমি এখনও বেশ নাজেহাল! তা হলে ওর জামাকাপড় শুকোল কী করে! নাকি এক ফাঁকে ও পোশাক বদলে এসেছে? কিন্তু বদলে এলেও কি হুবহু একই রঙের পোশাক পরে আসা সম্ভব? এ তো আর ইউনিফর্ম নয়!

যাই হোক, ওসব চিন্তা ছেড়ে আমি ডাক্তারিতে মনোযোগ দিলাম।

ইনজেকশানটা রেডি করছি, তখনই মুকুন্দশরণ হেঁচকি তুলতে শুরু করলেন। মাথাটা পাগলের মতো এপাশ ওপাশ ঝাঁকাতে লাগলেন। ওঁর থুতনিটা সিলিংয়ের দিকে তাক করে স্থির হয়ে গেল। মুখের হাঁ-টা বিশাল গহ্বরের চেহারা নিল। একটা মিহি হেঁচকির একটানা শব্দ বেরিয়ে এল গলা চিরে। তার সঙ্গে খানিকটা গাঢ় সাদা ধোঁয়া। ধোঁয়ার সাদা আঁকাবাঁকা রেখা শূন্যে ভাসতে লাগল। তখনই বুঝলাম, সব শেষ।

আমি একা নয়। ঘরে হাজির প্রত্যেকেই বুঝতে পেরেছিল সব শেষ।

মুকুন্দশরণের হাঁ করা শীর্ণ মুখটা বীভৎস দেখাচ্ছিল।

প্রীতানন্দ ঝাঁপিয়ে পড়ল কালো কম্বলের ওপরে। মৃত শরীরটাকে আঁকড়ে ধরে চিৎকার করে বিলাপ করতে লাগল।

'মুকুন্দবাবা। মুকুন্দবাবা গো—! আমায় ছেড়ে কোথায় গেলে গো—!'

আমি প্রভুভক্ত আশ্চর্য মানুষটাকে দেখছিলাম। এরকম টান আর ভক্তি-শ্রদ্ধা সহজে দেখা যায় না!

হঠাৎই একটা অদ্ভুত ব্যাপার খেয়াল করলাম।

পাখার হাওয়ায় মৃত মুকুন্দশরণের চুল উড়ছিল। আমার জামার হাতা তিরতির করে কাঁপছিল। আমার মাথার চুলও যে উড়ছে সেটাও দিব্যি টের পাচ্ছিলাম।

কিন্তু ওই পর্যন্তই!

আমি আর মুকুন্দশরণ ছাড়া বাতাস বোধহয় আর কাউকেই স্পর্শ করতে পারছিল না। কারণ, প্রীতানন্দের পোশাক কিংবা চুল বাতাসে একচুলও কাঁপছিল না। অথচ বাতাসের ঝাপট আমি ভালোই টের পাচ্ছি।

প্রীতানন্দ তখনও ইনিয়েবিনিয়ে কাঁদছিল। আর কাঁদতে-কাঁদতেই বলছিল, '...এসব মায়া গো, মুকুন্দবাবা, মায়া...। সেই মায়ার টানে আমি মাটির নীচ থেকেও তোমার সেবা-যত্ন করতে ফিরে এসেছি। আমারে যখন গুটিবসন্ত ধরল তখনই তোমাকে বললাম, "বাবা, পালাও। নইলে এ মারণ রোগ তোমারেও ছুঁয়ে ফেলবে।" তো তুমি গারবের কথা কানে তুললে না, মুকুন্দবাবা। বাবা গো, এবারে যেন তোমার সঙ্গে আমার দেখা হয়! মাটির নীচে একা-একা থাকতে আমার আর ভালো লাগে না, মুকুন্দবাবা...বাবা গো...!'

প্রীতানন্দের বিলাপ শুনব কী, ওর কথাগুলো আমার চেতনায় বরফের ধারালো ছুরির মতো কেটে বসতে লাগল। আমার অসাড় আঙুল থেকে ডাক্তারি ব্যাগটা খসে পড়ে গেল মেঝেতে। পড়ে যাওয়ার সেই শব্দটা বহুদূর থেকে ভেসে আসা ফাঁপা প্রতিধ্বনির মতো বারবার কানে এসে বাজতে লাগল।

আগে চোখে পড়েনি, কিন্তু এখন পড়ল : প্রীতানন্দের পোশাকের নানা জায়গায় মাটির ছাপ! সে কি ও মাটির নীচে থেকে উঠে এসেছে বলে?

আমি ভীষণ ভয় পেয়ে গেলাম। প্রীতানন্দের দিক থেকে নজর ফিরিয়ে চারজন অতিথির দিকে তাকালাম।

ওদের চারজনের পোশাকই শুকনো খটখটে। অথচ বাইরের বৃষ্টি এক লহমার জন্যেও থামেনি। ওদের জামাকাপড়েও দেখলাম, এখানে-সেখানে মাটির দাগ। এটাই বোধহয় ওদের চারজনের মধ্যে একমাত্র মিল।

কিন্তু ওদের জামাকাপড় বাতাসে নড়ছিল না। ওদের প্রত্যেকের ঠোঁটের কোণে এক চিলতে বিষণ্ণ হাসির ছোঁয়া।

ওরা চুপচাপ মুকুন্দশরণের খাটের চারকোণে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর প্রীতানন্দের দিকে প্রশান্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল।

আমি বোধহয় আর সইতে পারিনি। ভয়ে চিৎকার করে উঠেছিলাম। আর একইসঙ্গে প্রশ্ন করে ফেলেছিলাম, 'কে আপনারা? কে?'

উত্তরে যা শুনেছিলাম, সেটা আজও আমার কানে লেগে আছে।

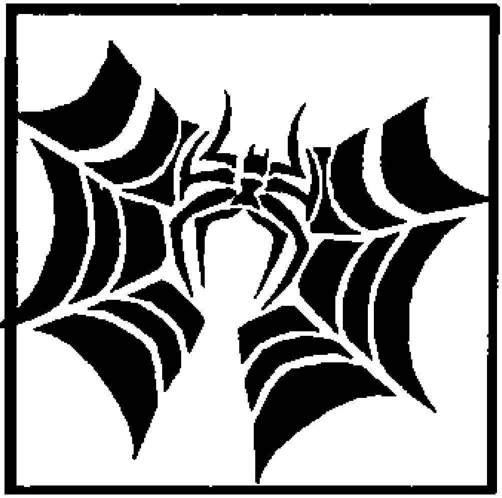
'শস্ত্রসকল আমাদের ছেদন করিতে পারে না। অগ্নি আমাদের দহন করিতে পারে না। জল আমাদের আর্দ্র করিতে পারে না। বায়ু আমাদের শুষ্ক করিতে পারে না...।'

এই কথাগুলোই ওরা সমস্বরে বারবার বলতে লাগল, অথচ ওদের কারও ঠোঁট নড়ছিল না।

আমি শুধু এটুকু বুঝতে পারছিলাম, ওরা সবাই মুকুন্দশরণকে নিতে এসেছে।

ওদের একজন এগিয়ে গেল ঘরের একমাত্র আলোটার কাছে। তারপর একটা হাত লম্বা করে পৌঁছে দিল জ্বলন্ত বাল্‌বটার কাছে। গরম বাল্‌বটা মুঠো করে ধরল। ঘরটা ছায়ায় ছেয়ে গেল। তারপর হাতের চাপ দিতেই শুধু কাচ ভাঙার শব্দ শুনলাম। তবে কিছুই দেখতে পেলাম না।

কারণ, তখন আলো নিভে গেছে।



এপারে তিনজন, ওপারে একজন

ঘরটা অন্ধকার। শুধু নীল রঙের দুটো শিখা জ্বলছে। আবছা আলোয় দেখে মনে হচ্ছে, টেবিলে দাঁড়িয়ে থাকা দুটো মোমবাতি থেকেই আলোটা বেরোচ্ছে, তবে সাধারণ মোমবাতি ওগুলো নয়। বোধহয় সিজিয়ামের কোনও কম্পাউন্ড দিয়ে তৈরি। রুনিয়ার সাবজেক্ট ছিল কেমিস্ট্রি। আর ছিল নানান আবিষ্কারের বাতিক। সে-বাতিক যে এখনও সুপার-অ্যাক্টিভ সেটা এই মোমবাতিগুলো দেখেই বোঝা যায়। এসব নির্ঘাত ওর কাণ্ড।

প্ল্যানচেটে বসলে যে নীল আলোর মোমবাতি জ্বালতে হবে তার কোনও বাঁধাধরা নিয়ম নেই। তবে হলদে শিখার চেয়ে নীল শিখা খারাপ কী! বরং নীল আলোর মধ্যে একটা যেন সুপারন্যাচারাল এলিমেন্ট রয়েছে।

প্ল্যানচেটের টেবিল ঘিরে আমরা তিন বন্ধু বসে আছি। আমি চন্দ্রশোভন—ওরা সবাই আমাকে 'চ্যানি' বলে ডাকে। আমার ডানপাশে, মোটামুটিভাবে একশো কুড়ি ডিগ্রির কৌণিক দূরত্বে সুরপতি। ও যেমন মোটা ঠিক ততটাই ভারী ইন্টেলেকচুয়াল। আমরা ঠাট্টা করে ওকে ডক্টর বলে ডাকি—যদিও ওর ডক্টরেট ডিগ্রি নেই। সুরপতির ডানদিকে, আরও একশো কুড়ি ডিগ্রি পর বসেছে রুনিয়া।

প্ল্যানচেটের গোল টেবিলের ওপরে পাতা আছে একটা তেকোনা বোর্ড।

বোর্ডের তিনটে খাটো পায়া তিনটে স্টিলের বল দিয়ে তৈরি—যাতে বোর্ডটা সহজেই টেবিলের ওপরে চলে বেড়াতে পারে।

এ ছাড়া বোর্ডের ওপরে পাতা রয়েছে একটা এ-ফোর মাপের সাদা কাগজ। কাগজের ওপরে রুনিয়ার পেনসিল ধরা হাত। আমি বাঁ-হাতে সেই হাতের বাহুর কাছটা আলতো করে ছুঁয়ে আছি। বেশ টের পাচ্ছি, রুনিয়ার হাত কাঁপছে।

আমার ডানহাত সুরপতির হাতের মুঠোয়। সে-মুঠো ঘামছে। শুধু ঘামছে।

সুরপতির ডানহাত রুনিয়ার বাঁ-হাতে। সেই মুঠোটার কী অবস্থা কে জানে!

অন্ধকারে চুপচাপ বসে আমরা পমপমের কথা ভাবছিলাম। এটা জানি যে, ওর কথা মন দিয়ে ভাবতে-ভাবতেই একসময় ও আসবে। আসবেই। কারণ, আমরা চারজন এমন বন্ধু ছিলাম যে, সবাই আমাদের মজা করে 'ফোর স্কোয়ার' বলে ডাকত। তো সেই স্কোয়ারের একটা কোণা দু-সপ্তাহ আগে ভেঙে গেছে। আমরা তিনজন আর একজন, দু-ভাগে ভাগ হয়ে আলাদা হয়ে গেছি। আমাদের মাঝখান দিয়ে জীবন-মৃত্যুর সীমারেখা চলে গেছে।

আচমকা একটা মারাত্মক অ্যাক্সিডেন্ট আমাদের আলাদা করে দিয়েছে। আর এই আলাদা হওয়ার ঘটনায় সবচেয়ে বেশি কষ্ট পাচ্ছে রুনিয়া। কারণ, ও পমপমকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসত। এখনও ভালোবাসে।

নীল আলোর অন্ধকারে বসে থাকতে-থাকতে ধৈর্যে টান পড়ছিল। পরিস্থিতিও যেন গম্ভীর থেকে গম্ভীরতর হয়ে পড়ছিল। তার সঙ্গে ঘরের বাতাসের চাপও বাড়ছিল। তাই হালকা হওয়ার চেষ্টায় সুরপতিকে আলতো গলায় জিগ্যেস করলাম, 'ডক্টর, একটা কথা বলি। প্ল্যানচেট নিয়ে তোর মনে কোনও ডাউট-ফাউট নেই তো?'

'নো, চ্যানি—অ্যাবসোলিউটলি জিরো পার্সেন্ট ডাউট। কেন, তোর কি ডাউট আছে?'

আমি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ফিসফিসে গলায় বললাম, 'না, সেরকম কোনও পজিটিভ ডাউট নেই। তবে আমার এক আঙ্কল প্ল্যানচেটকে সবসময় হেসে উড়িয়ে দিতেন। ঠাট্টা করে প্ল্যানচেট ওয়ার্ডটার একটা মজার ব্যাসবাক্য বলতেন...।'

'ব্যাসবাক্য মানে?' সুরপতি একটু অবাক হয়ে জানতে চাইল।

আমি চাপা হাসলাম : 'ব্যাসবাক্য মানে সেই সমাস আর ব্যাসবাক্য। তো আমার জিতু আঙ্কল বলতেন, প্ল্যানচেটের ব্যাসবাক্য হল, প্ল্যান করে

চিট করা—।'

রুনিয়া ফুঁপিয়ে উঠে বলল, 'কী হচ্ছে এসব! উই শুড বি ড্যাম সিরিয়াস...।' কথা শেষ করতে-করতে কেঁদে ফেলল ও।

সুরপতি গার্জেনি সুরে আমাকে বলল, 'চ্যানি, তোর বোধহয় জানা নেই, কথাটা প্ল্যানচেট নয়—প্ল্যানশেট। যাক গে, বাজে কথা ছাড়—লেট আস কনসেনট্রেট অন পমপম।'

'ওকে, ওকে।' বলে সিরিয়াস হতে চাইলাম আমি। পমপমের ওপরে কনসেনট্রেট করতে চাইলাম। ওর কথা ভাবতে লাগলাম একমনে। আর সেটা করামাত্রই অ্যাক্সিডেন্টের কালো রাতটা চিতাবাঘের মতো একলাফে চলে এল চোখের সামনে।

মোটরবাইক চড়ে শান্তিনিকেতন বেড়াতে যাওয়ার অ্যাডভেঞ্চার প্ল্যান করেছিলাম আমরা। দুটো মোটরবাইক, আর আমরা চারজন সবুজ ছেলেমেয়ে। আমি আর পমপম বলতে গেলে এক্সপার্ট বাইকবাজ। আমার পেছনে সুরপতিকে লোড করেছি, আর পমপমের বাইকে সঙ্গিনী হয়েছে রুনিয়া। পমপম সবসময় হেসে বলত, রুনিয়া পেছন থেকে জড়িয়ে না ধরলে ওর নাকি বাইক চালানোর মুড আসে না। এতে রুনিয়া চোখে সরু করে ইশারায় ওকে ধমক দেওয়ার চেষ্টা করত বটে, কিন্তু পমপম সেটা গ্রাহ্যের মধ্যেই আনত না। শুধু হাসত। আর হাসলে ওর গালে ফ্যানট্যাস্টিক একজোড়া টোল পড়ত।

আমি তখন পমপমকে চোখ মটকে বলতাম, 'ঠিক, ঠিক। তোর পিঠের টেম্পারেচারটাই তো তোর বাইক চালানোর আসল ইনস্পিরেশান, বস।'

এইভাবে হাসি ঠাট্টা করতে-করতে নানান জোক মারতে-মারতে আমরা শান্তিনিকেতনে পৌঁছে গিয়েছিলাম।

আমরা ঠিক করেছিলাম, একটা রাত্তির থাকব। তার জন্য পমপম ওর চেনা একজনের সঙ্গে কথাবার্তা বলে একটা বাড়ি ফিট করেছিল। তবে বাড়িটা মোটেই শান্তিনিকেতনে নয়। শান্তিনিকেতন ছাড়িয়ে প্রান্তিক—সেই প্রান্তিকের শেষ প্রান্তে।

অযত্নে পড়ে থাকা ছোট মাপের একটা দোতলা বাড়ি। সঙ্গে লাগোয়া বাগান। বাড়ির যেমন লজ্‌ঝড়ে চেহারা, বাগানেরও তাই। বাগান জুড়ে শুধু আগাছা। তবে তারই মধ্যে ছোট-ছোট গোলাপি আর হলদে রঙের ফুল ফুটে আছে।

সব মিলিয়ে বোঝা যায়, বাড়িটা বহুকাল মানুষজনের মুখ দেখেনি। অনায়াসে

তার গায়ে 'ভুতুড়ে বাড়ি' তকমা এঁটে দেওয়া যায়।

এ নিয়ে পমপমকে আমরা কম আওয়াজ দিইনি। তাতে ও একসময় খেপে গিয়ে বলল যে, আমরা অ্যাডভেঞ্চারে বেরিয়েছি। সেই স্পিরিটের সঙ্গে বাড়িটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট মানিয়ে গেছে।

শুধু সেই স্পিরিট কেন, বাড়িটা অন্যরকম স্পিরিটের পক্ষেও বেশ মানানসই। এ-কথা বলেছিল ডক্টর সুরপতি। আর তখন ওর মোটা শরীরটা ভুঁড়ি কাঁপিয়ে নাচছিল, কারণ ও হাসছিল।

পমপম তার উত্তরে এক পশলা খিস্তি দিয়ে সুরপতিকে বেদম ঝেড়েছিল। রুনিয়া হাত-পা ছুড়ে চেঁচামেচি করে পমপমকে মুখ খারাপ করতে বারণ করছিল, কিন্তু পমপম শুনলে তো!

রুনিয়া যখন রাগ-টাগ করে গুম মেরে গেল তখন পমপম ওকে মাস্টারির স্টাইলে বোঝাতে শুরু করল, 'শোন, রুনিয়া, শোন—প্লিজ। খিস্তি হচ্ছে বাংলা ভাষার আর্লিয়েস্ট ক্রুড ফর্ম। সেটাই ছ'-সাত বার চোলাই হয়ে ভদ্দরলোকেদের ভাষা তৈরি হয়েছে। ফিলোলজির কোনও প্রফেসরকে জিগ্যেস করে দেখিস... প্লিজ...এবার টেম্পারেচারটা একটু কমা...।'

আমি রুনিয়াকে চোখ মেরে বললাম, 'বেশি কমাস না—তা হলে ফ্রিজিড হয়ে যাবি।'

পমপম ওর গায়ের টি-শার্টটা খুলে হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। 'শালা, ব্লেডের বাচ্চা!' বলে ওটা আমার মুখে ছুড়ে মারল।

বাড়িটায় পৌঁছোনোর পর থেকেই আমাদের ঠাট্টা-ইয়ারকি হইহল্লা চলছিল। তখনও জানি না, রাত্তিরে কী হতে চলেছে। জানি না, আমাদের তিনজন আর পমপমের মাঝে 'লক্ষ্মণরেখা' টানার জন্যে নিয়তি কলম নিয়ে তৈরি হচ্ছে।

এখন ঘরে ঠান্ডা বাতাস চলে বেড়াচ্ছিল। নীলচে অন্ধকারে সেটাকে আরও ঠান্ডা বলে মনে হচ্ছিল। ঘরের দরজা হাট করে খোলা। এ ছাড়া দু-দিকের দেওয়ালের দু-দুটো জানলাও। বাতাসটা এত ভারী যে, মনে হচ্ছিল আমি কত হালকা। এই বুঝি পালকের মতো বাতাসে ভেসে পড়ব।

একতলার এই ঘরটা আমাদের কাছে নতুন। কিন্তু উপায় কী! দোতলার ঘরটার তো একদিকের দেওয়াল আর নেই। সে-রাতে আমরা দোতলার বড় ঘরটাতেই ছিলাম। মাত্র দু-সপ্তাহ আগের ব্যাপার, অথচ মনে হচ্ছে কত যুগ আগের কথা!

প্রান্তিকের শেষ প্রান্তের সেই অভিশপ্ত বাড়ি। তার দোতলার অভিশপ্ত ঘরটা

আর ঠিকঠাক নেই বলেই আমরা এবার একতলার বাগানের লাগোয়া একটা ঘরে আস্তানা গেড়েছি। পমপমকে প্ল্যানচেটে 'নেমন্তন্নের' আসর বসিয়েছি। ওকে যে আমাদের ভীষণ দেখতে ইচ্ছে করছে! বিশেষ করে রুনিয়া তো ওকে একটিবার দেখার জন্যে পাগল। আমাদের টানে পমপমকে আজ আসতে হবে। আসতে তো ওকে হবেই!

রুনিয়া গুমরে কেঁদে উঠল।

'পমপম! পম! হানি বানি, তুই কোথায়?' রুনিয়ার গলাটা হঠাৎই ফিসফিসে হয়ে গেল : 'আয় রে...জলদি আয়...আই নিড য়ু, হানি বানি...।'

মোমবাতির নীল শিখা দুটো কাঁপতে লাগল। ভারী বাতাস ধাক্কা মারতে লাগল আমাদের গায়ে। দরজা আর জানলা দিয়ে বাইরের আগাছার জঙ্গল চোখে পড়ছিল। অন্ধকারেও গোলাপি আর হলদে ফুলগুলো স্পষ্ট—যেন ফ্লুওরেসেন্ট রঙে আঁকা ছবি। আগাছার ডালগুলো এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়ছে। ওরা যেন পাগল হয়ে গেছে।

এমন সময় পায়ের শব্দ শোনা গেল। কারা যেন এগিয়ে আসছে এই ঘরের দিকে। পমপম? নাকি ওর সঙ্গে আরও কেউ রয়েছে?

আমরা তিনজনে ফিসফিস করে পমপমের নামটা বিড়বিড় করতে লাগলাম। যেন ওই চার অক্ষরের নামটা একটা অমূল্য বীজমন্ত্র।

'পমপম...পমপম...পমপম...পম...।'

সেদিন রাতে অ্যাক্সিডেন্টের ব্যাপারটা হয়েছিল মাঝরাতে। আমরা দোতলার ঘরের মেঝেতে দুটো বিছানা পেতে গল্প করতে-করতে কখন যেন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। তারপর, আচমকা একটা মেগা-এক্সপ্লোশানে আমরা জেগে গিয়েছিলাম। কয়েক সেকেন্ডের টুকরো ছবিতে যা দেখেছিলাম তা এককথায় অবিশ্বাস্য।

আমাদের ঘরের পুবদিকের দেওয়ালটা ভ্যানিশ। আমরা সব বোমার স্প্লিন্টারের মতো শূন্যে পাগল-করা গতিবেগে ছুটে চলেছি। চারপাশে দাউদাউ আগুন। চোখে কোটি-কোটি সরষে ফুল। আমাদের শরীরগুলো আস্ত না ধ্বস্ত জানি না। তবে সেগুলো বিস্ময় আর যন্ত্রণায় যে অসাড় সেটা এক মুহূর্তের জন্যে হলেও অনুভব করেছিলাম।

এই মারাত্মক দুর্ঘটনার কথা আলোর চেয়েও দ্রুতগতিতে ছড়িয়ে পড়েছিল অঞ্চলে। আর বিস্ফোরণের দাপটে থরথর করে কেঁপে উঠেছিল প্রায় এক বর্গকিলোমিটার এলাকা। লোকের মুখে-মুখে আর পুলিশের কথাবার্তায় জানা

গিয়েছিল, প্রান্তিকের ওই ছন্নছাড়া বাড়িটা নাকি জঙ্গিদের হাই মেগাটন বোমা বানানোর গোপন ঘাঁটি ছিল। আমরা যে-ঘরটা ঝাড়পোঁছ করে এক রাতের জন্য বেডরুম বানিয়ে নিয়েছিলাম, ঠিক তার পেছনের ঘরটাতেই নাকি বারুদের মশলা আর ইলেকট্রনিক সুইচিং সার্কিটের কাজ-টাজ চলত।

ওই একটা মারণ দুর্ঘটনা পমপমকে আমাদের কাছ থেকে দূরে ঠেলে দিল। পমপম! পমপম!

রুনিয়ার পেনসিল ধরা হাত উত্তাল সমুদ্রে ডিঙি নৌকোর মতো টলছে। কে, কে এসে দাঁড়াল দরজায়? ওই তো একটা ছায়া!

'চ্যানি—চ্যানি, পমপম এসে গেছে!' ফিসফিস করে বলল রুনিয়া।

'ডক্টর, ওই দ্যাখ—।' আমি সুরপতির হাত সাঁড়াশি-মুঠোয় চেপে ধরলাম।

দরজার কাছে দাঁড়িয়ে পমপম নয়—পমপমের ছায়া। ছায়াটা যে ওর সেটা বোঝা যাচ্ছে ঝাঁকড়া চুলের সিলুয়েট দেখেই। কিন্তু তার পেছনে আরও দুজন ছায়া। পমপমের তুলনায় আরও রোগা, কিন্তু লম্বা।

রুনিয়া হঠাৎ যেন পাগল হয়ে গেল। পমপমের নাম ধরে ও চিৎকার করে উঠল। কিন্তু পমপম কিছুই শুনতে পেল না।

রুনিয়াকে ফিসফিসে ধমক দিয়ে আমি আর ডক্টর চুপ করাতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু ও শুনলে তো!

রুনিয়া দরজার দিকে তাকিয়ে ছিল, অথচ ওর পেনসিল-ধরা হাত কাগজের ওপরে চলছিল। মোমবাতির নীল আলোর আভায় কাগজটা দেখা যাচ্ছিল, তবে তার ওপরে পেনসিলের লেখা বোঝা যাচ্ছিল না।

হঠাৎই ঘরের ভারী বাতাস ছুটোছুটি করতে শুরু করে দিল। মোমবাতির শিখা দুটো পতাকার মতো লতপত করতে লাগল। কাগজের একটা কোনা বাতাসী পাখির মতো উড়াল দিতে চাইল।

আমরা তিনজনে খোলা দরজার দিকে তাকিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম।

ঘরের দরজার কাছে এসে থমকে দাঁড়াল পমপম।

সেই অ্যাক্সিডেন্টের পর ওকে নার্সিং হোমে এগারো দিন কাটাতে হয়েছে। তারপর আরও দু-বন্ধুকে জোগাড় করে ও আবার প্ল্যানচেটের আসর বসানোর ব্যবস্থা করেছে। এবং চোদ্দো দিনের মাথায় ফিরে এসেছে অকুস্থলে—প্রান্তিকের প্রান্তে—সেই অভিশপ্ত বাড়িটায়।

প্ল্যানচেটের সব আয়োজন ও একার হাতে করেছে। টেবিল, চেয়ার, তেকোনা বোর্ড, কাগজ, পেনসিল, মোমবাতি—সব। তারপর ও আরও দুজন বন্ধুকে ডাকতে গিয়েছিল। কারণ, প্ল্যানচেট করতে হলে অন্তত তিনজন তো দরকার!

পমপম চোখের জল থামাতে পারছিল না। কারণ, রুনিয়ার কথা মনে পড়ছিল। গলার ভেতরে একটা উলের বল যেন নড়াচড়া করছে সমসময়।

ওর আরও মনে পড়ছিল চ্যানি আর ডক্টরের কথা।

একটা রাত, একটা ভয়ংকর অ্যাক্সিডেন্ট। মৃত্যু এসে এক ছোবলে ওদের চারজনের বন্ধুত্বে চিড় ধরিয়ে দিল। চিড় নয়, চওড়া এক কালো ফাটল। তার একদিকে একজন, আর এক দিকে তিনজন। সেই তিনজনকে আজ, এখন, প্ল্যানচেটে ডাক পাঠাবে পমপম। ওঃ, কতদিন দেখেনি ওদের! কতদিন দেখেনি রুনিয়াকে!

দরজার কাছে এসে থমকে দাঁড়াল পমপম। ঘরের অন্ধকারে মোমবাতির শিখা দুটো ওর নজরে পড়ল। ও তো মোমবাতি জ্বেলে যায়নি। দেশলাই তো এখনও ওর পকেটে!

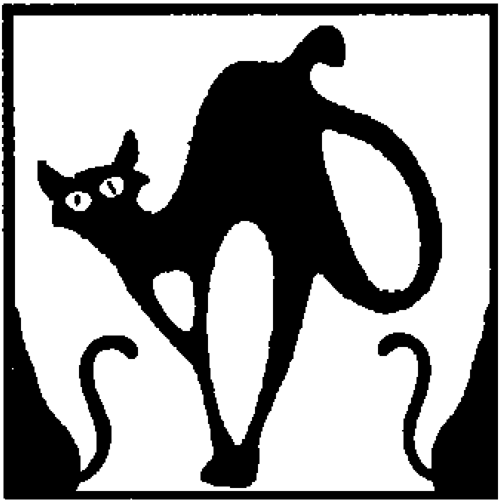
তা ছাড়া নীল রঙের শিখা কেমন করে তৈরি হল? কোন অলৌকিক ম্যাজিকে?

ঘরের তিনটে চেয়ারই খালি. অথচ পেনসিলটা নিজে থেকেই খাড়াভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছে কাগজের ওপরে! আর শুধু দাঁড়িয়ে নেই, কাগজের ওপরে চলে বেড়াচ্ছে!

কোন এক লুকোনো বাতাসে মোমবাতির শিখা দুটো ছটফট করছিল। সেই বাতাসের ঝাপটা পমপমের গায়ে লাগতেই ওর গায়ে কাঁটা দিল; কী ঠান্ডা!

ও ভয় পেয়ে গেল। চোখের জল মুছে পাগলের মতো দৌড় লাগাল। ওর বাকি দুজন বন্ধু কোনও কিছু না বুঝেই ওর পিছন-পিছন ছুটতে শুরু করল।

পমপম বুঝতে পারল না, ওর প্রাণের তিন বন্ধু প্রাণ চলে যাওয়ার পরেও ওকে পাগলের মতো ভালোবাসে। আর সেইজন্যই ওরা পমপমকে 'ডাকতে' ওদের প্ল্যানচেটের আসর বসিয়েছিল।



কেয়ার অফ অন্ধকার

'ওটাই হল গে ওদের আসল ঠিকানা। এর বেশি আর আমি বলতি পারব না।' একটু থামল সোনাখুড়ো। তারপর বিড়িতে যক্ষ্মা-টান দিয়ে বলল, 'আর পারলেও বলব না।'

আশ্চর্য! ভূতপ্রেতের ঠিকানা কেয়ার অফ অন্ধকার! এরকমটা কাউকে বলতে শুনিনি।

আমি খানিকটা অবাক হয়ে সোনাখুড়োর দিকে তাকালাম। মানুষটা কেমন যেন গুম হয়ে বসে আছে। মুখটা অভিমান মাখা। অবিশ্বাসীদের তাচ্ছিল্য আর হেলাছেদ্দার মুখোমুখি হয়ে নিষ্ঠাবান বিশ্বাসীদের যা অবস্থা হয় আর কী!

অবনী সামন্তর চায়ের দোকানে বসে হালকা গল্পগুজব করছিলাম। রাত প্রায় সাড়ে সাতটা। প্রচণ্ড শীত। হাড়ে যেন কামড় বসাচ্ছে। তার সঙ্গে গাঢ় কুয়াশা। মাটির কাছাকাছি জমাট বেঁধে ভেসে বেড়াচ্ছে। বিশ-তিরিশ ফুট দূরের কিছুই ভালো করে দেখা যাচ্ছে না।

শাল মুড়ি দিয়ে জড়োসড়ো হয়ে বসে চায়ের গ্লাসে চুমুক দিচ্ছিলাম। ভূত-প্রেত নিয়ে তর্কবিতর্ক নেহাত মন্দ লাগছিল না। তার মধ্যে অবনী সামন্তও কখন যেন ঢুকে পড়েছিল। এ ছাড়া আরও তিনজন লোকাল লোক থেকে-থেকেই ফুট কাটছিল। তাদের মুখগুলো চেনা হলেও নাম-ধাম জানি না। রোজ

সন্ধেবেলা ওরা অবনীদার দোকানে আসে, খবরের কাগজ পড়ে, চা-বিস্কুট খায়, রাজা-উজির মারে, গল্পগুজব করে।

জায়গাটা বাঁকুড়া আর পুরুলিয়ার বর্ডারের কাছাকাছি। আমি এখানে একেবারে নতুন। মাত্র দু-সপ্তাহ হল সরকারি কাজে সার্ভে করতে এসেছি। নতুন-নতুন টিউবওয়েল কোথায়-কোথায় বসানো যায়। কোন-কোন এলাকায় টিউবওয়েল বসানোর পরে সাত-দশদিনের মধ্যেই জল শুকিয়ে যাচ্ছে। এর কারণ কী। ব্লকের মোড়ল-মুরুব্বিরা কী বলছে। এইসব নিয়ে রোজ সকাল-সন্ধে টোটো কোম্পানি করছি আর জাবদা খাতায় রিপোর্ট লিখছি।

সোনাখুড়ো এখানকারই লোক। এককালে বিস্তর জমিজমা ছিল, ধানকল ছিল, মাছ চাষের পুকুর ছিল। তারপর কালে-কালে বিষয়-আশয়ের বিবাদে প্রায় সবই হাতছাড়া হয়ে গেছে। কিছু জমানো পুঁজি নিয়ে 'রিটায়ার্ড লাইফ' কাটাচ্ছে।

সোনাখুড়োকে এ-গ্রামের সবাই চেনে। বয়েস প্রায় সত্তর-টত্তর হবে। কালো, দড়িপাকানো চেহারা, মুখে খোঁচা-খোঁচা সাদা দাড়ি, চোখে প্লাস্টিক ফ্রেমের চশমা।

খুড়ো নানান বিষয়ের খোঁজ রাখে, আর কিছু বকবক করতে পারে বটে! রোজ সন্ধেবেলা যারা অবনীদার দোকানে আড্ডা মারতে আসে তারা অনেকেই সোনাখুড়োর বকবকানি শুনতে ভালোবাসে আর একইসঙ্গে খুড়োর পেছনে লাগে।

এই আড্ডার ধরন ধারণ বুঝতে আমার প্রথমে কয়েকটা দিন সময় লেগে গিয়েছিল। তারপর 'পরদেশি' হয়েও নিজেকে মোটামুটি খাপ খাইয়ে নিয়েছি।

আড্ডায় ভূতপ্রেতের কথা প্রায়ই ওঠে। তাতে সোনাখুড়ো নিজের ভূতুড়ে অভিজ্ঞতার কথা শোনায়। অন্যান্যরা সে-কাহিনি শুনে চোখ ঠারে, ব্যাকা ফোড়ন কাটে।

মাঝে-মাঝে অবনীদাও গল্পের হাল ধরে। আর কখনও বা অন্য কেউ।

সময় কাটানোর জন্যে ভূতুড়ে বা অন্য যে-কোনও উদ্ভট গল্প শুনতে খারাপ লাগে না। কাঁহাতক আর খবরের কাগজ পড়ে কিংবা টিভি দেখে সময় কাটানো যায়! কিন্তু এই অঞ্চলের একটা ব্যাপার ভারী অদ্ভুত লাগে। যে-কোনও অস্বাভাবিক কাণ্ডকারখানার পেছনে সকলেই একটা অলৌকিক কারণ খুঁজে বের করে। এবং তার মধ্যে সোনাখুড়ো হল গিয়ে চ্যাম্পিয়ান।

এরকমই একদিন আড্ডার সময় নানান গালগল্পের পর আমি হঠাৎই

সোনাখুড়োকে জিগ্যেস করলাম, 'আচ্ছা, হ্যারিকেন মাঠে যে জল ওঠে না তার কারণটা কী? ওখানে যে অত টিউবওয়েল, অথচ একটাতেও জল ওঠে না, এর পেছনে কোন ব্যাপারটা লুকিয়ে আছে?'

সোনাখুড়ো ভুরু কুঁচকে আমার দিকে তাকাল। যেন আমাকে ভয় দেখাতেই বিড়িতে প্রবল টান দিল কয়েকবার। তারপর ভুরু ওপরে তুলে জিগ্যেস করল, 'তাও জানেন না?'

অবনীদা আমাকে জিগ্যেস করল, 'আপনি তো অত সার্ভে-টার্ভে করলেন। তাতে কী বুঝলেন?'

না, বুঝতে পারিনি কিছুই। কিন্তু সে-কথা আর মুখে বললাম না।

হ্যারিকেন মাঠ যে কোনও মাঠের নাম হতে পারে সে-কথা স্বপ্নেও ভাবিনি। আসলে পঞ্চাশ কি ষাট বছর আগে ওই বিশাল সরকারি মাঠটায় দশ-বারোটা হ্যারিকেন ফ্যাক্টরি ছিল। হ্যারিকেনের মন্দার বাজারে সবক'টা ফ্যাক্টরি দেড়-দু-বছরের মধ্যে পটাপট উঠে যায়। তারপর সরকার আর ওখানে কোনও ফ্যাক্টরি খুলতে দেয়নি।

মাঠটা মাপে এত প্রকাণ্ড যে, ওর ওপরে বালি ছড়িয়ে দিলে দিব্যি মরুভূমি বলে চালিয়ে দেওয়া যায়। ওই মাঠে মোট ন'টা টিউবওয়েল আছে, কিন্তু সবগুলোই অকেজো, শুকিয়ে কাঠ। এ ছাড়া অনেকগুলো গর্ত ছড়িয়েছিটিয়ে রয়েছে। স্থানীয় লোকজন বলেছে, ওইসব গর্তে টিউবওয়েল বসানোর চেষ্টা করা হয়েছিল, কিন্তু এককোঁটাও জল পাওয়া যায়নি। বহুকাল আগে ওখানে একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়। ওই অ্যাক্সিডেন্টের পর থেকে সবাই ভয়ে পিছিয়ে পড়ে। বলতে গেলে মাঠটার গায়ে 'অভিশপ্ত' তকমা এঁটে যায়। ব্যস।

আমি সোনাখুড়োকে বললাম, 'আমি নতুন লোক—আমি কেমন করে জানব বলুন!'

তখন সোনাখুড়ো ছোট-হয়ে-আসা বিড়িটা শেষটান দিয়ে ছুড়ে ফেলে দিল। বারদুয়েক কেশে নিয়ে বলল, 'ওই মাঠে অপদেবতার দোষ লেগেছে। ও-মাঠ প্রেতপিশাচের আওতায় চলি গেছে। আজ নয়—বহু বছর...।'

গোকুল গড়াই জমি জমার দালালি করে। সে গরম চায়ে সুড়ুৎ করে লম্বা টান দিয়ে বলল, 'বুঝলেন, ওই অ্যাক্সিডেন্টটার পর থেকে ও-মাঠের ওপর দিয়ে আমরা রাতে চলাফেরা করি না। ভয় করে—।'

'কী টাইপের অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল ওখানে?'

সোনাখুড়ো আর-এক গ্লাস চা চাইল অবনীদার থেকে। অবনীদার মুখে গল্প

শোনার কোনও কৌতূহল না দেখে বুঝলাম, এই অ্যাক্সিডেন্টের ব্যাপারটা ওর জানা।

অবনীদা নির্বিকার মুখে একগ্লাস ধোঁয়া-ওঠা চা এগিয়ে দিল সোনাখুড়োর দিকে। খুড়ো দু-হাতের তালু গ্লাসের গায়ে চেপে ধরে কিছুক্ষণ ওম নিল। তারপর চায়ে চুমুক দিয়ে বলল, 'ব্যাপারটা সাঁটে বলছি। আপনি তো ওই হ্যারিকেন মাঠের ওপর দিয়ে মাঝে-মধ্যি যাতায়াত করেন। আপনাকে আগেও বলিছি, এখনও বলছি। দিনমানে ও-মাঠের ওপরদি' যান তবু ঠিক আছে—কিন্তু রাতে একদম নয়। ওই ন'টা মরা টিপকল, আর চারগণ্ডা গর্ত! আর গর্তের ভেতরে চাপ-চাপ অন্ধকার। শুধু অন্ধকার...।'

আমি একটু অবাকই হয়ে গেলাম। গর্তের ভেতরে অন্ধকার থাকাটাই তো স্বাভাবিক। এ ছাড়া আর কী থাকতে পারে?

সে-কথাই বললাম সোনাখুড়োকে, 'গর্তের ভেতরে অন্ধকার থাকবে না তো কি ফুলের বাগান থাকবে?'

গোকুল গড়াই আমার কথা শুনে হেসে উঠল। অবনী সামন্তর ঠোঁটও সামান্য চওড়া হয়েছে দেখলাম।

কিন্তু সোনাখুড়ো বেশ রুষ্ট হয়ে আমার চোখে তাকাল, বলল, 'গর্তের ভেতরে তো অন্ধকার থাকে, কিন্তু তার ভেতরে কী থাকে জানেন?' চায়ের গ্লাসে ঘন-ঘন তিন-চার চুমুক দিয়ে বিরক্তভাবে খুড়ো বলল, 'শহরের সব কেতা আমার জানা আছে! শহরের জল পেটে পড়লি সব লায়েক হয়ে যায়! যাদের কথা আমি বলতি চাই তারা সব ওই অন্ধকারেই থাকে। তাদের ঠিকানা হল গে কেয়ার অফ অন্ধকার। বুঝলেন কিছু?'

বুঝলাম, কিন্তু আসল গল্প থেকে তো সরে যাচ্ছি। তাই খুড়োকে ঠিক পথে নিয়ে আসার জন্যে স্টিয়ারিং ঘোরালাম : 'আপনারা কী-একটা অ্যাক্সিডেন্টের কথা বলছিলেন...।'

'হ্যাঁ—ওই টিপকলের গর্ত। মরণফাঁদ।' কয়েকবার ছোট-ছোট কাশল সোনাখুড়ো : 'আপনি তো জানেন, এদিকটায় জলের লেয়ার অনেক নীচে। কোথাও-কোথাও ষাট-সত্তর ফুট খুঁড়েও জলের দেখা মেলে না। আমার ছেলেবেলায় দেখিছি, কত বড়-বড় ডিপ গর্ত খুঁড়ে জল তোলার চেষ্টা হচ্ছে। তো হ্যারিকেন কোম্পানিগুলো উঠে যাওয়ার পর ওই হ্যারিকেন মাঠেও টিপকল বসানো হল, এদিক-সেদিক গর্ত খোঁড়াখুঁড়ি হতি লাগল। কাজের যাকে বলে একেবারি ধুম লেগে গেল। আমাদের গ্রামটা কাজে টগবগ করতি লাগল।

'তো তানি নামে সেসময়ে একটা বাচ্চা ছেলে—কত বয়েস হবে, পাঁচ কি ছয়—বিকেলে ওই হ্যারিকেন মাঠে খেলা করতি-করতি একটা গর্তে পড়ি গেল। চারদিকে কত কান্নাকাটি, হইচই। বাচ্চাটা মরে গেল নাকি? বাচ্চাটাকে তোলার জন্যি কেউ দড়ি নামায় তো কেউ লম্বা বাঁশ নামায়। তানির বাপ-মা গর্তের মুখে ঝাঁপিয়ে পড়ে কাঁদতিছে, আছাড়ি পিছাড়ি খাচ্ছে। কান পেতে সবাই গর্তের আওয়াজ শুনতি চেষ্টা করছে।

'হঠাৎই শোনা গেল তানির কান্না। বাচ্চাটা বেঁচে আছে—ভয়ে কাঁদছে। গর্তের কোন পাতাল থেকে ওর কচি গলা ভেসে আসতিছে। আবার সকলে হইহই করে উঠল। রব উঠল, "বেঁচে আছে! বেঁচে আছে!" তো ডবল ধকে সবাই তোড়জোড় শুরু করি দিল।

'সন্ধে হয়ে এয়েছিল। কোথা থেকে সব মশাল আর হ্যাজাক বাতি জ্বালি নে এল। কিন্তু গর্তের মুখে আলো ফেলেও কিছুটি দেখা যায় না। তবু চেষ্টা থামল না। তানির মা শালপাতার প্যাকেট করে খাবার নে এল। দড়িতে ঝুলিয়ে সেই প্যাকেট নামায়ে দিল গর্তে। গর্তের চারপাশে মাটিতে কান পেতে মানুষজন সকলে তানির কান্নার শব্দ শুনতি চাইল। কিন্তু কিছু শোনা গেল কি গেল না ভালো করি বোঝা গেল না।

'গাঁয়ের মাতব্বররা পুলিশকে খবর দিয়েছিল। সেখান থেকে খবর গেল সদরে। তারা হয়তো দমকলে খবর দিয়েছিল—ঠিক বলতি পারব না। কিন্তু মোট কথা হল, কাজের কাজ কিছু হল না। তা ছাড়া তখন তো আর টিভি ছেল না, মোবাইল ফোন ছেল না কিছুই ছিল না। তাই কিছুই হল না। বাচ্চাটা গর্তের ভেতরেই রয়ে গেল। ওর বডি আর পাওয়া গেল না।

'তানির বাপ-মা-কে কেউ বুঝিয়ে পারেনি। ওরা প্রায় একমাস ধরে ওই গর্তে খাবার দে গিয়েছিল। আর সবসময় গর্তের কাছে কান পাতি বলত যে, ওরা তানির কান্না শুনতি পাচ্ছে।' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল সোনাখুড়ো, বলল, 'সবই কপাল!'

গল্পটা শুনতে-শুনতে আমার কেমন যেন ঘোর লেগে গিয়েছিল। জিগ্যেস করলাম 'তারপর?'

'তারপর আর কী! তানি মারা যাওয়ার কিছুদিন পর থেকেই যে-ক'টা টিপকল ওই মাঠে লাগানো হয়েছিল, তার সবক'টার জল শুকিয়ে যেতি লাগল। দেখতে-দেখতে দু-চারমাসের মধ্যি সব টিপকল শুকিয়ে কাঠ।

'সরকার অনেক চেষ্টা-চরিত্রি করিছিল কিন্তু কোনও কাজ হয়নি। ওই

চেষ্টাতেই হ্যারিকেন মাঠে আরও কত গর্ত খোঁড়াখুঁড়ি হল, কিন্তু ওই খোঁড়াখুঁড়িই সার। লাভের মধ্যে আরও তিন-তিনটে বাচ্চা ওই শুকনো গর্তে পড়ি মারা গেল। ওদের বডিও কেউ উদ্ধার করতি পারল না।'

'বলেন কী!' আমি চমকে উঠলাম। বছর তিন-চার আগে প্রিন্স নামে একটা বাচ্চা ছেলের এরকম অ্যাক্সিডেন্টের খবর টিভিতে দেখেছিলাম। ঘটনাটার লাইভ টেলিকাস্ট দেখানো হয়েছিল। অদ্ভুত তৎপরতা আর দক্ষতায় জওয়ানরা বাচ্চাটাকে বাঁচাতে পেরেছিল।

আমার ধারণা ছিল আমাদের দেশে এরকম অ্যাক্সিডেন্ট আগে আর কখনও হয়নি। বোকা-বোকা ধারণা অবশ্যই। কিন্তু এখানে, এই গ্রামে, এরকম অ্যাক্সিডেন্ট চার-চারবার হয়েছে! অথচ তার কোনও রেকর্ড নেই!

সোনাখুড়ো বলল, 'না, নেই। তানির অ্যাক্সিডেন্টটা হয়েছিল উনিশশো পঁয়ষট্টি সালে। আর বাকি তিনটে বাচ্চার কপাল পুড়ল তার আট-ন'বছরের মধ্যি। ব্যাপারগুলো খুব একটা ছড়ায়নি। ওই যে বললাম, টিভি নেই, মোবাইল নেই—কী করি ছড়াবে!

'এরপর থেকেই বদনামটা হ্যারিকেন মাঠের ওপরে চেপে বসল। সন্ধে কিংবা রাতে ও-মাঠে কেউ যায় না। শুধু ন'টা টিপকল অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকে।' গ্লাস উঁচু করে চায়ে শেষ চুমুক দিল সোনাখুড়ো। খালি গ্লাসটা অবনী সামন্তর হাতে ফিরিয়ে দিল।

আমি চুপ করে রইলাম। সরকারি কাজে আমাকে গাঁ-গঞ্জের মাঠেঘাটে ঘুরে বেড়াতে হয়। ভোজনং যত্রতত্র, শয়নং হট্টমন্দিরে। সুতরাং ভূত পেতনির প্যানপ্যানানি আমাকে তাড়া করে ফেরে। যেখানেই যাই সেখানেই শহরের লোক পেয়ে যে পারে সে আমাকে ভূতের গাঁজাখুরি গপ্পো শুনিয়ে দেয়। আমিও বোকাসোকা সেজে শুনে যাই। প্রতিবাদ করে ঝামেলা বাড়িয়ে লাভ কী!

তাই সোনাখুড়োর গপ্পেরও কোনও প্রতিবাদ করলাম না। এটা ঠিকই যে, বাচ্চাগুলোর ওভাবে মারা যাওয়াটা অত্যন্ত মর্মান্তিক। কিন্তু তাই বলে তাদের হ্যারিকেন মাঠে ভূত হয়ে ঘুরে বেড়াতে হবে তার কোনও মানে নেই।

আমি ক্যাম্প থেকে রোজ সাইটে যাই সাইকেলে চড়ে। এদিক-সেদিক যাওয়ার পথে প্রায়ই দিনে-রাতে আমাকে হ্যারিকেন মাঠ পেরোতে হয়। তখন দিব্যি ন'টা টিউবওয়েল দেখি আর ডজনখানেক নিরীহ গর্ত। এতদিন সোনাখুড়োর কাহিনি শুনিনি বলে মনের ওপর কোনও বাড়তি চাপ পড়েনি।

আজ এই গল্পটা শোনার পর বাড়তি চাপ একটু তৈরি হল বটে কিন্তু ছোটমাপের হাসিও পেল। কী অবস্থা! ওইটুকু-ওইটুকু চারটে বাচ্চাও 'জনগণের' হাত থেকে রেহাই পেল না! ওদের আত্মাকে সবাই প্রেতাত্মা বানিয়ে ছাড়ল!

কেয়ার অফ অন্ধকারদের আমি ভয় পাই না, কারণ, আমার সঙ্গে আছে জোরালো আলোর টর্চ। আমার ফোলিও ব্যাগের মধ্যে সবসময় টর্চটা মজুত থাকে। আলো দিয়ে অন্ধকার তাড়ানোর সাহস আমার আছে।

যাই হোক, এরপর ভাঙাচোরা কিছু কথার পর আমি উঠে পড়লাম। অবনী সামন্তর ফাটা বেঞ্চিতে রাখা আমার ফোলিও ব্যাগটা তুলে নিলাম। তারপর দোকানের দরমার বেড়ার পাশটিতে দাঁড় করানো সাইকেলটাকে স্ট্যান্ড থেকে নামালাম। ফোলিও ব্যাগ থেকে টর্চটা বের করে হাতে নিলাম। ব্যাগটা সাইকেলের কেরিয়ারে আটকে দিলাম।

আমার মাথায় উলের টুপি। গলায় মাফলার। গায়ে ফুলহাতা সোয়েটারের ওপরে প্যাঁচানো চাদর। এই অবস্থায় আমাকে দেখলে যে-কেউ ব্যান্ডেজ ভূত ভেবে ভয় পেয়ে যাবে। তার ওপর এই 'ভূত'-টা যখন সাইকেল চালিয়ে হ্যারিকেন মাঠের ওপর দিয়ে যাবে, তখন দূর থেকে কেউ আমাকে দেখলে যে ভূত-প্রেত ঠাউরে বসবে সে আর আশ্চর্য কী! এভাবেই বোধহয় ভূতুড়ে গাল-গল্পের জন্ম হয়।

আমি সোনাখুড়োদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সাইকেলে চড়ে বসলাম। এবড়োখেবড়ো নির্জন পথে সাইকেল ঝাঁকুনি দিয়ে চলতে লাগল।

আমি আগেই টর্চটা ব্যাগ থেকে বের করে নিয়েছিলাম। মাঝে-মাঝে ওটা জ্বালতে লাগলাম। টর্চের ধবধবে সাদা আলো আমাকে ভরসা দিল। আমার সাইকেল হ্যারিকেন মাঠের দিকে চলতে লাগল।

আকাশে চাঁদ ছিল। সেই আলোয় ভেসে বেড়ানো কুয়াশার টুকরোগুলোকে দেখে মনে হচ্ছিল আকাশের মেঘ মাটিতে নেমে এসেছে। তারই মধ্যে আমার সাইকেল ছুটছিল।

ছুটতে-ছুটতে হ্যারিকেন মাঠের সামনে এসে পড়লাম।

এই মাঠটা ডিঙিয়ে গেলে আমার ক্যাম্পে ফেরার কাজটা অনেকটা শর্টকাট হয়। আমার আবার একটু-আধটু শর্টকাটের বাতিক আছে। অন্যদিন বেশ ফুরফুরে মন নিয়ে এই মাঠটা পেরিয়ে যাই। আজ সোনাখুড়োর গল্প শোনার পর মনের ওপর বাড়তি চাপের ব্যাপারটা এই মুহূর্তে আবার টের পেলাম। ওই চারটে বাচ্চার দুর্ঘটনার দৃশ্যগুলো আমি কল্পনায় দিব্যি দেখতে পাচ্ছিলাম।

মানুষের কুসংস্কার ওদের আত্মাকে প্রেতাত্মা বানিয়ে ছেড়েছে। তবে সেই ব্যাপারটা হেসে উড়িয়ে দিলেও আত্মার ব্যাপারটা থেকেই যাচ্ছে।

এইসব নানান চিন্তায় মনটা খচখচ করতে লাগল।

হ্যারিকেন মাঠে সাইকেলের চাকা ঢুকে পড়তেই আমার মনটা কেমন শিউরে উঠল। সামনেই বিশাল ধু-ধু মাঠ। জ্যোৎস্নার আলোয় ভেসে যাচ্ছে। সেই মাঠে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে রয়েছে ন'টা টিউবওয়েল। চাঁদের আলোয় কালো সিলুয়েট ছবি হয়ে গেছে। আর মাঠের ধূসর জমিতে ওদের লম্বা-লম্বা কালো ছায়া শুয়ে আছে। এ ছাড়া কাছে-দূরে এখানে-ওখানে অনেকগুলো কালো গর্ত। অন্ধকার তার ভেতরে জমাট বেঁধে আছে।

আমার গায়ে কাঁটা দিল। যদিও যুক্তি দিয়ে তার কোনও ব্যাখ্যা খুঁজে পেলাম না। আমি আরও জোরে প্যাডেল ঘোরাতে লাগলাম। মনে হল, যত তাড়াতাড়ি এই মাঠটা পেরোনো যায় ততই মঙ্গল।

কিন্তু অবাক হয়ে দেখলাম, মাঠটা কিছুতেই শেষ হচ্ছে না! আমার দুপাশে শুধু টিউবওয়েল আর গর্ত। ওগুলো পেছনদিকে ছুটে চলেছে তো চলেছেই!

আমি কি তা হলে ভয়ের ঘোরে এই হ্যারিকেন মাঠের মধ্যেই পাক খেয়ে দিশেহারাভাবে ঘুরে চলেছি? মাঠটা কিছুতেই আমি পেরোতে পারছি না কেন?

এমন সময় হঠাৎই বাতাস ছাড়ল। আমার হাড়ের ভেতরে ঠান্ডার ছুঁচ বিঁধতে লাগল। দুটো হাত যেন ঠান্ডায় এখনই জমে যাবে। পায়ের পাতায় কেউ যেন বরফগুঁড়ো চেপে ধরেছে। কিন্তু থামলে চলবে না। কিছুতেই না! আমি পাগলের মতো প্যাডেল করতে লাগলাম। টর্চের আলোটা মাঠের জমিতে পড়ে কাঁপতে লাগল।

হঠাৎই কানে এল কয়েকটা বাচ্চার কান্না। তানিরা গর্তে পড়ে গিয়ে কাঁদছে? ওরা তো নানান সময়ে গর্তে পড়ে মারা গেছে! তা হলে একসঙ্গে কাঁদছে কেমন করে! তা ছাড়া এত বছর পরে ব্যাপারটা তো অসম্ভব!

আমি মরিয়া হয়ে সাইকেল চালাতে লাগলাম। মনে হল, সাইকেল থামালেই আমি শেষ হয়ে যাব। ঠান্ডা বাতাসে হাত-পা অসাড় হয়ে আসছে। কিন্তু আমি সাইকেল থামাব না। কিছুতেই না!

হঠাৎই লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে একটা টিউবওয়েলের সঙ্গে আমার সাইকেলের প্রচণ্ড ধাক্কা লাগল। আমি সাইকেল থেকে কয়েক হাত দূরে ছিটকে পড়লাম। টর্চটা

খসে পড়ল মাটিতে। সাইকেলটা কাত হয়ে পড়ে গেল। ওটার পেছনের চাকাটা তখনও পাক খেয়ে চলেছে।

আমি সেরকম কোনও চোট পাইনি, তবে মাথাটা কেমন ঘুরছিল। একটু পরে সামলে উঠেই জ্বলন্ত টর্চটার দিকে ঝাঁপিয়ে পড়লাম। ওটা মুঠোয় ধরে কোনওরকমে উঠে দাঁড়ালাম। তারপর টিউবওয়েলগুলোর দিকে চোখ পড়তেই চমকে উঠলাম। ওগুলো যেন সংখ্যায় একটু বেশি-বেশি লাগছে!

গুনতে শুরু করলাম। একটা, দুটো, তিনটে...তেরোটা! তেরোটা!

চারটে টিউবওয়েল বেড়ে গেল কেমন করে?

আমি একবার নয়—তিনবার গুনলাম। সত্যি-সত্যি তেরোটা!

আমি অবিশ্বাসে টিউবওয়েলগুলোর ওপরে টর্চের আলো বোলাতে লাগলাম। কিন্তু তার দরকার ছিল না। জ্যোৎস্নায় সবকিছু বেশ স্পষ্টই দেখা যাচ্ছিল।

মাটিতে পড়ে থাকা সাইকেলের চাকাটা তখনও ঘুরছিল। মনে হল যেন অপার্থিব কোনও শক্তি ওটাকে আড়াল থেকে একটানা ঘুরিয়ে চলেছে।

হঠাৎই খেয়াল করলাম, একটা টিউবওয়েল নড়ছে, ওটার চেহারা কেমন বদলে যাচ্ছে। ধীরে-ধীরে লম্বা হয়ে ওটা মানুষের আকার নিল। তারপর কালো ছায়াটা পায়ে চাকা লাগানো অলৌকিক গাড়ির মতো মসৃণ গতিতে ধীরে-ধীরে আমার দিকে এগিয়ে আসতে লাগল।

আমার হিম-ঠান্ডা পা দুটো জমাট বেঁধে গিয়েছিল। আতঙ্কে কাঠ হয়ে দেখতে লাগলাম, ওই ছায়াটা এগিয়ে আসছে, আর তার সঙ্গে মাঠে শুয়ে থাকা ওই ছায়াটার লম্বা ছায়াও এগিয়ে আসছে আমার দিকে।

বেশ খানিকটা দূরে আরও তিনটে টিউবওয়েল নড়ে উঠল। অন্ধকার মানুষের অবয়বে পালটে গেল। তারপর ওদের ছায়াসমেত আমার দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। বাকি ন'টা টিউবওয়েল যার-যার জায়গায় দাঁড়িয়ে রইল।

প্রথম অপচ্ছায়াটা যখন আমার বেশ কাছাকাছি এসে গেছে তখন আমি প্রাণপণে নিজেকে বোঝাতে চেষ্টা করছি, ভূত বলে কিছু নেই। এসবই আমার দেখার ভুল---হ্যালুসিনেশান।

কিন্তু বাচ্চাদের কান্নার শব্দটা এখন যে আরও স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি! অনুভব করছি, ঠান্ডা বাতাস পাগলের মতো এলোমেলো বইছে।

কীভাবে যে ওই প্রেতচ্ছায়ার ওপর টর্চের আলো ফেললাম জানি না—

কিন্তু ফেললাম। আমার টর্চ-ধরা হাত থরথর করে কাঁপছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও অনেক কিছুই স্পষ্টভাবে দেখতে পেলাম।

আমার সামনে দাঁড়িয়ে একজন লম্বা কুচকুচে কালো মানুষ। সম্পূর্ণ নগ্ন। তার সারাটা গা কাদা-মাটিতে মাখামাখি। এমনকী গাল কিংবা কপালও বাদ যায়নি।

লোকটার চোখ দুটো ধকধক করে জ্বলছে। হাঁ করা মুখ দিয়ে কুয়াশার স্রোত বেরিয়ে আসছে।

এ তো তানি নয়! তানি তো পাঁচ-ছ'বছরের বাচ্চা! এর বয়েস তো পঞ্চাশ কি একান্ন হবে!

অথচ বাচ্চাদের কান্নার শব্দে আমার কানে তালা লেগে যাচ্ছিল। মাথা ঝিমঝিম করছিল। মনে হচ্ছিল, এই বুঝি জ্ঞান হারিয়ে পড়ে যাব।

লোকটা ফিসফিস করে কথা বলল 'আমি তানি। আমরা চারজন অনেক নীচে, অন্ধকার গর্তের ভেতরে থাকি। এত বছর ধরে সেখানেই আমরা বড় হয়েছি। বড্ড তেষ্টা...তেষ্টায় বুক ফেটে যায়, বাবু। সব্বাইকে বোলো, আমরা আছি—মাটির নীচের জল খেয়ে বেঁচে আছি...।'

ফিসফিস করে কথাগুলো বলে তানি সাপের মতো মসৃণভাবে একটা গর্তে ঢুকে গেল।

আরও যে-তিনজন অপচ্ছায়ার মতো আমার দিকে এগিয়ে আসছিল তারাও দেখলাম তিনটে গর্তে নিঃশব্দে ঢুকে গেল।

শুধু কান্নার শব্দটা আমার কানে লেগে রইল।

আমার হাত থেকে টর্চটা আচমকা খসে পড়ল। পড়েই নিভে গেল। ঠান্ডা বাতাসের চেয়েও ঠান্ডা একটা বাতাসের ঝড় আমাকে জড়িয়ে ধরল।

আকাশের চাঁদ হঠাৎই ঢেকে গেল কুয়াশায়।





একটা ভাঙাচোরা বাড়ির ভেতরে

একটু আগেই টেলিফোনে খবর পেলাম, সন্তু মারা গেছে। রাজধানী এক্সপ্রেসে চড়ে দিল্লি যাচ্ছিল—ট্রেনটা লাইন থেকে ছিটকে গিয়ে বিশাল অ্যাক্সিডেন্ট। চার-চারটে বগি একেবারে উলটে গেছে। একশোরও বেশি লোক মারা গেছে। আহত প্রায় দুশো কি তারও বেশি।

টিভি চ্যানেলে ক্রমাগত ব্রেকিং নিউজ চলছিল। তারই মধ্যে আমার ল্যান্ডলাইনে ফোনটা এল। সন্তুর বড় ছেলে রাজু। ও দিল্লি যাওয়ার তোড়জোড় করছিল। তার আগেই কন্ট্রোল রুম থেকে থেকে খারাপ খবরটা এসে গেছে।

আমি অন্য কথা ভাবছিলাম। সন্তু সবসময় ভাবত, ও অপঘাতে মারা যাবে। কারণ, ওর চোখের সামনে মানু অপঘাতে মারা গিয়েছিল—তিরিশ বছর আগে। ওরকম মৃত্যু যারা দ্যাখে তারা নাকি অপঘাতে মারা যায়।

আমি আর হরিয়া ওকে অনেক বুঝিয়েছি। বারবার জোর দিয়ে বলেছি, ব্যাপারটা ছিল স্রেফ একটা অ্যাক্সিডেন্ট। কিন্তু সন্তু মানতে চায়নি। আমার আর হরিয়ার মনেও একটা আশঙ্কার কাঁটা দিন-রাত খচখচ করত।

তিরিশ বছর আগের ঘটনা হলেও আমার সবসময় মনে হয় সেটা তিরিশ সেকেন্ডের পুরোনো। গাঢ় শীতের এক ভোরবেলায় সেই 'দুর্ঘটনা' ঘটে

যাওয়ার পর আমি, সন্তু আর হরিয়া হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম। বাইরের ঠান্ডার চেয়েও শরীরের ভেতরের ঠান্ডাটা বেশি করে টের পাচ্ছিলাম। টের পাচ্ছিলাম, মানু আর আমাদের মধ্যে নেই। একটু আগেও যে আমরা চারজন ছিলাম এখন চার বিয়োগ এক সমান সমান তিন।

সেই ঘটনার কথা যারা জানত তারা জানত। আমরা তিনজন কখনো কাউকে বলিনি। কিন্তু সন্তুর মারা যাওয়ার খবরটা পাওয়ার পর মনে হল সময় কমে আসছে। এখন বাকি আছি আমরা দুজন—আমি আর হরিয়া। যদি আরও দেরি করি তা হলে এমন হতে পারে, আমি আর হরিয়া, দুজনের কেউই সেদিনের ঘটনাটা বলে যাওয়ার সময় পাব না। তাই...।

তিরিশ বছর আগে আমি তখন নিতান্তই বালক ছিলাম। বেশ মনে আছে, আমি পড়তাম ক্লাস সিক্সে। পরীক্ষা-টরীক্ষা শেষ হয়ে যাওয়ার পর শীতের ছুটিতে পান্নাগড়ে মামার বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিলাম।

এর আগেও মামা-বাড়ি আমি এসেছি, তবে সে মাত্র দু-একদিনের জন্যে—মা-বাবার সঙ্গে। আর এবারের আসাটা পুরোপুরি একমাসের জন্যে। আমাকে বড়মামার হাতে হ্যান্ডওভার করে মা আর বাবা ফিরে গিয়েছিলেন। বলেছিলেন, মাসখানেক পর আমাকে ফেরত নিতে আসবেন।

প্রথমেই আমার বন্ধুত্ব হয়েছিল বড়মামার মেয়ে মানুর সঙ্গে। ক্লাস ফাইভে পড়ে। রোগা টিংটিঙে চেহারা। খুব ছটফটে। কাঠবিড়ালীর মতো তরতর করে গাছে উঠতে পারে।

মামা-বাড়িটাকে আমার ভীষণ ভালো লেগে গিয়েছিল। এই ভালো লাগার পেছনে অনেকগুলো কারণ ছিল।

প্রথম কারণ ছিল পান্নাগড় গ্রাম। সেরকম গ্রাম আজকাল বোধহয় শুধু সিনেমাতেই দেখা যায়। মামা-বাড়ির চেহারাটাও ছিল সেই গ্রামের মতোই। তা ছাড়া সে-গ্রামে তখনও যে বিদ্যুৎ পৌঁছয়নি সে-ব্যাপারটা আমাকে বেশ অবাক করেছিল।

মামা-বাড়িতে ছিল বড় মাপের মাটির উঠোন। তার মধ্যে একটা কুয়ো। কুয়ো ঘিরে ইট পাতা। কুয়োর মাথায় কপিকল। আর কুয়োতলা ঘিরে বেশ কয়েকটা কলাগাছ। আর উঠোনের ঠিক মাঝখানে একটা প্রকাণ্ড আমগাছ।

মামা-বাড়িতে তিনটে মাত্র ঘর—বেড়া আর টালি দিয়ে তৈরি। একটা ঘরে বড়মামা, বড়মামি আর মানু থাকে। একটা ঘরে থাকে ছোটমামা আর দিদু। আর তিন নম্বর ঘরটায় কেউ থাকে না—শুধু টুকিটাকি জিনিসপত্র রাখা।

ভালো লাগার দ্বিতীয় কারণ ছিল আমার দিদু। প্রতিদিন সন্ধেবেলা দিদু আমাদের দারুণ-দারুণ গল্প বলত। গল্পগুলো দিদু কোথাও পড়েছে নাকি বানানো সেটা আমি বুঝতে পারতাম না। তবে আমার যে অবাক লাগত তার কারণ দিদুর চোখে দৃষ্টি ছিল না। ছানি-টানি পড়ে না কীভাবে যেন বেশ কয়েক বছর আগে চোখ দুটো নষ্ট হয়ে গেছে। মানু আর বড়মামি সবসময় দিদুর দেখাশোনা করত। আর ছিল একটা ছোট্ট কুকুর চিক্কা। পমেরেনিয়ান। গায়ে হালকা বাদামি রঙের বড়-বড় লোম।

চিক্কা ছোটমামার পোষা কুকুর হলেও দিদুর কাছে সবসময় ঘুরঘুর করত, দিদুর হাত-পা চাটত। ও যেখানেই থাকুক, দিদুর ডাক কানে গেলেই ছুটে আসত দিদুর কাছে। আর মানুও কুকুরটাকে খুব ভালোবাসত।

মামা-বাড়িটা ভালো লেগে যাওয়ার তৃতীয় কারণ ছিল স্বাধীনতা, প্রতিটি দিনকেই আমার ফিফটিন্‌থ অগাস্ট বলে মনে হত।

পান্নাগড় গ্রামটাকে আমি প্রথম দু-চারদিনের মধ্যেই চিনে নিয়েছিলাম। সে-কাজে আমার গাইড ছিল মানু—মানে, মন্দিরা। বয়েসে ছোট হলে কী হবে, ওর হাবভাব ছিল বড়দির মতো। পান্নাগড়ে নতুন বলে আমিও ব্যাপারটা মেনে নিয়েছিলাম।

সারাদিন আমরা দু-ভাই-বোনে যতই টো-টো করে ঘুরি না কেন, সন্ধে নামার মুখে ঢুকে পড়তাম বাড়িতে।

চিঁড়ে-মুড়ি যা হোক কিছু দিয়ে জলখাবার সেরে 'নমো-নমো' করে একটু বইপত্র নিয়ে বসা। তারপরই সোজা দিদুর কাছে। এবং গল্প শোনার কাজ শুরু।

সেটা চলত রাত পর্যন্ত। তারপর খেয়েদেয়ে দিদুর ঘরে আমি শুয়ে পড়তাম। দিদু একা তক্তপোশে—আর মেঝেতে ঢালা বিছানা করে আমি আর ছোটমামা। ছোটমামাটা ঘুমের ঘোরে নাক ডাকত।

আমি আর মানু ছাড়া আরও দুজন দিদুর গল্প শুনতে আসত। ওরা হল সন্তু আর হরিয়া। ওরা মানুদের শুধু প্রতিবেশীই ছিল না, মানুর খুব বন্ধুও ছিল। আমার আর মানুর রোজকার 'টো-টো কোম্পানি'-তে ওরা ছিল

নিত্যসঙ্গী। আর মাঝে-মাঝে চিঙ্কাও আমাদের সঙ্গী হত।

আমরা চারজন পান্নাগড়ে নানারকম অভিযান চালাতাম। গাছের ছোট-ছোট ডালের টুকরো ছিল আমাদের অভিযানের একমাত্র অস্ত্র।

পান্নাগড়ের কোথায় না অভিযান চালাতাম আমরা ! কলাবাগানে, চাষের খেতে, পুকুরপাড়ে, গাছপালায় ঠাসা জঙ্গলে আর একটি ভাঙাচোরা বাড়িতে। সব জায়গার মধ্যে সেই ধসে পড়া বাড়িটাই আমাদের কাছে সবচেয়ে ফেভারিট ছিল। কারণ, ওটার ভেতরে অভিযান চালানোর নানান উপাদান ছিল। তা ছাড়া বাড়িটা ছিল মানুদের বাড়ির খুব কাছে।

সারা গ্রামে ওটাই বলতে গেলে একমাত্র পাকা বাড়ি। গ্রামের লোকরা ওটাকে 'ভাঙা বাড়ি' অথবা রাজবাড়ি বলত। বাড়িটা এককালে ক'তলা ছিল কে জানে! তবে তখন যা দেখেছি তাতে শুধু ভাঙাচোরা বড়-বড় থাম। বাড়ির চারদিকের দেওয়াল বলে কিছু নেই। এখানে-ওখানে রাবিশের পাহাড়। ভেঙে কাত হয়ে থাকা বড় মাপের জানলা-দরজা। ফাটল ধরা দেওয়াল থেকে গজিয়ে ওঠা বড়-মাঝারি বট আর অশ্বত্থ গাছ। এ ছাড়া বাড়ির নানা জায়গায় আগুনের পোড়া দাগ।

বাড়িটার ভেতরে ঢুকে 'অভিযান' চালিয়ে আমরা যা-যা দেখেছিলাম সেটা হল, অসংখ্য গোলাপায়রা সেখানে আনাচেকানাচে বাসা বেঁধেছে। আর তার সঙ্গে প্রতিবেশী হয়েছে চামচিকে আর বাদুড়। এ ছাড়া রাবিশের স্তূপের মধ্যে লাঠির খোঁচা দিয়ে একটা সাপ দেখতে পেয়েছিলাম। হরিয়া বলেছিল, সাপটা নাকি চন্দ্রবোড়া। ওর বাবা ওকে এই সাপ চিনিয়েছে।

ভাঙাচোরা বাড়িটাকে ঘিরে আছে বেশ খানিকটা জমি। এককালে বোধহয় বাগান ছিল—এখন সেসব শুধুই জঙ্গল।

ওই বাড়িটার গল্প মানু আমাকে শুনিয়েছিল। বলেছিল, 'এটা আগে রাজবাড়ি ছিল, বুঝলে? তারপর একবার, বর্ষকালে, এই বাড়িটায় বাজ পড়েছিল। তাতে গোটা বাড়িটায় আগুন ধরে গিয়েছিল। সেই আগুনে রাজা, রানি, তাদের ছেলে-মেয়ে—সবাই পুড়ে মারা যায়...।'

সর্দিতে কাবু সন্তু দুবার নাক টেনে জিগ্যেস করল, 'কেউ বাঁচল না?'

তখন মানু বেশ ঝাঁজিয়ে বলেছিল, 'আগেও তো তোকে কতবার বলেছি! বারবার এক কোশ্চেন করিস কেন? বাঁচলে তো দেখতেই পেতিস...!'

হরিয়া চোখ গোল-গোল করে বলল, 'তাজ্জব কি বাত! একদম এক সাথ!'

মানু তখন স্কুলের দিদিমণিদের ঢঙে জোর দিয়ে বলেছে, 'হ্যাঁ রে, হাঁদা রাম। এক সাথ। আমার দিদু বলেছে—।'

মানুর শেষ কথাটা শুনে আমরা তিনজনেই চুপ করে গিয়েছিলাম। কারণ, দিদুর বলা সত্যকাহিনি কখনও বানানো হতে পারে না।

দিদুর কাছে আমরা 'ভাঙা বাড়ি'-র গল্প পরে আবার শুনেছি। দিদু বলেছিল, এ-গল্প দিদু শুনেছে আমার দাদুর কাছে। দাদু আবার শুনেছিল তার ঠাকুরদার কাছে।

রাজবাড়িটায় নাকি অনেক হীরে-জহরত আর সোনার মোহর লুকোনো আছে। সেগুলো নাকি শ'য়ে-শ'য়ে বছর ধরে এক যক পাহারা দেয়। সেইজন্যে অনেকবার চোর-ডাকাতরা ওই রাবিশের স্তূপ খুঁড়ে গুপ্তধন চুরি করার চেষ্টা করলেও শেষ পর্যন্ত কিছুই পায়নি। উলটে দুজন রাবিশের ভেতরে তলিয়ে গেছে। ওগুলো রাবিশ তো নয়, চোরাবালি!

আর চোর-ডাকাতদলের বাকিরা, যারা সেই তলিয়ে যাওয়ার দৃশ্য দেখেছিল, তারও পরে কোনও কোনওভাবে অপঘাতে মারা গেছে। সেই যক নাকি যাদের ওপরে নজর দেয় তাদের কাউকে ছাড়ে না—অপঘাতে মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত আঠার মতো লেগে থাকে।

দিদুর এই গল্পে মানু যতটা ভয় পেয়েছিল আমরা তিনজন ততটা নয়। কারণ, সন্তু বেশ ডাকাবুকো ছিল, আর হরিয়াও তার কাছাকাছি। আমি ঠিক সেরকম না হলে ভূত প্রেতে আমার তেমন ভয় কিংবা ভক্তি ছিল না। একেবারে ছোটবেলা থেকেই ভূত-টুত বলে কিছু নেই—এই কথাটাই মা আর বাবা যুক্তি দিয়ে আমার মনে গেঁথে দিয়েছিল।

কিন্তু রাতে হ্যারিকেনের আলোয় দিদু যখন 'ভাঙা বাড়ি'-র কথা শোনাত তখন মা-বাবার শেখানো সব যুক্তি-টুক্তি কেমন যেন ফিকে হয়ে যেত। আমি সম্মোহিতের মতো দিদুর দিকে তাকিয়ে থাকতাম। দিদুর টকটকে ফরসা মুখ, ভাঁজ পড়া গাল, অন্ধ দুটি চোখ—সব আমার চোখের সামনে আজও ভাসে। মাঝে-মাঝে দিদুর চোখের কোল দিয় জল গড়াত। দিদু একটা সাদা কাপড় দিয়ে সেটা মুছে নিত।

দিদু বলেছিল, 'শোন, তোরা তো পোলাপান— সব ঠিক-ঠাক তগো মাথায় ঢুকব না। ওই যকের যখন খিদা পায় তখন হ্যাতায় উপরে আসে। লড়াচড়া কইর‍্যা খাওনের বস্তু খোঁজে...।'

এসব শুনে আমার বেশ ভয়-ভয় করত। মাঝরাতে কখনও ঘুম ভেঙে

গেল টর্চ জ্বেলে ঘরের ভেতরেই এদিক-ওদিক দেখতাম। আমার পাশে মেঝেতে ছোটমামা নাক ডাকিয়ে ঘুমোত। আর দিদুর তক্তপোশের নীচে শুয়ে থাকত চিঙ্কা। টর্চের আলো পড়লেই ও জুলজুল করে আমার দিকে তাকাত। ওর জ্বলন্ত চোখ দেখেও আমার বুকটা কেমন করত।

ওই শীতের মধ্যেই একদিন হঠাৎ আকাশ কালো করে বৃষ্টি নামল। বড়মামা বলল, নিম্নচাপের বৃষ্টি। সে-বৃষ্টি চলল তিন দিন। ফলে তিনটে দিন আমাকে আর মানুকে ঘরেই কাটাতে হল। কিন্তু বৃষ্টি থামার পর যে-দিনটা পাওয়া গেল তাকে এককথায় সোনা ঝকঝকে দিন বলা যেতে পারে। ব্যস! আমাদের বৃষ্টি বিঘ্নিত 'ম্যাচ' আবার শুরু হয়ে গেল।

সেদিন রাজবাড়ির ভেতরে ঢুকে আমরা যখন এখানে-সেখানে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম, তখন হঠাৎই চোখে পড়ল রাবিশের স্তূপে একটা নড়াচড়া। ওপরের ছোট-বড় ঢেলাগুলো অল্প অল্প নড়ছে। যেন কোনও একটা কিছু রাবিশের নীচ থেকে ঠেলে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করছে।

চিঙ্কা আমাদের সঙ্গে ছিল। ও আচমকা লাফিয়ে পড়েছিল রাবিশের ওপরে। বারবার ঘেউঘেউ করে থাবা দিয়ে রাবিশের স্তূপ খোঁড়ার চেষ্টা করছিল। মানুর 'চিঙ্কা! চিঙ্কা!' ডাককে ও গ্রাহ্যই করছিল না।

আমরা চারজন আর দেরি না-করে ছুটে ওখান থেকে পালিয়ে এসেছিলাম আমাদের পালাতে দেখে ছোট্ট কুকুরটাও দৌড়ে পালিয়ে এসেছিল। ব্যাপারটা আমরা মামাদের বা দিদুকে জানাইনি।

আসল ঘটনাটা ঘটেছিল এর দিন সাতেক পরে। মানুর জন্মদিনের রাতে।

দিদু রাতে মাঝে মাঝে জেগে উঠত। ঘুমের ঘোরে কথাও বলত। কোনও-কোনও সময় সেসব কথা আমি শুনতে পেতাম। শুনে ঘুম ভেঙে যেত আমার।

জেগে উঠলে দিদু তক্তপোশের পাশ দিয়ে একটা হাত নীচে ঝুলিয়ে দিত। ঘুমজড়ানো গলায় বলত, 'চিঙ্কা, কই গেলি রে? আছিস তো, বাপধন?'

অমনি চিঙ্কা প্রভুভক্ত কুকুরের মতো দিদুর হাতটা বেশ করে চেটেপুটে দিত।

আমি দিদুর গলার আওয়াজে জেগে উঠলেই টর্চের আলোটা একপলক জ্বালতাম। ঘুম-চোখে চিঙ্কার হাত চাটা দেখেই আবার আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়তাম।

মানুর জন্মদিনে সারাটা দিন আমি আর মানু হইহই করে কাটালাম। সন্ধ্যে

আর হরিয়াকে মানু সকাল থেকেই আসতে বলেছিল। ফলে আমরা লুডো, ক্যারম, রুমাল-চোর খেলে বেশ মজা আর হল্লোড় করে দিনটা পার করলাম। মানু বায়না করায় হরিয়া আর সন্তু রাতে মামা-বাড়িতে থেকে গিয়েছিল। অবশ্য এই থেকে যাওয়াটা ওদের কাছে নতুন কোনও ব্যাপার ছিল না।

রাতে দিদুর ঘরের মেঝেতে আমাদের তিনজনের বিছানা পাতা হল। আমরা তিনজন একসঙ্গে শোব এরকম জেদ ধরায় ছোটমামা পাশের ঘরে শুতে গেল। আমাকে বারবার করে বলে গেল দিদুর খেয়াল রাখতে। আরও বলল, আমরা যেন গল্প করে বেশি রাত না করি।

এরকমভাবে আমরা আগেও শুয়েছি। তাই সেটাও কোনও নতুন ব্যাপার ছিল না।

হ্যারিকেনের আলোয় দিদুর কাছে গল্প শোনার পর আমরা লেপ মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লাম। কিছুক্ষণ নিজেরা ফিসফিস করে গল্প করে তারপর একসময় ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

রাতে হঠাৎই দিদুর গলা শুনে আমার ঘুম ভেঙে গেল।

'চিঙ্কা, আছস তো বাপধন? কই গেলি?'

লেপ ফাঁক করে তাকালাম।

হ্যারিকেনের পলতে অনেকটা নামিয়ে ঘরের কোণে রাখা ছিল। সেই আবছা আলোর আভায় চিঙ্কাকে দেখতে পেলাম। দিদুর ঝোলানো হাতটা চাটছে।

আবার কখন যেন আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

মাঝরাতের পর শীতটা বোধহয় জাঁকিয়ে পড়েছিল। কারণ, লেপ মুড়ি দিয়েও আমি শীতে কুঁকড়ে যাচ্ছিলাম।

কখনো-কখনো দিদুর গলা শুনতে পাচ্ছিলাম। আর শুনতে পাচ্ছিলাম চিঙ্কার হাত চাটার শব্দ। কুকুরটা পাগলের মতো দিদুর হাত চাইছে। 'চপাৎ-চপাৎ' শব্দ হচ্ছে।

ভোরের দিকে হঠাৎ আমার ঘুমটা ভেঙে গেল।

দেখি ভোরের আবছা আলো ঢুকছে খোলা দরজা দিয়ে। তার সঙ্গে কনকনে ঠান্ডা বাতাস।

দরজাটা খুলল কে?

পাশে তাকিয়ে দেখি সন্তু আর হরিয়া দুজনেই লেপমুড়ি দিয়ে ঘুমোচ্ছে।

দিদুর তক্তপোশের দিকে তাকাতেই আমার বুকটা বরফ হয়ে গেল।

দিদুর একটা হাত তক্তপোশের পাশ দিয়ে নীচে ঝুলছে। একটা কালো জিব সেই ঝুলন্ত হাতটা প্রাণপণে চাটছে। 'চপাৎ-চপাৎ' শব্দ হচ্ছে। ঘরে চিক্কার চিহ্নমাত্র নেই। তার বদলে মেঝেতে যা পড়ে আছে তাকে ভোরের আলোতে চিনতে ভুল হল নাঃ রক্ত।

ওই ভয় পাওয়া অবস্থাতেই এক ঝটকায় উঠে দাঁড়ালাম। পা দিয়ে লাথি মেরে সন্তু আর হরিয়াকে জাগিয়ে দিলাম। আমরা তিনজনে প্রাণপণে চিৎকার করে দিদুকে ডাকতে লাগলাম, ছোটমামা আর বড়মামাকেও ডেকে বাড়ি মাথায় করলাম।

দিদু কোনও সাড়া দিল না। একটা মৃতদেহের মতো বিছানায় চিত হয়ে চুপচাপ শুয়ে রইল। তবে ছোটামামা আর বড়মামার ঘরের দিক থেকে সাড়া শব্দ পেলাম।

আমরা তিনজন বেড়ার দেওয়ালে সিঁটিয়ে বড়-বড় চোখে জিবটার দিকে তাকিয়ে ছিলাম।

কালো, চ্যাপটা, খড়খড়ে, আর চামড়ার ওপরে ছোট-ছোট অসংখ্য ফুসকুড়ি।

জিবটার শেষ কোথায় আমরা বুঝতে পারছিাম না। প্রথমে ওটাকে দেখে সাপ বলে ভুল করেছিলাম। কারণ, ওটা ঘরের মেঝেতে এঁকেবেঁকে দরজা দিয়ে বাইরে চলে গেছে। আমরা তিনজন পাগলের মতো চিৎকার করতে-করতে ছুটে বাইরে বেরোলোম। দেখলাম, সন্তু আর হরিয়া কখন যেন ওদের অস্ত্র—মানে, গাছের সরু ডাল—হাতে তুলে নিয়েছে।

জিবটা ততক্ষণে চলতে শুরু করেছে। সাপের মতো হিলহিলে মসৃণ গতিতে ওটা ফিরে যাচ্ছে ওর আস্তানায়। লাটাইয়ের যেমন করে সুতো গোটানো হয় ঠিক সেইভাবে কেউ যেন জিবটাকে টেনে নিচ্ছে মুখের ভিতরে।

আমাদের চিৎকারে বড়মামা, বড়মামি, মানু, ছোটমামা সবাই বেরিয়ে এসেছে উঠোনে।

ওরা সবাই 'কী হয়েছে? কী হয়েছে?' করে চিৎকার করছিল।

তবে সড়সড় করে চলে যাওয়া জিবটাকে দেখে মানু যে-চিৎকারটা দিয়েছিল সেটা আমি কোনওদিনও ভুলতে পারব না। অতল কুয়োর ভেতর থেকে বেরিয়ে আসা এক তীব্র তীক্ষ্ণ চিৎকার। সে-চিৎকারে অলৌকিক

জগতের ঠান্ডা বাতাস জড়িয়ে আছে।

জিবটা ততক্ষণে উঠোন ছাড়িয়ে বৃষ্টি-ভেজা মেঠো রাস্তায় পড়েছে। তরতর করে ছুটে চলেছে ভাঙাচোরা বাড়ির দিকে।

আমাদের তিনজনের ভেতরে কী একটা যেন হয়ে গেল। দিদুর কথা ভেবে, চিঙ্কার কথা ভেবে আমাদের মধ্যে বোধহয় রাগ আর আক্রোশ উথলে উঠেছিল। দেখলাম হরিয়া আর সন্তু দুজনেই জিবটাকে তাড়া করে ওটার ওপরে কয়েক ঘা লাঠির বাড়ি বসিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করল।

মামা-মামিরা পেছন থেকে আমাদের বারবার ডাকছিল, কিন্তু সেসব ডাক আমাদের কানে ঢুকছিল না।

জিবটা ভাঙাচোরা বাড়ির ভেতরে ঢুকে পড়ল। আর ওটাকে তাড়া করে আমরাও। হঠাৎই খেয়াল করে দেখি মানু কখন যেন ছুটে আমাদের কাছে এসে গেছে। পেছন থেকে ওর মায়ের 'মানু! মানু!' ডাক আমরা তিনজন শুনতে পাচ্ছিলাম। কিন্তু মানু সেসবে ভ্রূক্ষেপ করলে তো!

ভোরের আলোয় দেখতে খুব একটা অসুবিধা হচ্ছিল না। শুধু চারপাশে ঠান্ডা কুয়াশা ভেসে বেড়াচ্ছিল। কখনো-কখনো আমাদের নজর ঝাপসা করে দিচ্ছিল।

আমরা চারজন দুদ্দাড় করে ভাঙাবাড়িতে ঢুকে পড়েছি। আমাদের চেঁচামেচি আর পায়ের শব্দে ভাঙা বাড়িটার আনাচকানাচ থেকে অনেকগুলো পায়রা ডানা ঝাপটে বাতাসে উড়তে শুরু করল। ওদের ডানার 'পতপত' শব্দ অনেক বাদুড় আর চামচিকেকে চমকে দিল।

জিবটা একটা রাবিশের স্তূপের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছিল। তখনই চোখে পড়ল রাবিশের ওপরে গোলমরিচের গুঁড়োর মতো ছড়িয়ে রয়েছে চিঙ্কার লোম। আর সেই লোমের গোছার কোথাও-কোথাও রক্তের দাগ।

মানু চিৎকার করে কেঁদে উঠল। সেই বুকফাটা হাহাকারে আমাদের বুকের ভেতরটা মুচড়ে উঠল। পেছনে বড়মামা আর ছোটমামার গলায় আওয়াজ পেলাম। আর ঠিক তখনই আমাদের চমকে দিয়ে মানু 'চিঙ্কা!' বলে ডুকরে উঠে জিবটা লক্ষ্য করে পাগলের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল।

জিবটা তখনও হাত দুয়েক দেখা যাচ্ছিল। চোখের পলকে ওটা জ্যান্ত চাবুকের মতো বাতাসে 'সাঁই' শব্দ তুলে মানুর পা জড়িয়ে ধরল, তারপর আমাদের চোখের সামনে সেই রাবিশের স্তূপ জীবন্ত চোরাবালি হয়ে মানুকে গিলে ফেলল।

আমরা সবাই পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। শুধু হাত-পা আর ঠোঁট থরথর করে কাঁপছিল।

গত কয়েক মিনিটের মধ্যে কী যে ঘটল, কেন ঘটল এসব ভেবে-ভেবে আমাদের মন অসাড় হয়ে গিয়েছিল।

জীবন বড় বিচিত্র। তিরিশ বছর সময় গড়িয়ে গেলেও সন্তু আর হরিয়ার সঙ্গে আমার এখনও ই-মেইল আর ফোনে যোগাযোগ আছে। মানে, ছিল। কারণ সন্তু তো এখন আর নেই।

সেদিন দিদ্দু আর মানুকে আমরা হারিয়েছিলাম। রাবিশের স্তূপের মধ্যে অনেক খোঁড়াখুঁড়ি করেও মানুকে আর পাওয়া যায়নি। আজ সন্তুকে হারালাম।

কিন্তু এরপর কার পালা? আমার, না হরিয়ার?

মানুর তিরিশ বছর আগের বুকফাটা হাহাকার আমার কানে বেজে উঠল আবার।



উজ্জ্বল অন্ধকার

আমি চাইনি ফুটফুটে মেয়েটা আমার কাছে আর আসুক, কিন্তু ও আবার এল। প্রথমবার যখন ও হঠাৎ করে এসে পড়েছিল তখনই ওকে বারণ করেছিলাম। বলেছিলাম, 'এখানে আর তুমি এসো না—।'

'কেন, আসব না কেন?' চুল ঝাঁকিয়ে ঘাড় বাঁকিয়ে আমার দিকে তাকিয়েছিল মেয়েটা।

'না, মানে...এইরকম একটা ভাঙাচোরা পোড়ো বাড়ি। এখানে সাপ-খোপ থাকতে পারে, কাঁকড়াবিছে থাকতে পারে...। মানে, বিপদ হতে পারে...।'

'কীসের বিপদ?'

ওঃ! বাচ্চাদের নিয়ে এই এক মুশকিল! খালি প্রশ্ন করে—বুঝতে চায় না।

কিন্তু কথাটা কি আমি ঠিক বললাম? মোটেই না। কারণ, ওকে আমি বিপদের ধরনগুলো ঠিক-ঠিকভাবে বুঝিয়ে বলিনি।

ওকে আমি বলিনি যে, আমি একজন ভ্যাম্পায়ার। মানুষ শিকার করে তেষ্টা মেটানো আমার অভ্যেস। যখন আমার পাগল-করা তেষ্টা পায় তখন আমার জ্ঞান থাকে না। ন্যায়-অন্যায় সব গুলিয়ে যায়। চোখের নজর ঘোলাটে হয়ে যায়। মাথার ভেতরে পঞ্চাশটা পাগলা ঘোড়া ছুটতে থাকে। তখন লজিক-টজিক কোনও কাজ করে না। আমার সামনে কে আছে সেটা খতিয়ে দেখার

মতো অবস্থা থাকে না। শুধু একটা মানুষ পেলেই হল।

মেয়েটার নাম বাবলি। ভালো নাম চন্দ্রমালা। ক্লাস থ্রি-তে পড়ে।

বাবলিই আমাকে ওদের বাড়ির সাতকাহন শুনিয়ে দিয়েছে। ওর নিজের কথা, ওর বাবার কথা, মায়ের কথা, দাদার কথা—সব। এত বকবক করতে পারে মেয়েটা!

ওর প্রশ্নের উত্তরে আমি বললাম, 'সব বিপদের কথা তুমি এখন বুঝবে না—বড় হলে বুঝবে। কিন্তু সাপ আর কাঁকড়াবিছের ভয়টাও তো মিথ্যে নয়! ওরা সব ভাঙাচোরা ইটের পাঁজার ফাঁকফোকরে লুকিয়ে থাকে। তা ছাড়া এই বাড়িটার সব জায়গায় আগাছার জঙ্গল গজিয়ে গেছে। তার আড়ালেও ওরা থাকতে পারে—।'

'তা হলে তোমারও তো বিপদ!'

না, এই কটকট করে কথা-বলা পুতুলটার সঙ্গে আমি পেরে উঠব না।

'ওঃ, বাবলি! তোমার সঙ্গে আমি তর্কে পারব না।'

ওকে কাছে টেনে নিলাম। আদর করে গাল টিপে দিয়ে সেই গালে একটা চুমু খেলাম।

বাবলি বলে উঠল, 'বাব্বাঃ, তোমার হাতটা কী গরম! ঠোঁট কী গরম! তোমার নিশ্চয়ই জ্বর হয়েছে। মা বলে, জ্বর হলে গা গরম হয়। দেখি তোমার কপালটা দেখি...।'

আমি ওকে বাধা দিয়ে ওঠার আগেই মেয়েটা আমার কপালে হাত চেপে ধরেছে এবং চোখ বড়-বড় করে আঁতকে উঠেছে।

'ও মা! তোমার গা যে পুড়ে যাচ্ছে! এখুনি আমি বাপিকে গিয়ে বলছি-ডাক্তারকাকুকে খবর দিতে হবে—'

'না, না ওসব কিছু করতে হবে না। আজ রাতেই জ্বর-টর সব সেরে যাবে। তুমি আগে একটু স্থির হয়ে বোসো তো!'

বাবলিকে জোর করে বিছানায় আমার পাশে বসালাম।

না, মেয়েটা মিথ্যে বলেনি। পরশু বিকেল থেকেই আমার ধুম জ্বর এসেছে। তখন আমি হাইওয়ে দিয়ে বাসে করে যাচ্ছিলাম। যখন বুঝলাম, আর সোজা বসে থাকতে পারছি না, তখন পায়ের কাছে থেকে সুটকেসটা নিয়ে বাস থেকে নেমে পড়েছি।

আকাশ মেঘলা। টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। সন্ধের অন্ধকার নামতে আর বেশি দেরি নেই।

রাস্তার একদিকে বৃষ্টি-ভেজা ধানখেত, আর একদিকে কয়েকটা ঘর-বাড়ি আর কাঁচা রাস্তা। সেই রাস্তার দু-ধারে বড়-বড় ঝাঁকড়া গাছ।

পায়ে-পায়ে একটা টিনের ছাউনির নীচে গিয়ে দাঁড়ালাম। এটা কোনও সময় বোধহয় একটা দোকান ছিল, এখন আর নেই। শুধু পড়ে আছে ভেঙে ধসে যাওয়া একটা পাতা উনুন, আর বাঁশের ফালি দিয়ে তৈরি একটা বেঞ্চি। সেটারও অবস্থা খুব খারাপ। তবে সেই বেঞ্চিতে কালো রঙের বুড়ো মতন একজন লোক বসে আছে। বিড়ি টানছে।

সুটকেসটা মাটিতে রেখে আমি দাঁড়িয়েই রইলাম। বুড়ো মানুষটার দিকে একপলক তাকিয়ে ওর বয়েসের কথা ভাবছিলাম। কত হবে? বড়জোর বাহাত্তর কি তিয়াত্তর?

আর আমার? আমার বয়েস খুব কম করে একশো দশ কি বারো হবে। অথচ দেখে মনে হবে পঁয়তিরিশ কি ছত্তিরিশ। বয়েস আমার শরীরে কোনও ছাপ ফেলতে পারেনি—না বাইরে, না ভেতরে। কারণ, ভ্যাম্পায়ারদের এটাই নিয়ম। আমি অনেক ভ্যাম্পায়ারকে দেখেছি পাঁচশো কি ছ'শো বছর ধরে দিব্যি বেঁচে আছে।

কিন্তু আমি জানি, সেটা আসলে হল 'মরে বেঁচে থাকা'।

ভ্যাম্পায়ারদের অসুখবিসুখের একমাত্র চিকিৎসা অপেক্ষা। কারণ, মানুষের ওষুধপত্র ভ্যাম্পায়ারদের ওপরে কাজ করে না। তাই আমাকে এখন শুধু অপেক্ষা করতে হবে। কোনও একটা নিরিবিলি জায়গায় লুকিয়ে থেকে জ্বরটা চলে যাওয়ার জন্যে কয়েকদিন ধরে অপেক্ষা করতে হবে।

জ্বরে আমার শরীরটা কাঁপছিল। মনে হচ্ছিল, এই বুঝি টলে পড়ে যাব। একটা আস্তানা দরকার। এক্ষুনি দরকার।

উলটোদিকে দু-তিনটে দোকানের চালাঘর। চায়ের দোকান আর পান-বিড়ির দোকান। তবে এই একঘেয়ে বৃষ্টিতে সেরকম লোকজন নেই।

আমি বুড়ো লোকটাকে জিগ্যেস করলাম, 'এখানে কোনও পুরোনো বাড়ি-টাড়ি আছে? মানে, ভাঙাচোরা...কেউ থাকে না, এমন?'

বুড়োটা অবাক চোখে আমার দিকে তাকাল। ওর কালো চামড়ায় অসংখ্য ভাঁজ। নীচের ঠোঁটটা ঝুলে পড়েছে। ভেতরের হলদেটে এবড়োখেবড়ো দাঁত দেখা যাচ্ছে।

আমি আর দেরি করলাম না। পকেট থেকে একটা পঞ্চাশ টাকার নোট বের করে ওর দিকে এগিয়ে দিলাম: 'আমি কলকাতার সরকারি অফিস থেকে

আসছি। আর্কিয়োলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া। হেরিটেজ বাড়ির খোঁজ করছি। পুরোনো ধসে পড়া বাড়ি...।'

আমার মুখে এতগুলো ইংরেজি শব্দ শুনে বুড়ো বেশ ঘাবড়ে গেল। কাল্পনিক কিছু একটা খাওয়ার ঢঙে মুখ খোলা-বন্ধ করল কয়েকবার। তারপর : 'আছে না আবার! খুব আছে। মজুমদার বাড়ি। সরকারকে সেই কোনকালে দানপত্তর করে গেছে। আমার তখন পোলাপান বয়স। এখন সে-বাড়ি মাটি আর ভুসি। বাদুড় প্যাঁচারা থাকে। মা মনসার লম্বা-লম্বা বাহনরাও থাকতে পারে...।'

'বাড়িটা আমাকে দেখিয়ে দিতে পারেন?' আবার একটা পঞ্চাশ টাকার নোট।

সঙ্গে-সঙ্গে হলদেটে দাঁত বের করে একগাল হাসি। দুটো পঞ্চাশ টাকার নোটই ওর ধুতির গেজেতে উধাও হয়ে গেল পলকে।

এইভাবে টাকা দিয়ে কাজ হাসিল করতে আমার ভালো লাগে না। কিন্তু কী করব! ইমার্জেন্সি। তা ছাড়া এই টাকাগুলো তো আমার নয়! যারা আমাকে রক্ত দিয়েছে, আর বিনিময়ে যাদের আমি মুক্তির স্বাধীনতা দিয়েছি, এই টাকাগুলো ওদের পকেট থেকে নেওয়া। 'মুক্তি'-র পর তো টাকাগুলো ওদের কোনও কাজে লাগত না! তাই আমি নিয়ে নিয়েছি—'মুক্তিপণ' হিসেবে।

গ্রামের কাদা প্যাচপেচে পথ ধরে আমরা হেঁটে চললাম। তারপর একসময় এসে পৌঁছলাম আমার নতুন আস্তানায়।

বুড়োকে বললাম যে, বাড়িটা ইনস্পেকশান করেই আমি চলে যাব।

তারপর থেকে আমি এইখানে।

আমি এক জায়গা থেকে আর-এক জায়গায় চলে বেড়াই—ভবঘুরের মতো। সঙ্গে থাকে একটা সুটকেস। সুটকেসটা বয়ে বেড়াতে আমার একটুও কষ্ট হয় না। কারণ, আমাদের শরীরের শক্তি বা ক্ষমতা—কোনওটাই মানুষ কল্পনা করতে পারে না।

এমনিতে আমরা মানুষের মতো সাধারণ খাবার খেয়ে বেঁচে থাকি। শুধু মাঝে-মাঝে যখন তেষ্টা পায় তখন অ-মানুষ হয়ে যাই। এরকমটা হয় মাসে দু-তিনবার। তবে কখন সেই তেষ্টার ঝোঁকটা আসবে সেটা আগে থেকে বোঝা যায় না।

ওই ঝোঁকটা এলে আমার গলা শুকিয়ে আসে। বুকের ভেতরটা কাঠ হয়ে যায়। মাথার ভেতরে পঞ্চাশটা পাগলা ঘোড়া দৌড়তে থাকে।

সেই তেষ্টা যদি আটচল্লিশ ঘন্টার মধ্যে না মেটে তা হলে সব শেষ। ভ্যাম্পায়ার-জীবনে ফুল স্টপ।

প্রথম-প্রথম এই অস্বাভাবিক জীবনটাকে আমি মেনে নিতে পারিনি। কিন্তু তারপর...ধীরে-ধীরে এই জীবনকে শুধু যে মেনে নিয়েছি তা নয়, ভালোবেসেও ফেলেছি।

অ-মানুষের জীবন নিয়ে মানুষের মাঝে আমি চলে-ফিরে বেড়াই। উদ্দেশ্যহীন, অর্থহীন—একা। মাঝে-মাঝে মনে হয়, শেষ করে দিই এ-জীবন। কিন্তু পারি না। আমার ভেতর থেকে অ-মানুষ সত্তাটা ডুকরে কেঁদে ওঠে। বলে, 'আমি বেঁচে থাকলে ক্ষতি কী!'

তখন আমি হেরে যাই।

কিন্তু আমার এ-জীবন শেষ করাও তো সহজ নয়!

হয় ধারালো কাঠের গজাল ঠুকে দিতে হবে আমার হৃৎপিণ্ডে, নয় রুপোর বুলেট দিয়ে বুক এফোঁড়-ওফোঁড় করতে হবে। এ ছাড়া আর একটাই পথ : তেষ্টা না মিটিয়ে আটচল্লিশ ঘন্টা পার করে দেওয়া।

সেটা কি নিজে-নিজে কখনও পারা যায়! কখ্‌খনও না!

ভাঙা বাড়িটাতে আমি গুছিয়ে বসলাম।

পুরোনো ইট আর ভাঙা পাথর দিয়ে একটা তক্তপোশ মতন তৈরি করে নিলাম। তার ওপরে কম্বল আর চাদর পেতে মোটামুটি একটা বিছানা তৈরি হয়ে গেল। সুটকেস থেকে হাওয়া-বালিশ বের করে ফুঁ দিয়ে ফুলিয়ে নিলাম। মানুষের মতো আমাদের অনেকবার ফুঁ দিতে হয় না। একটা লম্বা ফুঁ-তেই কাজ হয়ে যায়।

বিছানা-বালিশ তৈরি হয়ে গেলে পায়ের জুতো জোড়া খুলে টান-টান হয়ে শুয়ে পড়লাম। মনে-মনে চাইলাম, আমার জ্বরটা যেন তাড়াতাড়ি চলে যায়।

মাঝ রাতে আমার ঘুম ভেঙে গেল।

টের পেলাম, মাথা বেশ ভার-ভার—তার সঙ্গে খিদেও পাচ্ছে।

সুটকেস থেকে পলিথিনে মোড়া স্টোভ, জলের জেরিক্যান, আর কেরোসিনের ছোট জেরিক্যান আগেই বের করে রেখেছিলাম। দুটো প্যাকেট থেকে চাল আর ডাল বের করলাম। চাল আর ডালের প্যাকেট আমার সবসময় কেনা থাকে। ঘুরে বেড়ানোই যার জীবন তার আর উপায়ই-বা কী!

অন্ধকারে দেখতে আমার কোনও অসুবিধে হয় না। তাই অন্ধকারেই দিব্যি স্টোভ জ্বালিয়ে চাল আর ডাল মিশিয়ে হাঁড়িতে করে বসিয়ে দিলাম। তারপর

চুপচাপ বসে রইলাম। স্টোভের নীল আগুনের শিখার দিকে তাকিয়ে রইলাম। নিজের অর্থহীন জীবনের কথা ভাবতে লাগলাম।

একসময় খাওয়াদাওয়া সেরে চাদর মুড়ি দিয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম।

সেই ঘুম আমার ভাঙল পরদিন বিকেলে—মানুষের গন্ধে, আর পায়ের শব্দে। আমি সঙ্গে-সঙ্গে ভাঙা ঘরটার অন্ধকার কোণে লুকিয়ে পড়লাম। কেউ যেন আমাকে এখানে খুঁজে না পায়।

আর যদি খুঁজে পায় তা হলে আমার হয়েতো আর কোনও উপায় থাকবে না। আমার এই আস্তানার কথা গোপন রাখার জন্যে আমাকে খারাপ কাজ করতে হবে।

দিব্যি লুকিয়ে ছিলাম, কিন্তু কীভাবে যেন বাচ্চা মেয়েটা ঘরের দরজার কাছে এসে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। স্টোভ আর হাঁড়িকুড়ির দিকে একবার তাকিয়ে চোখ ফেরাল আমার দিকে।

আবছা অন্ধকারেও মেয়েটা ঠিক দেখতে পেল আমাকে। অনেকটা দিদিমণি-দিদিমণি গলায় জিগ্যেস করল, 'তুমি কি লুকোচুরি খেলছ?'

ওর গায়ে বিকেলের আলো পড়েছিল। আর ওর গা থেকেও বোধহয় এক অদ্ভুত আলো বেরোচ্ছিল। ওরকম আলো আমি আগে কখনও দেখিনি।

'তুমি কি কারও সঙ্গে লুকোচুরি খেলছ?' আবার প্রশ্ন করল।

'হ্যাঁ, তোমার সঙ্গে—' বলে হাসলাম।

আর লুকোনোর কোনও মানে হয়। তাই বিছানায় গিয়ে বসে পড়লাম। তা ছাড়া জ্বরটার জন্যে দাঁড়িয়ে থাকতেও কষ্ট হচ্ছিল।

ও বলল, 'আমার নাম বাবলি। ভালো নাম চন্দ্রমালা।' আমার দিকে তিন-চার পা এগিয়ে এল ঃ 'তোমার নাম কী?'

আমার নাম? আমার নাম?

বহুকাল আগের ব্যাপার হলেও নামটা আজও বেশ মনে আছে।

'আমার নাম প্রত্যূষপ্রসন্ন...।'

ও মা! নামটা শোনামাত্রই বাবলির কী হাসি! হেসে-হেসে প্রায় লুটিয়ে পড়ে যায় আর কী!

'বাব্বা ঃ, কী খটোমটো নাম। এ নাম আমি বলতেই পারব না ।'

একশো বছরের পুরোনো নাম তো এরকমই হবে!

ওর কথা শুনে আমি হেসে ফেললাম, 'তুমি আমকে ''বন্ধু' বলে ডাকো।'

'এটা খুব ভালো নাম—।' ও মন্তব্য করল।

আমি বাবলিকে দেখছিলাম আর ভাবছিলাম। ওঃ, কতদিন পরে আমি অন্তর থেকে হাসলাম।

মেয়েটার বয়েস আট কি ন'বছর। চোখ দুটো টানা-টানা। ফরসা ফুটফুটে। গায়ে একটা গোলাপি ফ্রক। পায়ে নীল রঙের হাওয়াই চটি।

বাবলির চুল দুপাশে দুটো হর্সটেইল করে বাঁধা। তাতে লাল রঙের ফুল বসানো হেয়ারব্যান্ড।

ওকে মুগ্ধ হয়ে দেখছিলাম আর আমার ছোটবেলার কথা মনে পড়ে যাচ্ছিল।

'তুমি এখানে কী করছিলে বললে না তো!' বাবলি বলল।

'আমার শরীর খারাপ—তাই এখানে নিরিবিলিতে বিশ্রাম নিচ্ছি। কিন্তু তুমি এখানে কী করতে এসেছ?'

'আমি তো রোজ বিকেলে বন্ধুদের সঙ্গে এখানে আসি—লুকোচুরি খেলি। বাইরে দিয়ে যাওয়ার সময় মনে হল যেন ভেতর থেকে একটা আওয়াজ পেলাম। তাই ভাবলাম, দেখি তো ভেতরে পাপ্পু, বিনি, মনিরা কেউ আছে নাকি। তারপর ঢুকেই—

'আমাকে দেখতে পেয়ে গেলে।' বাবলির কথার খেই ধরে আমি বললাম, 'সেইসঙ্গে নতুন একজন বন্ধু পেয়ে গেলে।'

মেয়েটা আরও অনেক কথা বলতে লাগল। ওর কথার স্রোত আর থামতেই চায় না।

আমি ভয় পাচ্ছিলাম। ওর দাদা কিংবা মা-বাবা ওকে আবার খুঁজতে না চলে আসে!

বাবলি আমার পাশে বসার পর ওর মাথায় হাত বুলিয়ে বললাম, 'এবার যাও...লক্ষ্মী মেয়ে। তোমার দেরি হয়ে যাবে...।'

কী ভেবে ও উঠে দাঁড়াল। আমিও ওর সঙ্গে উঠে দাঁড়ালাম।

ঘুম থেকে উঠেই দেখেছি, মেঘ কেটে গেছে। আকাশে নীল রং। ভাঙাচোরা বাড়ির ফাঁকফোকর দিয়ে কয়েকটা গাছ চোখে পড়ছিল। সেখান থেকেই বোধহয় পাখির ডাক ভেসে আসছে।

বাবলিকে বললাম, আমার কথা কাউকে বোলো না কিন্তু—।'

'কেন? বলব না কেন?'

'আমার তো ভীষণ জ্বর। এই জ্বরের মধ্যে লোকজন আমাকে দেখতে এলে আমার আরও কষ্ট হবে। তুমি কি তাই চাও?'

সঙ্গে-সঙ্গে মাথা ঝাঁকাল বাবলি : 'না—চাই না। কাউকে তোমার কথা বলব না।'

'তুমি খুব ভালো মেয়ে—।'

'আসি, বন্ধু, আবার আসব...।' বলে ও চলে গেল।

কিন্তু কী আশ্চর্য! ও আমার মনের মধ্যে থেকে গেল।

ওকে আমি এখানে আসতে বারণ করেছি। কিন্তু ওর সঙ্গে আর দেখা হবে না ভেবে আমার মনটা খারাপ হয়ে গেল।

বিছানায় গিয়ে চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লাম। টের পাচ্ছিলাম, জ্বরটা বাড়ছে।

ঘুম যখন ভাঙল তখন বেশ রাত। ঘরের ভাঙা জানলা দিয়ে পাশের একটা হলঘর দেখা যাচ্ছে। সেই হলঘরের ভাঙা ছাদের ফাঁক দিয়ে উঁকি দিচ্ছে একটুকরো আকাশ। আকাশে তারার ফুটকি।

হাতঘড়ির দিকে তাকালাম : রাত প্রায় একটা।

বেশ খিদে পাচ্ছিল। তাই কোনওরকমে উঠে রান্নাবান্না শুরু করলাম। খাওয়াদাওয়ার পর কী খেয়াল হতে সুটকেসটা খুললাম। জামাকাপড়ের নীচে একটা ফোলিয়ো ব্যাগ ছিল। সেটা বের করে তার ভেতর থেকে একটা জরাজীর্ণ বাদামি খাম বের করে নিলাম।

সেই খামের ভেতর থেকে বেরোল একটা বিবর্ণ ফটোগ্রাফ। সময়ের রসায়নে সাদা-কালো ছবিটা সিপিয়া রঙের হয়ে গেছে। কিন্তু আমি 'ছোটবেলার আমি'-কে চিনতে পারছি।

বাবার সঙ্গে ময়দানে বেড়াতে গিয়েছিলাম। তখন এক সাহেব ফটোগ্রাফার আমার এই ফটোটা তুলে দিয়েছিল।

এই ঝাপসা ছবিতেও বোঝা যাচ্ছে আমি কীরকম ফুটফুটে ছিলাম—বাবলির মতো। এখন যদি ও আমাকে দেখত তা হলে নিশ্চয়ই ভয় পেয়ে যেত। অবাক হয়ে ভাবত, অন্ধকারে আমি কেমন করে ফটোটা দেখতে পাচ্ছি।

মনের মধ্যে এমন একটা আবেগ তৈরি হচ্ছিল যার নাম বা পরিচয় আমি জানি না। এইরকম একটা আবেগ যে আমার মধ্যে ছিল সেটাই আমি কখনও বুঝতে পারিনি।

ভাবতে-ভাবতে মনে পড়ে যাচ্ছিল সেই ভয়ংকর রাতটার কথা। বাবা-মায়ের সঙ্গে গাজনের মেলা দেখতে গিয়ে আমি হারিয়ে গিয়েছিলাম। তখন সন্ধে হয়ে এসেছিল।

একটা লোক আমাকে মেলার ভিড়ের মধ্যে থেকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল। লোকটার সারা গা থেকে বিড়ি আর গাঁজার গন্ধ বেরোচ্ছিল।

লোকটার গায়ে যে অসম্ভব জোর সেটা ভালোমতোই টের পেয়েছিলাম। ও এমনভাবে আমার হাতের ডানা খামচে ধরেছিল যে, হাতটা কনকন করছিল। আমাকে ভয় দেখিয়ে লোকটা হিন্দিতে বলেছিল, চেঁচালেই ও আমাকে গলা টিপে মেরে ফেলবে।

আমি চেঁচাব কী, আমি তখন ভয়ে থরথর করে কাঁপছিলাম।

মেলার মাঠের একদিকে ছিল হালকা জঙ্গল। সেই জঙ্গলের মধ্যে ছিল একটা পুরোনো শিবমন্দির। লোকটা আমাকে সেই মন্দিরের পেছনে নিয়ে গেল।

মন্দিরে প্রদীপ জ্বলছিল, ঘণ্টা বাজছিল। লোকটা আমাকে শালপাতায় করে প্রসাদ এনে খাওয়াল। প্রসাদটা খেয়েই আমার প্রচণ্ড ঘুম পেয়ে গিয়েছিল।

ঘুম ভাঙতেই নাকে এল গাঁজা আর বিড়ির উৎকট গন্ধ। চারপাশে তাকিয়ে দেখি সব অন্ধকার। শুধু দুটো সবুজ চোখ জ্বলছে—আমার দিকে চেয়ে আছে।

বনবেড়াল কি শেয়াল ভেবে আমি ভয় পেয়ে গেলাম। কিন্তু ঠিক তখনই হিন্দিতে কে যেন বলল, 'পাস আও, মেরে মুন্না—।' তারপর দুটো শক্তিশালী হাত আমাকে কাছে টেনে নিল। সবুজ চোখ দুটো আমার কাছে, আরও কাছে, চলে এল। তারপর...।

কানের ঠিক নীচে, গলায়, কী যেন ফুটে গেল। ইনজেকশানের ছুঁচের মতো। তারপর মাথাটা ঝিমঝিম করতে লাগল। নেশার ঘোরের মতো ঘোর লেগে গেল আমার।

ভোরবেলা শিবমন্দিরের পেছনে জঙ্গলের মধ্যে বাবা-মা আমাকে খুঁজে পেয়েছিল। কিন্তু তখন আমি আর আগের মতো ছিলাম না—পালটে গিয়েছিলাম।

পালটে যাওয়ার উপসর্গগুলো ধীরে-ধীরে আমার কাছে স্পষ্ট হতে লাগল। যখন সেটা বিপজ্জনক মাত্রায় পৌঁছল তখন আমি বাড়ি ছেড়ে পালালাম। কিন্তু কোথায় যে পালাব সেটা বুঝে উঠতে পারছিলাম না। তাই শেষ পর্যন্ত চিরপথিক হয়ে গেলাম।

ফটোর দিকে তাকিয়ে থাকতে-থাকতে আমি বালক-বয়েসে ফিরে গেলাম।

বাবলির সঙ্গে ছবির এই ছেলেটির বন্ধুত্ব হলে কী ভালোই না হত!

বহুদিন পরে ভ্যাম্পায়ার জীবনের জন্যে আক্ষেপ হল আমার। টের পেলাম, চোখের কোণে জল এসে গেছে।

শেষ পর্যন্ত চাদর গায়ে জড়িয়ে আবার শুয়ে পড়লাম বটে, কিন্তু ঘুম এল না। জ্বরের ঘোরে কল্পনার জগতে ভেসে চললাম। ভাসতে-ভাসতে কখন যেন তন্দ্রা এসে গিয়েছিল—তারপর ঘুম। এবং তারপর স্বপ্ন।

স্বপ্নে আমি একটি ছোট মেয়েকে দেখতে পেলাম। বাবলির মতন ফুটফুটে, ফরসা। পার্কের সবুজ ঘাসের ওপরে পাগলের মতো এলোমেলোভাবে ছুটোছুটি করছে। আর একটা বাচ্চা ছেলে ওকে তাড়া করে ছুঁতে চেষ্টা করছে।

পরদিন বেশ বেলায় ঘুম ভাঙল। বৃষ্টির গন্ধ পেলাম। একটু আগেই বৃষ্টি হয়ে গেছে! আকাশ এখনও মেঘলা।

টের পেলাম, জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে। মাথা তুলতেও বেশ কষ্ট হচ্ছে। আর তার সঙ্গে এমন একটা জিনিস টের পেলাম যে, ভয়ে আমার হাত-পা ঠান্ডা হয়ে গেল।

আমার তেষ্টা পাচ্ছে। সেই ভয়ংকর তেষ্টা। আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে যে-তেষ্টা না মেটাতে পারলে আমি...আমি শেষ হয়ে যাব।

খিদে পাচ্ছিল, কিন্তু রান্না করার মতো অবস্থা নেই। হয়তো জ্বলন্ত স্টোভের ওপরেই মাথা ঘুরে পড়ে যাব।

বিছানায় শুয়ে-শুয়ে আমি বোধহয় বিড়বিড় করে প্রলাপ বকছিলাম। কারণ, হঠাৎই শুনলাম : 'কী ব্যাপার, বন্ধু? বিড়বিড় করে কী যে বলছ কিছুই বুঝতে পারছি না।'

বাবলি।

ও যে কখন আসে, কখন যায়, কে জানে! ওকে বারণ করলে শোনে না। আর বারণ করতেও আমার কষ্ট হয়। আমার খুব কাছে এসে দাঁড়িয়েছে মেয়েটা। আজ সবুজ রঙের একটা ফ্রক পরেছে। তাতে ওকে গতকালের মতোই সুন্দর লাগছে।

আমাকে চোখ খুলতে দেখেই ও বকুনির সুরে বলল, 'সেই কখন থেকে ডাকছি—আর তুমি কোনও সাড়া না দিয়ে চোখ বুজে বিড়বিড় করে কীসব বলে যাচ্ছ...।'

আমি দেওয়ালের দিকে কিছুটা সরে গিয়ে ওকে বিছানায় বসার জায়গা করে দিলাম। জড়ানো গলায় কোনওরকমে বললাম, 'বোসো...।'

ও বসল। ওর গলার দিকে চোখ পড়ল আমার। চট করে নজর সরিয়ে নিলাম।

মেয়েটা হঠাৎই কোথা থেকে একটা থার্মোমিটার বের করল কে জানে! আমার দিকে সেটা এগিয়ে দিয়ে বলল, 'নাও—জ্বরটা মেপে দ্যাখো—।'

আমি থার্মোমিটারটা নিলাম। জিগ্যেস করলাম, 'এটা তুমি কোত্থেকে পেলে?'

'তাকে রাখা ছিল। ঠাকুরের আসনের পাশে। লুকিয়ে নিয়ে এসেছি...।'

আমি জ্বর মাপলাম। একশো তিন।

বাবলির দিকে কৃতজ্ঞতার চোখ তাকালাম। আমার সঙ্গে সবে গতকাল ওর আলাপ। অথচ আমার জন্যে এত ভেবেছে মেয়েটা।

আমার গা গুলোচ্ছিল। জিভে টক স্বাদ। তেষ্টা না মেটাতে পারলে এরকম হয়।

বাবলিকে থার্মোমিটারটা ফিরিয়ে দিলাম। ওর গলার দিকে আবার নজর গেল আমার। ফরসা। তার ওপরে হালকা গোলাপি আভা। আমাকে যেন হাতছানি দিচ্ছে।

'আমার বাঁ-হাতটা মুখে পুরে দিয়ে জোরালো এক কামড় বসালাম। যন্ত্রণার 'উঃ' শব্দ বেরিয়ে এল আমার মুখ থেকে.

বাবলি চমকে উঠে বলল 'কী করছ' কী করছ?'

বলা উচিত ছিল. 'নিজেকে শাস্তি দিচ্ছি, শাসন করছি।' কিন্তু তার বদলে বললাম. 'আমার মাথাটা যন্ত্রণায় যেন ছিঁড়ে পড়ছে.

কথাটা অবশ্য মিথ্যে নয়। মাথার ভেতরে সত্যি-সত্যি অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছিল।

'তুমি তা হলে রান্না করবে কী করে?'

সত্যি রান্না করার মতো অবস্থা আমার নেই। তা ছাড়া চালও তো ফুরিয়ে গেছে! অন্ধকার না হলে আমি দোকানে যাওয়ার ঝুঁকি নিতে পারব না।

তাই ওকে বললাম. 'চিন্তা কোরো না। একটু পরে জ্বর কমলে একটু নুড্‌ল্‌স সেদ্ধ করে খেয়ে নেব

'কেন, ভাত খাবে না কেন?'

'জ্বরের মধ্যে ভাত খাওয়া তো ভালো নয়!'

মেয়েটা বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল। তারপর আমার সুটকেস হাঁটকাতে লাগল : 'দেখি, কোথায় নুড্‌ল্‌স...।'

একটু পরেই ওর উচ্ছ্বাসের চিৎকার শোনা গেল : 'এই তো ম্যাগি। আমি তো ম্যাগি রান্না করতে পারি। খুব সোজা। দাঁড়াও, আমি তোমাকে ম্যাগি রান্না করে খাওয়াচ্ছি...।'

'না, না, বাবলি—থাক, থাক...!' আমি উঠে বসতে চেষ্টা করলাম।

কিন্তু কে শোনে কার কথা। ও ততক্ষণে ওর গৃহিণীপনা শুরু করে দিয়েছে। দেশলাই নিয়ে স্টোভ জ্বালল। হাঁড়িতে করে জল বসাল। ম্যাগির প্যাকেট ছিঁড়ে ভেতরের শক্ত নুড্‌লের চাকাটাকে চার টুকরো করল। তারপর জল গরম হওয়ার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল।

আমি কনুয়ে ভর দিয়ে মাথা উঁচু করে ওর কাণ্ডকারখানা দেখছিলাম। কিন্তু একটু পরেই মাথার ভার আর বইতে পারলাম না—শুয়ে পড়লাম। চোখ-মুখ কপাল—সব জ্বালা করছিল।

হঠাৎই শুনি, বাবলি আমাকে ডাকছে।

কোনওরকমে চোখ খুললাম। ও আমাকে উঠে বসতে বলছে—ম্যাগি খেতে হবে।

অতি কষ্টে উঠে বসলাম। বাবলিও আমাকে ধরে কিছু শক্তি জোগাল। তারপর চামচে করে আমাকে ম্যাগি খাওয়াতে লাগল।

আমি ওকে দেখতে লাগলাম, খেতে লাগলাম। আমার মনে পড়ছিল মায়ের কথা।

খাওয়া শেষ হলে আবার শুয়ে পড়লাম। একবার মনে হল, বাবলিকে সব কথা খুলে বলি। তারপর বলি, ও যেন আমার কাছে আর না আসে। কিন্তু সে-সাহস জুগিয়ে উঠতে পারলাম না। নিজের কাছে নিজে হেরে গেলাম।

ওর দিকে তাকিয়ে কথা বলতে গেলেও ওর গলার দিকে চোখ চলে যাচ্ছিল। আর অপরাধবোধের একটা গ্লানি বুকের ভেতরটা ভাসিয়ে দিচ্ছিল।

বাবলি উবু হয়ে বসে এটা-সেটা নাড়াচাড়া করছিল। হঠাৎই বলল, 'তোমার তো চাল নেই দেখছি! শুধু দু-চারটে দানা পড়ে আছে!'

হ্যাঁ—ফুরিয়ে গেছে। কিনতে হবে

'কে কিনবে? তুমি! এই জ্বর নিয়ে তুমি কোথায় যাবে! আমাকে টাকা দাও, আমি কিনে আনছি...।'

কথাটা ও মোটেই মিথ্যে বলেনি। খাওয়াদাওয়ার পর জ্বরটা যেন আরও বেশি করে এসেছে। তার ওপরে ওই অপচেষ্টা! পাগলের মতো একটা গলা

খুঁজছি আমি। সুন্দর নরম গলা। যে-গলা থেকে প্রাণশক্তি বয়ে আসবে আমার শরীরে।

ছাতি-ফাটা তেষ্টায় আমি মাথা এপাশ-ওপাশ করতে লাগলাম। আর বাবলি ভাবল জ্বরে আমার অসহ্য কষ্ট হচ্ছে।

বালিশের নীচ থেকে টাকা বের করে ওকে দিলাম। জড়ানো গলায় বললাম, 'চাল আজ আর লাগবে না—কাল হলেও চলবে...।'

টাকাটা নিয়ে বাবলি আমার ওপরে ঝুঁকে পড়ল। কপালে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। আর বারবার বলতে লাগল, 'উঃ, তোমার গা কী গরম! এখুনি ডাক্তার দেখানো দরকার...।'

আমার নাকে অদ্ভুত সব গন্ধ আসছিল। বৃষ্টিভেজা গাছপালার গন্ধ, ভেজা ইট আর রাবিশের গন্ধ, আর সবকিছু ছাপিয়ে বাবলির গন্ধ।

আমার কপালে ওর ঠান্ডা হাত আমাকে আরাম দিচ্ছিল। আর একইসঙ্গে তেষ্টার কুমিরটা আমাকে বারবার হিংস্র কামড় বসাচ্ছিল।

হঠাৎই 'বাবলি! বাবলি!' বলে কে যেন ডেকে উঠল।

একজন পুরুষের গলা।

আমি চমকে উঠলাম, ভয় পেলাম। লোকটা ডাকতে-ডাকতে ভেতরে ঢুকে আসবে না তো।

বাবলি চাপা গলায় বলল, 'বাবা!' তারপর থার্মোমিটারটা ছোঁ মেরে বিছানা থেকে তুলে নিয়ে ছুট লাগাল। যেতে-যেতেই মুখ ফিরিয়ে বলে গেল, 'কাল আসব, বন্ধু...'

আমি জ্বর আর তেষ্টায় ইটের বিছানায় উথালপাথাল হয়ে ছটফট করতে লাগলাম। আর মনে-মনে একান্তভাবে চাইছিলাম একজন অজানা-অচেনা লোক পথ ভুল করে পোড়ো বাড়িটায় ঢুকে পড়ুক। এক্ষুনি। এই মুহূর্তে।

কিন্তু কেউ এল না।

আমি টের পাচ্ছিলাম, আমার অ-মানুষিক প্রাণশক্তি অল্প-অল্প করে চুঁইয়ে-চুঁইয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। কাল...কাল বাবলির সঙ্গে আমার দেখা হবে তো?

মনে হল জ্বরটা আরও শক্ত হাতে আমাকে জড়িয়ে ধরেছে। ভয় হল, ইটের ওপরে পাতা চাদর আর কম্বল আমার শরীরের আঁচে পুড়ে না যায়!

ধীরে-ধীরে অন্ধকার নেমে এল। না, কেউ এল না। আর তো আসার কোনও প্রশ্ন নেই। কাল দিনের বেলা যদি আসে।

মানুষের মতো আমাদেরও ঘুম প্রায়োজন। কিন্তু একটুও ঘুম আসছিল না। বুঝতে পারছিলাম, আমার হাত-পাগুলো ধীরে-ধরে বেঁকে যাচ্ছে, শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে, মুখের ভেতরে জিভটা কম্বলের টুকরো হয়ে গেছে, আর তার সঙ্গে গা গুলোচ্ছে।

সেই অবস্থাতেই রাত কেটে গেল। আমি হাঁ করে বড়-বড় শ্বাস নিচ্ছিলাম। মনে হল, আমার এই জ্বর আর সারবে না। কারণ, আমি শেষের খুব কাছে এসে গেছি।

তা সত্ত্বেও আমি বাঁচতে চাইছিলাম। পোড়ো বাড়িটার ভেতরে হাঁটাচলা করতে লাগলাম। পা দুটো বেঁকে যাওয়ায় হাঁটতে বেশ অসুবিধে হচ্ছিল। একটা পা বাসের চাকায় থেঁতলে যাওয়া কুকুরের মতো পা টেনে-টেনে হাঁটছিলাম। বাড়ির পাঁচিলের আড়াল থেকে দেখছিলাম কোনও মানুষ অন্তত বাথরুম করার জন্যেও বাড়িটার ভেতরে ঢোকে কি না।

ওঃ! আর পারছি না! একজন মানুষ দরকার—একজন অচেনা মানুষ!

তেষ্টায় আমার জিভ পর্যন্ত ছটফট করছে। একবার বাইরে বেরোচ্ছে, একবার ভেতরে ঢুকছে—সাপের মতো। কিন্তু মানুষ কই? মানুষ?

বাড়ির ভেতরে কার্নিশের খাঁচে অনেক গোলাপায়রার বাসা। সাপ, ইঁদুর এসবও আমার চোখে পড়েছে।

কিন্তু ওগুলো কোনও কাজের নয়। আগে একবার এরকম বিপদে পড়েছিলাম। তেষ্টার সংকটে পড়ে কিছুতেই একটা মানুষ জোগাড় করতে পারছিলাম না। তখন মরিয়া হয়ে আমি একটা সাপ ধরে কামড় বসিয়েছিলাম। কিন্তু তারপরই আমার বমি এসে গিয়েছিল।

কিন্তু পায়রা? পায়রা তো আমি আগে কখনও পরীক্ষা করে দেখিনি!

আমি টিকটিকির ক্ষিপ্রতায় দেওয়াল বেয়ে উঠতে পারি। কিন্তু এখন সেসব শক্তি যেন কেউ শুষে নিয়েছে। তবুও কোনওরকমে উঠে গেলাম। পৌঁছে গেলাম কার্নিশের কাছে। আমার হাত একটা পায়রার দিকে ছোবল মারল।

তারপরই ওর বকবকম শেষ। পালক সরিয়ে আমার তেষ্টা-পাগল দাঁত কামড় বসাল ওর গলায়।

নাঃ! তেতো লাগছে। বিশ্রী স্বাদ। আমার বাঁচার 'অমৃত' ওর শরীরে নেই।

পায়রাটার দেহ ছুড়ে ফেলে দিলাম। দেওয়াল বেয়ে নীচে নেমে এলাম। রুমাল দিয়ে মুখ মুছে একটু জল খেয়ে নিলাম।

আর ঠিক তখনই মানুষের গন্ধ পেলাম—তার সঙ্গে শব্দও।

দেওয়ালের আড়াল থেকে দেখি একটা লোক বাড়ির এলাকায় ঢুকছে। পরনে পাজামা আর ডুরে শার্ট। কালো, চিমড়ে চেহারা।

সে যতই রোগাটে চেহারা হোক না কেন, তাতেই আমার কাজ চলে যাবে।

আমার জিভ লকলক করে উঠল। জ্বরে পুড়ে যাওয়া শরীর আরও তেতে উঠল। আমি আড়াল থেকে লোকটার ওপর নজর রাখতে লাগলাম। বাঘ যেমন হরিণের ওপরে নজর রাখে।

লোকটা একটা আগাছার ঝোপের দিকে তাক করে দাঁড়াল। তারপর পাজামার দড়ি খুলতে লাগল। বুঝলাম, 'ছোট বাইরে'-র কেস।

সুতরাং আমি আড়ালে-আড়ালে যতটা পারা যায় লোকটার কাছাকাছি চলে গেলাম। একটা বড় থামের আড়ালে দাঁড়িয়ে ওর 'কাজ' শেষ হওয়ার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলাম। কিন্তু আমার গা পুড়ছিল, মাথা টলছিল, বড়-বড় হাঁ করে বাতাস টানতে হচ্ছিল। চোখে মনে হল যেন যেন ঝাপসা দেখছি।

আকাশ মেঘলা। আধঘণ্টা আগেও টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছিল। এখন বৃষ্টি নেই, তবে চারপাশ ভেজা। গাছের পাতা বাতাসে অল্প-অল্প নড়ছে, কোথা থেকে যেন কাক আর শালিখের ডাক শুনতে পাচ্ছি।

লোকটার 'কাজ' শেষ। পাজামার দড়ি বাঁধছে। এইবার।

ও কী! দূরের ভেজা রাস্তা ধরে ছুটে ছুটে কে আসছে এ বাড়ির দিকে?

বাবলি।

ওর হাতে ঝোলানো একটা পলিব্যাগ।

আমি তাড়াতাড়ি বাড়ির ভেতরের দিকে হাঁটা দিলাম। পেছনদিকে তাকিয়ে দেখি লোকটা বাড়ির চৌহদ্দি ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছে!

আর কোনও আশা নেই। পলকে আমার গলা শুকিয়ে কাঠ। শরীরের ভেতরে শর্ট সার্কিট হয়ে গেল। হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলাম মেঝেতে।

বাড়িটার মেঝে ভাঙাচোরা, উঁচু-নীচু। বাটিক প্রিন্টের মতো ফাটল দিয়ে গাছগাছড়ার চারা বেরিয়ে এসেছে। কোনও কোনও জায়গায় কংক্রিট উধাও হয়ে মাটি বেরিয়ে পড়েছে। রাবিশের টুকরো নানা জায়গায় ছড়ানো।

উপুড় হয়ে পড়ে ছিলাম কিছুক্ষণ। তাই আগাছার গন্ধ, মাটির গন্ধ, রাবিশের গন্ধ নাকে এল।

আমার হাত-পা থরথর করে কাঁপছিল। কম্বলের জিভটা লাঠির বাড়ি

খাওয়া সাপের মতো ছটফট করছিল। কান দিয়ে যেন আগুনের হলকা বেরোচ্ছিল।

আমি শরীরের সমস্ত শক্তি জড়ো করে বুকে হেঁটে আমার ঘরের দিকে, বিছানার দিকে এগোলাম। বারবার মনে হতে লাগল, খুব জোর বেঁচে গেছি! আর-একটু হলেই চন্দ্রমালার কাছে আমার আসল চেহারা ফাঁস হয়ে যেত!

আমি যখন হামাগুড়ি দিয়ে আমার ঘরের ভেতরে ঢুকছি তখনই বাবলির চাপা গলায় ডাক শুনতে পেলাম।

আমি কোনওরকমে উঠে বসলাম।

ঝাপসা চোখে দেখলাম আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে বাবলি।

ও বলতে শুরু করেছিল, 'এই যে, বন্ধু—তোমার চাল নিয়ে এসেছি...।' কিন্তু আমার অবস্থা দেখেই ওর হাত থেকে পলিব্যাগটা খসে পড়ল। ও ছুটে চলে এল আমার পাশে, হাঁটুগেড়ে বসে পড়ল। চোখ বড়-বড় করে বলে উঠল, 'এ কী! কী হয়েছে তোমার!'

আমি হাঁপাচ্ছিলাম। বুঝতে পারছিলাম, আমার চেহারা নিশ্চয়ই খুব বীভৎস দেখাচ্ছে। তবু মেয়েটা আমার কাছে ছুটে এসেছে! আমাকে ভয় পায়নি!

'বন্ধু! বন্ধু!' কাঁদো-কাঁদো গলায় ডুকরে উঠল মেয়েটা। আমাকে দু-হাতে জড়িয়ে ধরল।

আমিও কাঁপা হাতে বন্ধুকে জাপটে ধরলাম। আমার ভেতরে একটা পর একটা বিস্ফোরণ ঘটে গেল।

বাবলি কত নরম, কোমল, নমনীয়, প্রাণশক্তিতে টইটম্বুর। এক কথায় বলতে গেলে আমার জীবন। অথচ ।

বাবলি আমার কপালে আর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে-দিতে বলল, 'সর্বনাশ! তোমার গা যে পুড়ে যাচ্ছে! তোমার জন্যে দুটো জ্বরের ট্যাবলেট কিনে এনেছি। এক্ষুনি একটা খেয়ে নাও, দেখবে জ্বর একদম সেরে যাবে। ওষুধের দোকান থেকে বলেছে...।'

ও তাড়াতাড়ি মেঝেতে পড়ে থাকা পলিব্যাগটার কাছে ছুটে গেল। ব্যস্ত হাতে ব্যাগের ভেতরটা হাতড়াতে লাগল।

আমার শরীরের ভেতরে আচমকা খিঁচুনি শুরু হল। আমি চিৎ হয়ে ছিটকে পড়লাম।

বাবলি ছুটে এল আমার কাছে। আমার মুখের ওপরে একেবারে ঝুঁকে পড়ল।

'বন্ধু! বন্ধু!' ও কান্না-কান্না গলায় ডেকে উঠল।

ঝাপসা চোখে দেখলাম, ও গোলাপি নরম গলা আমার ঠোঁটের কত কাছে! দাঁতের কত কাছে!

একটা নোংরা লোভের ঢেউ উথলে উঠল আমার ভেতরে। তাই মরিয়া হয়ে বাবলিকে এক ঝটকায় দূরে ঠেলে দিলাম। চটপট একটা ইটের টুকরো তুলে নিয়ে মুখের ভেতরে ঠেসে দিলাম। তারপর আরও কিছু রাবিশের টুকরো। প্রাণপণে সেগুলোয় কামড় বসালাম। একবার...দুবার...বারবার...। আমার দাঁতকে আমি আর অন্যায় করতে দেব না। ওরা ইট, সিমেন্ট, বালি চিবিয়ে ব্যস্ত থাকুক।

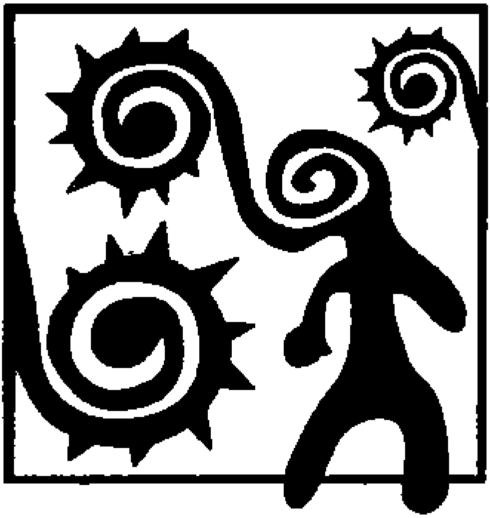
বাবলি মেঝেতে পড়ে গিয়েছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও ও 'বন্ধু, বন্ধু!' বলে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল।

ও আবার আমার কাছে এসে দাঁড়াল। আমার বেঁকে যাওয়া হাত তখন পাগলের মতো বাতাস আঁকড়ে ধরতে চাইছিল। আর মুখ দিয়ে চাপা গোঙানির শব্দ। আমি বিশাল হাঁ করে বাতাস টানতে চাইছিলাম। মনে হচ্ছিল, এই শেষবার।

ঠিক তখনই বাবলির এক ফোঁটা চোখের জল পড়ল আমার হাতের ওপরে। আমার সমস্ত কষ্ট নিমেষে জুড়িয়ে গেল।

আঃ! মুক্তি! মুক্তি!

মৃত্যুর আগের মুহূর্তে আমার কানে এল, কেউ যেন বাবলিকে নাম ধরে বারবার ডেকে চলেছে।



তুমি যখন থাকবে না

'তখন আমার জীবনটা কীরকম হবে, নম্রতা?'

নম্রতা কোনও উত্তর দিল না। দিল না, কারণ আমি ওর সঙ্গে মনে-মনে কথা বলছিলাম। ও এখন নেই। অফিসের কাজে বেঙ্গালুরু গেছে। তিনদিন পর ফিরবে।

সুতরাং ফ্ল্যাটে আমি একা। একা একা নম্রতার সঙ্গে কথা বলছি। আর ও থাকা না থাকার তফাতটা বুঝতে চাইছি।

আমি রান্না করতে জানি না। তা হলে রান্নার লোকের ওপরে ভরসা করতে হবে। আর কখনও-সখনও হোটেল-রেস্তোরাঁয় খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারটা সেরে নিতে হবে। অসুবিধে একটু হলেও সেটা আমাকে ম্যানেজ করে নিতে হবে।

জামাকাপড় কাচা বা ইস্তিরি করা নিয়ে তেমন কোনও প্রবলেম হবে না। এখন যেভাবে চলছে তখনও সেভাবেই চলবে। মোড়ের মাথার লন্ড্রি।

আর? আর কী অসুবিধে হবে আমার?

এটা ঠিকই যে, রোজকার জীবন একটু ফাঁকা লাগবে। আর আমার যৌবনও একটু ফাঁকা লাগবে। বিছানায় একা-একা শুতে হবে। পাশের স্পেসটা ফাঁকা থাকবে।

এ তো গেল অসুবিধের দিক। কিন্তু সুবিধের দিকগুলো?

সুবিধের 'দিকগুলো' নয়—একটামাত্র দিক। কিন্তু সেটাই অনেক। সেই সুবিধেটা না পেলে আমি তিলে-তিলে শেষ হয়ে যাব। এক কোটি ঘুণপোকা আমাকে ভেতর থেকে কাটছে। কুটকুট করে কাটছে। এক সেকেন্ডের জন্যেও থামছে না। ওদের থামানো যাচ্ছে না।

ওরা থামলেই আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচব। আবার ঠিকঠাকভাবে বুক ভরে শ্বাস নিতে পারব।

নাঃ, ঘুণপোকাগুলোকে যেভাবে হোক থামাতেই হবে।

এমন সময় মোবাইল ফোনটা বেজে উঠল। স্পেশাল রিং-টোন শুনে বুঝলাম অস্তিমানের ফোন। অস্তিমান সরকার। আমার আর নম্রতার খুব বন্ধু।

'হ্যালো—বল্...।'

'অ্যাই, তিমির, নম্রতা কবে ব্যাক করবে মনে আছে?'

'কেন তুই জানিস না?'

'জানতাম, কিন্তু মাথা থেকে বেরিয়ে গেছে। নখরা না করে বল না—।'

'নখরা আমি করছি, না তুই?' কথাটা মনে-মনে বলার পরেই কয়েকটা কাঁচা খিস্তি পরপর উঁকি দিয়ে গেল। চার অক্ষর আর দু-অক্ষরের সব বাছা-বাছা শব্দ। কারণ, অস্তিমান সব জানে—তবুও এই ন্যাকাচৈতন্যচরিতামৃত।

আজ বুধবার। নম্রতা শুক্রবার ফিরবে। সেটাই অস্তিমানকে বললাম।

'ও ফ্রাইডে রাতে ফিরবে।' একটু থেমে জিগ্যেস করলাম, 'কেন?'

'আরে অফিসে আমার একটা প্রোমো হয়েছে। তাই নম্রতা ফিরলে তোর ফ্ল্যাটে গিয়ে তিনজন মিলে একটু হইচই করব, সেলিব্রেট করব। আমি ট্রিট দেব—ও.কে.?'

আমি হাসলাম। বললাম, 'কনগ্র্যাচুলেশান্স! তোর প্রোমোগুলো রেকারিং ফ্র্যাকশনের মতো চলতেই থাকুক...তা হলে আমাদের হইচইগুলোও স্মুদ্‌লি চলতে থাকবে...।'

আমার কথাগুলোয় হাসির ছোঁওয়া লাগানোর চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু কেন জানি না সেগুলো চোপসানো ঠান্ডা লুচির মতো নেতিয়ে গেল।

'তিমির, তা হলে শনিবার সন্ধেবেলা তোর ফ্ল্যাটে যাচ্ছি। খাবার-দাবারের ব্যবস্থা নিয়ে পরে তোর আর নম্রতার সঙ্গে ডিসকাস করে নেব। তারপর "আই. কিউ."-তে ফোন করে ফাইনাল মেনু জানিয়ে দেব। ওরা ঝটাক্‌সে হোম ডেলিভারি করে দেবে—।'

আমি শব্দ করে হাসলাম, সত্যি, সেলিব্রেশানের অ্যারেঞ্জমেন্ট করতে অস্তিমান সরকারের জবাব নেই! আর এইসব সেলিব্রেশানের ছুতোয় অস্তিমান আমাদের দুজনের সংসারে গায়ে পড়ে ভিড়ে যায়। আমি জানি, আসলে ও নম্রতার কাছাকাছি থাকতে ভালোবাসে। আদুরে পোষা বেড়াল যেমন তার মালকিনের গা ঘেঁষে থাকতে চায়, সেইরকম।

ওকে অস্তিমান বলব, না মস্তিমান বলব সেটা ভেবে-ভেবে আমি কনফিউজড্ হয়ে যাই।

'ঠিক আছে—স্যাটারডে ইভনিং...' ফোনে বললাম। আমার গলাটা একটু হোঁচট খেয়ে গেল বোধহয়।

অস্তিমান বলল, 'কীরে? তুই কনফিউজড্ নাকি? তোর গলাটা কেমন কেরোসিন লাগছে!'

'না, না—ঠিক আছে ।' ফোন কেটে দিয়ে ভাবতে শুরু করলাম। অস্তিমান টের পেল কী করে, আমি কনফিউজড্?

আসলে আমার নামের মধ্যেই কনফিউশান আর কনট্রাডিকশান। তিমিরকিরণ। তিমিরের আবার কিরণ হয় নাকি? শালা সোনার পাথরবাটি, না কাঁঠালের আমসত্ত্ব?

কে যে নামটা রেখেছিল—মা, না বাবা—জানি না। আমার কনফিউজড় জীবনটার জন্যে কি এই বেমক্কা নামটাই দায়ী?

যাকগে, আবার নম্রতার কথা ভাবা যাক।

ওর সঙ্গে বিয়ে হয়েছে ছ'বছর। তার আগে আমরা একসঙ্গে চাকরি করেছি আড়াই বছর মতো—একটা সফ্টওয়্যার কোম্পানিতে। কোম্পানিটা তেমন বড় কিছু ছিল না, কিন্তু তার ডিরেক্টররা কথায়-কথায় নিজেদের গালভরা 'এম.এন.সি.' বলে জাহির করত, বড়-বড় ডায়ালগ মারত।

নম্রতা টেকনিক্যালি অনেক শার্প, আর কী করে চটপট রাইজ করতে হয় জানে। আমার টিমে কাজ করতে-করতে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই ও 'জি.এল'—মানে, গ্রুপ লিডার হয়ে গেল।

কাজের মধ্যে মেলামেশায় ওর সঙ্গে আমার 'তুই-তুই' রিলেশান হয়ে গিয়েছিল। তারপর কী এক কারিগরিতে সেটা 'রিলেশান'-এ দাঁড়িয়ে গেল। আমাদের কথাবার্তা কখনও 'তুই-তুই', কখনও 'তুমি-তুমি' স্টাইলে টার্ন নিল।

একসময় খুব সাদামাঠাভাবে আমাদের বিয়েটা হয়ে গেল। তখন অস্তিমান পিকচারে ছিল না।

বিয়ের পরপরই আমার 'ঝুটো' এম.এন.সি. কোম্পানি ছেড়ে সত্যিকারের একটা হাই-ফাই এম.এন.সি.-তে জয়েন করল নম্রতা। সেটাও অবশ্যই সফট্‌ওয়্যার কোম্পানি এবং সেটাকে এক ডাকে সব্বাই চেনে। তা ছাড়া স্যালারিও দারুণ হাই-ফাই।

ক'টা দিন আমি বেশ ডিপ্রেশানে ভুগলাম। রাতের অন্ধকারে আমাকে আদর করতে-করতে অনেক পুলটিস দিল নম্রতা। ডিপ্রেশান কাটাতে অনেক চেষ্টা করল।

'তিমির, প্লিজ—ব্যাপারটা তুমি সিরিয়াসলি বোঝার চেষ্টা করো। প্রথম কথা, হাজব্যান্ড-ওয়াইফ একই কোম্পানিতে জব করাটা ঠিক না—ওতে অনেক প্রবলেম হয়। আয়, আমার কাছে আয়।...দেখি, তোর মুখটা এখানে...আ-আঃ।'

আর-একদিন রাতে ঃ 'শোন, আমাদের মধ্যে কার স্যালারি বেশি, কার কম—এটা কোনও ম্যাটার না। যেটা ম্যাটার করে সেটা হল, আমাদের দুজনের টোটাল স্যালারি। ও.কে.? এবারে একটু নরম্যাল হ—প্লিজ। দেখি, তোর হাতটা দেখি...।'

কিন্তু ডিপ্রেশান কি সহজে কাটে!

এর কয়েকমাস পরেই অস্তিমান পিকচারে ঢুকে পড়ল। ও 'হাই-টেক সলিউশনস' নামে একটা সফট্‌ওয়্যার কোম্পানিতে চাকরি করত। কোন একটা মিটিং-এ যেন নম্রতার সঙ্গে আলাপ। তারপর বেশ কয়েকবার নাকি ওদের প্রফেশন্যাল ফিল্ডে দেখা হয়। একদিন অস্তিমান নম্রতাকে বলে যে, ও নিজে একটা সফট্‌ওয়্যার কোম্পানি খোলার কথা ভাবছে। তাই স্যুটেবল্ পার্টনার খুঁজছে।

নম্রতা যে খুব আত্মবিশ্বাস মেয়ে সেটা ওর সঙ্গে ঘণ্টাখানেক কথা বললেই যে-কেউ বুঝতে পারবে। সুতরাং অস্তিমানের সাধের কথা জানতে পারামাত্রই নম্রতা হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। এখন ওরা দুজন যার-যার চাকরি করলেও স্বাধীন ব্যবসার তোড়জোড় শুরু করে দিয়েছে।

এসব কথার বেশিরভাগই আমার নম্রতার মুখে শোনা। বাকি যেটুকু ছিল সেই শূন্যস্থানটা পূরণ করেছে অস্তিমান।

সুতরাং এইভাবে আমরা দুজন থেকে তিনজন হয়েছি।

আর গত কয়েক মাস ধরে আমি সেই 'তিনজন' থেকে 'দুজন' হওয়ার কথা ভাবছি। ঘুণপোকা। ঘুণপোকা। ঘুণপোকাগুলোকে খতম করতে হবে।

কেমন করে তার প্রিপারেশানের কাজ শুরু করা যেতে পারে, সেটা নিয়ে

আমি অনেক ভেবেছি। তারপর নিয়েছি প্রথম পদক্ষেপ। একটা বেশ বড় মাপের আধুনিক স্যুটকেস কিনেছি। দারুণ ফ্যান্সি—তবে শক্তপোক্ত বিদেশি জিনিস।

আমার দ্বিতীয় পদক্ষেপ হল, ওই স্যুটকেস আর একটা কালো ব্যাকপ্যাক নিয়ে ঘন-ঘন ট্যুরে যাওয়া। তার মধ্যে কতকগুলো অফিসের জেনুইন ট্যুর, আর বাকিগুলো ফল্‌স ট্যুর। অফিসের নামে করে দু-তিন দিনের জন্যে স্রেফ কোথাও একটা কাটিয়ে আসা।

এই সময়গুলো আমি একা-একাই কাটাই। ছোটখাটো একটা দু-নম্বরি কি তিন নম্বরি হোটেলে উঠি। হোটেলের ড্যাম্প ধরা ঘরে বসে-বসে বই পড়ি। কখনও অফিসের কাজে বেরোচ্ছি এমন ভান করে চার-ছ' ঘণ্টা এদিক-ওদিক কাটাই। লোকাল বাস টার্মিনাস কিংবা রেল স্টেশনে বসে থাকি। কখনও ব্যাকপ্যাক থেকে ল্যাপটপ বের করে সত্যি সত্যি অফিসের কাজ করি। তারপর আবার হোটেলের ঘরে ফিরে আসি। শেষ পর্যন্ত—দু-দিন কি তিন দিন পর—আবার নিজের ফ্ল্যাটে ফিরে আসি।

স্পষ্ট বুঝতে পারি, আমি ট্যুরে যাওয়ার কথা বললেই নম্রতার মুখ বেশ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। আমিও ভেতরে-ভেতরে উজ্জ্বল হয়ে উঠি। কারণ, আমার প্ল্যান হাঁটি-হাঁটি পা-পা করে এগোচ্ছে। এগোচ্ছে।

যাতে আমাকে সবসময় ট্যুরে পাঠানো হয় তার জন্যে অফিসে তদ্বির শুরু করলাম। ওপরওয়ালারা অবাক হলেও খুশি হল। যুবক্লো তিমিরকিরণ বেশ ডায়ানামিক হয়ে উঠেছে।

প্রথমবার ট্যুরে রওনা হওয়ার সময় বড় স্যুটকেসটা নিয়ে যখন আমি লিফটে করে নীচে নামি তখন লিফটম্যান হরিপ্রসাদ বেশ অবাক হয়েছিল। বলেছিল, সাব বহোত দিনোঁ কে লিয়ে বাহার যা রহে হ্যায় কেয়া?'

আমি হেসে বলেছিলাম, 'না, না—তিনদিনের জন্যে যাচ্ছি। স্যুটকেসে কাপড়া-উপরার সঙ্গে অফিসের কাগজপত্র আর গুচ্ছের কম্পিউটার প্রিন্ট-আউট আছে। কী করব, অফিসের কাজ! তুলে দেখুন না, কী ওয়েট!'

হরিপ্রসাদ রাজি হচ্ছিল না, কিন্তু আমিও নাছোড়বান্দা! কারণ, হরিপ্রসাদকে দিয়ে স্যুটকেসের ওজন আঁচ করানোটা আমার মাস্টারপ্ল্যানের একটা এসেন্‌শিয়াল পার্ট।

'সচমুচ সাব। বহুত ভারী হ্যায়...।'

তারপর থেকে মাসে দু-তিনবার ওই বড় মাপের স্যুটকেস নিয়ে আমার ট্যুরে যাওয়াটা আমাদের ফ্ল্যাটবাড়ির সবার কাছে একটা স্বাভাবিক মামুলি দৃশ্য

হয়ে দাঁড়াল।

আমি বেশ বুঝতে পারলাম, আমি ট্যুরে গেলেই অন্তিমান আমার ফ্ল্যাটে ট্যুর করতে আসে। নম্রতাকে ল্যাপটপের মতো কোলে নিয়ে যত খুশি বোতাম টেপে। টিপতে-টিপতে কম্পিউটার হ্যাং হয়ে যায়...হ্যাং করে যায়...।

শালা মন্তিমান সরকার!

সব বুঝতে পারলেও আমি বাইরে গণ্ডমূর্খ ল্যাবাকান্ত সেজে থাকি। এটাও আমার প্ল্যানের একটা এসেন্‌শিয়াল পার্ট।

আমি অসহ্য অবস্থায় দিন কাটাতে থাকি। কিন্তু বাইরে কিছু বুঝতে দিই না। দিঘির জলের মতো শান্ত থাকি। যেন আমি একটা মাটির তৈরি ভেড়া—অথবা ভেড়ুয়া।

কিন্তু কী করব! এইরকম শান্তশিষ্ট ল্যাজবিশিষ্ট সেজে থাকাটাও আমার প্ল্যানের একটা স্ট্রং কম্পোনেন্ট।

নম্রতার নতুন একটা ট্যুরের পালা আসতেই আমি ওর গায়ে পড়ে আদর-আহ্লাদের কাণ্ডকারখানা শুরু করলাম। ও একটু অবাক হয়ে গেল।

'কী ব্যাপার রে? আজকে হঠাৎ হাই-ফাই আদর!'

'কী জানি!' ওর গায়ে গাল ঘষতে-ঘষতে বললাম, 'বোধহয় কোনও ইমপাল্‌স এসেছে। মনে হচ্ছে, এই মুহূর্তে তুই-ই সব। আসলে তুই যদি পুরুষ হতি তবে বুঝতি...।'

সে যাই হোক, অনেক ভালোবাসাবাসির পর নম্রতাকে বললাম, 'শোন, একটা ইন্টারেস্টিং গেম খেলবি?'

'কী গেম?'

'চেনা যখন অচেনা।'

'এ আবার কী নাম? কখনও তো শুনিনি!'

'শুনবি কী করে? নামটা একেবারে নতুন—আমার দেওয়া...।'

তারপর নম্রতাকে গেমটার সাতকাহন খুলে বললাম।

নম্রতা বরাবরই বেশ অ্যাভভেঞ্চারাস। দেখতে তেমন একটা কিছু না হলেও পারসোনালিটি দিয়ে সেই খামতিটা ও পুষিয়ে নিয়েছে। তা ছাড়া ওকে ওপর-ওপর দেখে ওর কামনা-বাসনার রিখ্‌টার স্কেল আইডিয়া করা যাবে না। আমি জানি, সেটা কম করেও আট কি নয় হবে।

ওকে বললাম, 'শোন, এই গেমটার মেইন ব্যাপার হল, তুই যখন এবার ট্যুর সেরে বাড়ি ফিরবি তখন একেবারে নতুন সাজে ফিরবি। যেন একজন

অচেনা সেক্সি ইয়াং লেডি। প্রথম দেখায় আমি যেন একদম চিনতে না পারি।' একটু থেমে ওর চিবুকের তলায় সুড়সুড়ি দিলাম। তারপর ঃ 'তা ছাড়া তুই ফিরবি বেশ রাতে। সেরকম হিসেব করেই ফ্লাইট ধরবি। তা হলে একবার ভাব তো! ব্যাপারটা কী ফ্যানট্যাসটিক থ্রিলিং হবে। রাত এগারোটা-বারোটায় আমার কাছে অভিসারে আসছে একজন অচেনা সে—।'

মনে-মনে বললাম, 'তাকে আমাদের ফ্ল্যাটবাড়ির কেউ দেখে ফেললেও চট করে নম্রতা বলে চিনতে পারবে না।'

'থাক, থাক—আর বলতে হবে না। বুঝে গেছি। নতুন টাইপের একটা অ্যাডভেঞ্চার, তাই তো?'

'হ্যাঁ, তাই। তা ছাড়া তোর পর আসবে আমার পালা। দেখবি, এক রাতে তোর সঙ্গে লুকিয়ে দেখা করতে আসবে একজন অচেনা টগবগে ইয়াংম্যান...ওঃ! শালা দারুণ হবে!'

নম্রতা খুব যে একটা আপত্তি করল তেমন নয়। তবে বাতাসে হাতের ঝাপটা মেরে বলল, 'সত্যি, তোমার মাথাতে আইডিয়াও আসে! যাকগে, পরে কখনও এ-গেম খেলা যাবে। "চেনা যখন অচেনা"! অস্তিমান আইডিয়াটা শুনলে হেভি অবাক হবে—।'

আবার অস্তিমান! পিত্তি জ্বলে গেল আমার। কিন্তু মুখের এক্সপ্রেশান শান্ত দিঘির জল। দিঘির জল।

মনে-মনে একটু হতাশ হয়েছিলাম। তবে হাল ছাড়িনি। আইডিয়াটা নিয়ে প্রায়ই ওকে খোঁচাতে লাগলাম।

চার-চারটে মাস আমি আইডিয়াল হাজব্যান্ড হয়ে নম্রতাকে অবাক করে দিলাম। সবসময় ওর কথায় সায় দিতে লাগলাম। কোনও কথা কাটাকাটি নেই, কোনও ঝগড়াঝাঁটি নেই। শুধু শান্তি হি শান্তি।

আমি তখন আমার প্ল্যান নিয়ে এতই মশগুল যে, অস্তিমান হারামজাদাটাকেও মোলায়েমভাবে মেনে নিলাম। একইসঙ্গে চলতে লাগল অপেক্ষার খেলা।

নম্রতা টেলিফোনে কী একটা কায়দায় বেশ ফিসফিস করে কথা বলতে পারে। এমনভাবে ও কথা বলবে যে, ওর কোলে বসে থাকলেও আপনি ওর কথা শুনতে পাবেন না। ল্যান্ডলাইনের হ্যান্ডসেটের রিসিভারটা ও এমনভাবে মুখের কাছে চেপে ধরে যে, মনে হয় ও রিসিভারটাকে চুমু খেয়ে আদর করছে।

ল্যান্ডলাইনে মাঝে-মাঝেই ওর ফোন আসে, কার ফোন তা জানি না। তবে

কখনো-কখনো আন্দাজ করতে পারি। কারণ, সফ্‌ট্‌ওয়্যারের বিজনেস নিয়ে চাপা গলায় নম্রতা কথা বলে।

ফোনে কথা বলা শেষ হলে ও রিসিভার নামিয়ে রেখে গুনগুন গান করতে-করতে পাশের ঘরে চলে যায়। আমাকে কখনও কিছু বলার কথা ভাবেও না—কার ফোন, কীসের ফোন। আমি যেন একটা টেবিল, কিংবা চেয়ার—অথবা পাশবালিশ।

নম্রতা বোধহয় আমাকে একটু-আধটু সন্দেহ করে যে, আমি ওর মোবাইল ফোন ঘাঁটাঘাঁটি করি। সেইজন্যেই বোধহয় রাতের দিকে ও মোবাইল ফোন অফ করে রাখে। তখন ল্যান্ডলাইনে ওর ফোন আসে। অনেক রাতেও।

বিছানার পাশেই বেডসাইড টেবিলের ওপরে টেলিফোন। ফোন বাজলেই ও বাজপাখির মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে রিসিভার আঁকড়ে ধরে। তারপর চলতে থাকে ফিসফিস ফোন।

আমি রাগে বালিশটাকে নখের ঘায়ে ছিঁড়ে কুটিকুটি করে ফেলি। তুলোর ছোট-বড় টুকরো ছিটকে ওঠে শূন্যে। মনে হয় যেন ঘরের ভেতরে বরফ পড়ছে। আমার গায়ে মাথায় সব জায়গায় তুলো আর তুলো। নম্রতার মুখটা যেন তুলোয় ঢাকা পড়ে গেছে।

কিন্তু সবটাই তো আমার কল্পনা! ওই ফোনের ব্যাপারটা ছাড়া। তাই বালিশটা ঠিকঠাক থাকে। শুধু আমি দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে কাঠ হয়ে শুয়ে থাকি। প্রাণপণে কল্পনা করতে থাকি, আমি একটা জলে ভিজে সিঁটিয়ে যাওয়া পাশবালিশ। আর ঘুণপোকাগুলো আমাকে কাটতে থাকে।

'চেনা যখন অচেনা' খেলার প্রথম নাটক শুরু করে দিলাম আমি। একটা ট্যুর থেকে রাত করেই ফিরলাম।

শীতের শুরু। কুয়াশাও ছিল। তার ওপরে আমার হালকা ছদ্মবেশের প্রলেপ। গলায় রঙিন মাফলার। চোখে নতুন কেনা জিরো পাওয়ারের ফ্যান্সি চশমা। মাথার চুল অন্য স্টাইলে আঁচড়ানো।

সোজা আমার তিনতলার ফ্ল্যাটে উঠে গেলাম। সিঁড়ি বেয়ে। কারণ, লিফ্‌ট দশটায় বন্ধ হয়ে যায়। হরিপ্রসাদ তার আস্তানায় নিশ্চয়ই এখন কম্বলের ওমের তলায়।

ফ্ল্যাটের আর কারও সঙ্গে আমার দেখা হল না।

নিজের দরজায় তিনবার টোকা দিলাম।

নম্রতাকে আগেই জানিয়েছিলাম, আমি কখন ফিরব। তাই দরজা খুলে ওর

অবাক হওয়ার কথা নয়। কিন্তু হল। কারণ, আমার ছদ্মবেশটা ও হিসেবের মধ্যে ধরেনি। ওটা ওর জন্যে সারপ্রাইজ।

ও কিছু একটা বলার জন্যে হাঁ করেছিল, কিন্তু কোনও শব্দ-টব্দ বেরোল না। কারণ, আমি ফ্ল্যাটে ঢুকে পা দিয়ে ঠেলে দরজা বন্ধ করে দিয়েছি এবং হাত দিয়ে ওর মুখ চাপা দিয়েছি।

তারপর ওর গালে টপ করে চুমু খেয়ে বলেছি, 'চেনা যখন অচেনা—।'

বাঁ-হাতের স্যুটকেসটা মেঝেতে নামিয়ে দিয়েছিলাম আগেই। এবার ব্যাকপ্যাকটা খোলার সঙ্গে-সঙ্গে ওকে আদর করা শুরু করলাম। একইসঙ্গে বিড়বিড় করে বলতে শুরু করলাম, 'তুমি যে আমার সেটা কি তুমি জানো? আই লাভ ইউ, নম্রতা। ত-এ তিমির, ন-এ নম্রতা! কী দারুণ, না?'

'থ-এ থামো!' বিরক্ত হয়ে আমাকে ঠেলে দিল ও ঃ 'এসব কী ছেলেমানুষি করছ!'

আমি হেসে ওকে জড়িয়ে ধরলাম ঃ 'ছেলেমানুষ হওয়ারই চেষ্টা করছি। চেনা যখন অচেনা। ব্যাপারটা কীরকম সুপার-রোম্যান্টিক বলো তো? এসো, আজ দুজনে মন্দ হলে মন্দ কী?'

নম্রতা বিরক্ত হচ্ছিল, কিন্তু আমি হাল ছাড়লাম না। ওকে নরম করার জন্যে হাজার রকম তোয়াজ আর আদর করে চললাম। যে করে হোক, 'চেনা যখন অচেনা' খেলাটা ওকে দিয়ে একদিন খেলাতেই হবে! হার মানলে চলবে না।

ওর বিরক্তি আর অনিচ্ছার নকড়া-ছকড়া দেখে মাঝে-মাঝে আমার মাথার পারদ চড়ে যাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল, আজই, এখুনি, ঘুণপোকাগুলোর কাম তামাম করে দিই। কিন্তু না—প্ল্যানের বাইরে কিছুতেই আমি যাব না। নম্রতাকে নরম করে রাখাটাই আমার ব্রত। নিজেকে আমার ভেজিটারিয়ান ব্রতচারী বলে মনে হচ্ছিল। কিন্তু শালা উপায় কী!

দিন-রাতের পালা চলতে লাগল। দিন গড়িয়ে রাত, আবার রাত গড়িয়ে দিন। সেইসঙ্গে অভিমানের পার্টি থ্রো করার নকশাবাজিও চলতে লাগল। আজ প্রোমো তো কাল জন্মদিন। কখনও বা আবার অফিস থেকে 'রিওয়ার্ড' পাওয়ার খুশি। তবে ওর সব ছকের একটাই নীতি ঃ নম্রতার কাছাকাছি থাকা।

আমি বেশিরভাগ সময় ফার্নিচারের মতো দিন কাটাই। আর নম্রতাকে খোশামোদ করে-করে বোধহয় অপেক্ষার শেষ সীমায় পৌঁছে গেছি। মোটিভ তো আমার সবসময়েই মুখিয়ে আছে। শুধু চাই অপারচুনিটি। একটা—মাত্র একটা সুযোগ। তা হলেই...!

এসব কথা ভাবতে-ভাবতে তিন সপ্তা পর একদিন সুযোগ এল। নম্রতা নতুন একটা অফিস ট্যুরে বেরোনোর সময় আমার গালে হাত বুলিয়ে পেক করে বলল, 'লাস্ট ক'দিন ধরে ভাবছিলাম। তোমার ওই "চেনা যখন অচেনা" গেমটার লাভ অ্যাঙ্গেলটা খারাপ না। পাঞ্চ আছে। অল্পস্বল্প কিকও আছে...।'

'তা হলে এবারে হয়ে যাক না—।'

'দেখি। যদি মুড আসে তো...।'

ও বেরিয়ে যাওয়ার পর আমি মনে-মনে এতটাই এগিয়ে গেলাম যে, ঠিক করলাম নম্রতা গেমটা খেলুক বা না খেলুক আমি আবার গেমটা খেলব। আগে অনেক-অনেকবার গেমটা খেলতে গিয়েও আমি লাস্ট মোমেন্টে ব্যাক আউট করেছি। কিন্তু এবারে আর না। বারবার যদি আমি এরকম পিছিয়ে আসি তা হলে ঘুণপোকাগুলো ভাববে আমি কাপুরুষ। শেষ পর্যন্ত ওরাই হয়তো আমাকে একদিন শেষ করে দেবে।

সুতরাং নম্রতার যেদিন ট্যুর থেকে ফেরার কথা সেদিন আমি ওর জন্যে শেষবারের মতো অপেক্ষা করতে লাগলাম। আমার মাথা, শরীর, সব ঠান্ডা পাথরের মতো।

রাত দশটা নাগাদ ও এল।

না, ও 'অচেনা' সেজে আসেনি, তবে একটু বেশিই যেন মেকাপ করেছে। কালো চুড়িদারের ওপরে হালকা শীতের একটা নীল রঙের পশমিনা জড়িয়েছে। এটা মনে হয় নতুন—আগে আমি দেখিনি।

ও ফ্ল্যাটে ঢুকে পড়ার পর হঠাৎ করেই আমার বুক দুরদুর শুরু হল। এত মাস ধরে কী কনফিডেন্ট্‌লি আমি প্ল্যানটা নিয়ে নাড়াচাড়া করেছি। কিন্তু আজ এক্সিকিউশান পয়েন্টে এসে এ কী দ্বিধা, দ্বন্দ্ব, দোলাচল!

আমি ওকে জড়িয়ে ধরে আদর করতে লাগলাম। 'স্ত্রীকে ক'দিনের অদেখায় বিরহী হাজব্যান্ডের' রোলটা প্লে করতে লাগলাম।

নম্রতা একবার অস্পষ্টভাবে বলল, 'তোমাকে এত কাঠ-কাঠ লাগছে কেন?'

আমি বললাম, 'কই, না তো!' কিন্তু ভেতরে-ভেতরে একটু দমে গেলাম।

ও আমার মতলব টের পেয়ে যাচ্ছে না তো?

আমি নম্রতাকে লক্ষ করতে লাগলাম আর আসল মুহূর্তটা খুঁজে নিতে চাইলাম। কীভাবে আমি পা ফেলব? আর আমার অস্ত্রই বা কী হবে?

হঠাৎই শুনি নম্রতা গুনগুন করে গান গাইছে। অস্তিমানের মোবাইলের কলার টিউন ঃ 'বালম পিচকারি, যো তুনে মুঝে মারি...।'

যেটুকু দ্বিধা-দ্বন্দ্বের গুঁড়ো আমার মনে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল, একটা খ্যাপা হাওয়া সেগুলো এক ঝাপটায় উড়িয়ে দিল।

একচিলতে ডিনার সেরে নিয়ে মোবাইল ফোন থেকে কাকে যেন ফোন করল ও।

'ফিরেছি—।'

তারপর কয়েক সেকেন্ড ওপাশের কথা শুনল।

'মোবাইলে বেশি চার্জ নেই। একটু পরে ল্যান্ডলাইন থেকে করছি। বাই—।'

আমি তখন রিগর মরটিসের সমস্যা নিয়ে ভাবছি। আর ভাবছি, শেষ পর্যন্ত আমি কি পারব? না, থাক এখন না—কাল সকালে।

সারাটা রাত আমি ঘুমোতে পারলাম না, কিন্তু নম্রতা ঘুমোল। আমি ঘুণপোকাদের সঙ্গে রাত জাগতে লাগলাম। ঘুণপোকাগুলো আমাকে 'দুয়ো' দিতে লাগল। বলতে লাগল, 'আমরা জানতাম, তুমি পারবে না!'

ভোরবেলা ফোন বেজে উঠল। হালকা আবছা আলোয় দেখলাম, নম্রতা টেলিফোনের দিকে পাশ ফিরে রিসিভার তুলে কানে চেপে ধরেছে। জড়ানো গলায় কিছু বলছে।

এরকম ভোরবেলায় ফোন আগেও অনেকবার এসেছে। বোধহয় কোনও 'শুয়োরের বাচ্চা' ওকে মাঝে-মাঝেই ভোরবেলা উইশ করে।

না, আর কেউ কখনও নম্রতাকে উইশ করতে পারবে না।

আমি বিছানায় পালটি খেয়ে নম্রতাকে জাপটে ধরলাম।

ও চমকে উঠল। কোনও কথা না বলে আমাকে হাতের ঝটকায় ঠেলে দিল। কথা বলল না, কারণ, ফোনে শোনা যাবে।

আমি চট করে ওকে ডিঙিয়ে হাত বাড়িতে দিলাম। ক্র্যাড্‌লের বোতাম টিপে ফোন কেটে দিলাম।

'হোয়াট ননসেন্স।' বলে বিরক্তিতে আমার দিকে ঘুরতে গেল নম্রতা, কিন্তু পারল না। আর কোনও শব্দও বেরোল না ওর মুখ থেকে।

কারণ, আমি শক্ত হতে ওকে জাপটে ধরেছি এবং রিসিভারের কালো কর্ডটা দু-পাক জড়িয়ে দিয়েছি ওর গলায়।

কে বলে আমি পারব না!

কর্ডের দুটো প্রান্ত দু-হাতের শক্ত মুঠোয় ধরে আমি পেছনে হেলে পড়েছি। ডান পা ভাঁজ করে হাঁটুটা চেপে ধরেছি ওর পিঠের ঠিক মাঝখানে। নম্রতার মাথাটা পেছনে ঝুঁকে পড়েছে। দু-হাতে তারটাকে আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করছে। পা দুটো এলোমেলো ছুড়ছে। বিছানার চারদরটা লন্ডভন্ড হয়ে ওর গায়ে পায়ে জড়িয়ে গেল। তারপর...একটু পরেই...সব শেষ।

টের পেলাম, মাথার ভেতরে ঘুণপোকাগুলো আর কাটছে না। বরং মনে হল, ওরা যেন আমাকে বলছে, ঠান্ডা মাথায় এখন আমাকে কী-কী করতে হবে।

আমি ওদের কথা মতো কাজ করতে লাগলাম।

টেলিফোনের কার্ডটা নম্রতার গলা থেকে ছাড়িয়ে নিলাম। রিসিভারটা ক্র্যাড্‌লের ওপরে বসিয়ে দিলাম। তখনই খেয়াল করলাম, ওটার গায়ে রক্ত লেগে আছে। একটা বড় টিপের মতো ফোঁটা।

কোথা থেকে রক্ত এল?

ওই তো, নম্রতার ঠোঁটের ডান কোণ থেকে অল্প একটু রক্ত গড়িয়ে পড়ছে।

ছুটে গিয়ে একটা ড্রয়ার খুলে খানিকটা তুলো নিয়ে এলাম। নম্রতার ঠোঁটের রক্ত ভালো করে ঘষে-ঘষে মুছলাম। তারপর টেলিফোন রিসিভারের রক্তের দাগ তুললাম। রক্তমাখা তুলোটা বাথরুমে গিয়ে কমোডের ভেতরে ফেলে ফ্লাশ করে দিলাম।

নম্রতার দেহটা বিছানায় কাত হয়ে ছিল। একটা পা মেঝেতে, একটা হাত বিছানার পাশে ঝুলছে।

বডিটাকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিলাম। বিছানা থেকে বেশ কিছুটা দূরে মেঝেতে নামিয়ে রাখলাম।

আমার বড় স্যুটকেসটা নিয়ে এসে নম্রতার বডিটা তার ভেতরে ঢোকালাম। রিগর মর্টিস শুরু হতে এখনও দেরি আছে। তবুও বডিটা ঢোকানোর জন্যে ওর হাঁটু ভাঁজ করে ঠেসেঠুসে বেশ কসরতই করতে হল। ওর চোখদুটো বেশ বড় দেখাচ্ছে। গোল-গোল চোখে ফাঁকা দৃষ্টি। কী দেখছে কে জানে!

নম্রতার একজোড়া চটি নিয়ে এলাম—যে চটিজোড়া পরে ও কাল রাতে ট্যুর থেকে ফিরেছে। তারপর ওর ব্রিফকেসটা নিয়ে এলাম। এটা নিয়ে ও

সবসময় ট্যুরে যায়—গতকাল ট্যুর থেকে এই ব্রিফকেসটা নিয়েই ও ফিরেছে।

নম্রতার ব্রিফকেস আর চটিজোড়া আমার বড় স্যুটকেসটায় ঢুকিয়ে নিলাম। এগুলো সঙ্গে করেই ও আবার 'ট্যুরে' যাক।

সবকিছু গোছগাছ করতে আরও চল্লিশ মিনিট সময় লাগল। তারপর আমিও তৈরি হয়ে ঠান্ডা মাথায় কাল্পনিক ট্যুরে বেরিয়ে পড়লাম।

হরিপ্রসাদ লিফ্‌টেই ছিল। আমাকে দেখে সামান্য হাসল, বলল, 'ফিরসে ট্যুর, সাব?'

আমি ঠোঁট উলটে মুখ বেঁকালাম ঃ 'কী করব! অফিস...।'

পুরো বাহাত্তর ঘণ্টা পর আমি 'ট্যুর' থেকে ফিরে এলাম।

ট্রেন ধরে চলে গিয়েছিলাম অনেক দূরে। পথে নাম-না জানা এক বিশাল নদী পেয়েছি। সন্ধের পর স্যুটকেস নিয়ে সেই নদীর ওপরের ফ্লাইওভারে উঠেছি। শীতকালের সন্ধে। ব্রিজের ওপরে লোকজন নেই। রেলিং-এর কাছে এসে স্যুটকেসের ডালা খুলে কাত করে ধরেছি। নম্রতা, ওর চটিজোড়া, আর ব্রিফকেস—সব একসঙ্গে 'ঝাঁপিয়ে' পড়ল নদীতে। একইসঙ্গে আমার স্যুটকেস আর মন হালকা হয়ে গেল।

মাথার ভেতর থেকে ঘুণপোকাগুলো কোরাসে বলে উঠল, 'সাবাস!'

অনেক নীচ থেকে ছোট্ট 'ঝপাং' শব্দ কানে ভেসে এল। নম্রতারা কোথায় তলিয়ে গেল কে জানে! পুলিশ কখনও ওদের খুঁজে পাবে বলে মনে হয় না।

এরই নাম কি তা হলে 'পারফেক্ট মার্ডার'?

আজেবাজে কাগজ আর জামাকাপড় কিনে আমার স্যুটকেসটা ঠেসে ভরতি করলাম। তারপর ফিরে এলাম ফ্ল্যাটে। পুলিশ যদি নম্রতার খোঁজে আমার কাছে আসে তা হলে আমার স্ট্রেটকাট উত্তর হবে, 'নম্রতা এখনও অফিসের ট্যুর থেকে ফেরেনি।'

কিন্তু অস্তিমান? অস্তিমান যদি এর মধ্যে নাক গলায়? যদি বলে যে, নম্রতা ট্যুর থেকে ফিরে এসেছিল! ওর সঙ্গে নম্রতার ফোনে কথাও হয়েছে।

যদি ও বলে বলুক। আমি বলব, নম্রতা যদি ফিরেও থাকে তাহলে আমার ফ্ল্যাটে ফেরেনি। হয়তো অন্য কারও ফ্ল্যাটে ফিরেছে। আর সে-ই হয়তো নিজের দোষ ঢাকার জন্যে এখন ন্যাকা সাজছে। তা ছাড়া অস্তিমানও পুলিশি ঝামেলার হাত থেকে নিজের চামড়া বাঁচাতে চাইবে।

নাঃ, আমার কাছ পর্যন্ত পুলিশ পৌঁছতে এখনও অনেক দেরি।

নম্রতাহীন ফাঁকা ফ্ল্যাটে জীবন কাটানোয় যে এত সুখ, এত আনন্দ, সেটা আগে বুঝতে পারিনি।

একটা গোটা দিন এইরকম সুখ-আনন্দে ডুবে থাকার পর হঠাৎই আমার মনে হল, কোথায় যেন একটা খটকা লাগছে। এমন একটা ফিলিং হতে লাগল যে, কেউ যেন ফ্ল্যাটে ঘুরে বেড়াচ্ছে। হালকা পায়ের খসখস শব্দ। শ্বাসপ্রশ্বাসের শব্দ। পারফিউমের আবছা গন্ধ।

নাঃ, সব আমার মনের ভুল।

রাতের অন্ধকারে শুয়ে-শুয়ে যখন নতুন জীবনের তোলমোল করছি ঠিক তখনই নিশ্বাসের শব্দ পেলাম। খুব কাছেই কে যেন নিশ্বাস ছাড়ল। সেই শব্দের ধরনে কেমন এক ক্লান্তির ছোঁওয়া।

আবার মনের ভুল।

মনের ভুল হলেও ব্যাপারগুলো চলতেই লাগল। মনে হতে লাগল, ফ্ল্যাটে আমি আর একা নই।

একদিন খুব ভোরে ঘুমটা ভেঙে গেল। চোখ ডলতে-ডলতে বিছানায় উঠে বসলাম। তারপর এপাশ-ওপাশ তাকালাম। সবকিছুই ঠিকঠাক রয়েছে। কিন্তু শোওয়ার ঘরের দরজাটা খোলা কেন? যদ্দূর মনে পড়ছে, আমি তো রাতে ওটা বন্ধ করেই শুয়েছিলাম।

তখনই দেখতে পেলাম, দরজার পাশে দেওয়াল ঘেঁষে রাখা একটা ব্রিফকেস।

নম্রতার ব্রিফকেস। সেটা থেকে জল গড়িয়ে পড়ছে।

কোথা থেকে এল এটা?

তাড়াহুড়ো করে বিছানা থেকে নেমে এলাম। ঘরের দরজাটা বন্ধ করে ব্রিফকেসটার কাছে এগিয়ে গেলাম। ঝুঁকে পড়ে ভালো করে দেখলাম। না, আমার ভুল হয়নি। ওটা নম্রতারই ব্রিফকেস।

কিন্তু এটা ফিরে এল কেমন করে?

এমন সময় ল্যান্ডলাইন টেলিফোনটা বেজে উঠল। চমকে উঠে ওটার দিকে তাকালাম। এত ভোরে কে ফোন করবে?

টেলিফোনের অনেকটা কাছে যাওয়ার পর ব্যাপারটা আমার নজরে পড়ল। ওটার কালো রঙের গা চকচক করছে। আর তার ওপরে চকচক করছে পাঁচ-

ছ'টা লাল রঙের টিপ। রক্ত। না, দেখতে আমার ভুল হয়নি।

কিন্তু কোথা থেকে এল?

টেলিফোনের ক্রি-রি-রি-রি-রিং শব্দটা আমাকে নিশির ডাকের মতো টানতে লাগল।

আচ্ছন্নের মতো ওটার কাছে এগিয়ে গেলাম। রিসিভারটা ধরতেই শিউরে উঠলাম। নরম। পিছল। আমার মুঠোয় যেন জ্যান্ত হয়ে নড়ছে।

রিসিভারটা কানের কাছাকাছি নিয়ে আসতেই ঠান্ডা নিশ্বাস টের পেলাম। তারপর কেউ যেন ফিসফিস করে বলে উঠল, 'তিমির, চেনা...যখন...অচেনা। আমাকে দেখলে তুই...এখন আর...চিনতেই পারবি...না। জলে থাকতে আমার...আমার ভীষণ কষ্ট হচ্ছে। তুই চলে আয়...আয়...আয়...।'

আমি কোনওরকমে বললাম, 'কে? কে?' আমার গলা কেঁপে গেল।

রিসিভারে ফিসফিসে হাসির শব্দ শোনা গেল। তারপর : 'চেনা যখন অচেনা। তুই আমার কাছে চলে আয়। এখানে...একা-একা আমার...ভালো লাগছে না। আয়...চলে আয়...।'

টেলিফোনের কর্ডটা হঠাৎ নড়ে উঠল। যেন জীবন্ত একটা সাপ। শরীর বাঁকিয়ে কর্ডটা আমার গলা ছুঁতে চাইছে।

ঠিক তখনই পেছন থেকে একটা শব্দ পেলাম।

শোওয়ার ঘরের দরজাটা বোধহয় আবার খুলে গেছে।





পাঁচ মিনিট পর

খাবার ঘর থেকে মা চেঁচিয়ে খেতে ডাকছিল। সানি ওর ঘরে বিছানায় আধশোয়া হয়ে বইয়ের পাতায় চোখ এঁটে মশগুল ছিল। মায়ের ডাক শুনে ও চেঁচিয়ে জবাব দিল, 'মা, পাঁচ মিনিট পর যাচ্ছি—প্লিজ...।'

এই একটা ওর বাজে স্বভাব। কোনও কিছু করতে বললেই, পাঁচ মিনিট পর। এ নিয়ে মা-বাবা দুজনেই ওকে কম বকাবকি করে না।

'কী হল, সানি, এলি?' একটু পরেই আবার মায়ের ডাক।

ঘড়ির দিকে তাকাল সানি। রাত দশটা দশ। ওর পাঁচ মিনিটের কোটা শেষ হয়ে গেছে। নাঃ, এবার উঠতেই হচ্ছে।

শব্দ করে গল্পের বই বন্ধ করল। তার আগে বাদামি একটা কার্ড দিয়ে পেজ মার্ক করে রাখল। ওঃ, দারুণ বই। চূড়ামণি ভাস্করের লেখা 'রক্তাক্ত নিঝুম রাত'। কিছুতেই ছাড়তে ইচ্ছে করে না এমন বই।

সানি ড্রয়িং-ডাইনিং-এ পৌঁছে দেখল, বাপির খাওয়া প্রায় শেষ। সানিকে দেখে বাপি আড়চোখে ইশারা করে ওর মায়ের দিকে দেখাল। যার অর্থ হল, 'এবার ঠ্যালা সামলাও, বৎস—।'

মা ততক্ষণে শুরু করে দিয়েছে।

'পাঁচ মিনিট পর, পাঁচ মিনিট পর' বলাটা সানির নাকি একটা রোগ হয়ে

দাঁড়িয়েছে। কোনও কাজই কি ওর সময় মতো করতে ইচ্ছে করে না? জীবনে বড় হতে গেলে পাংচুয়ালিটি একটা বড় ফ্যাক্টর। সমস্ত মনীষীর জীবনী পড়লেই দেখা যাবে...ইত্যাদি-ইত্যাদি।

সানি মায়ের কথার কোনও প্রতিবাদ না করে মাথা নীচু করে মুখ বুজে খেতে লাগল। বারবারই ওর মনে হতে লাগল, পাঁচটা মিনিট কী এমন বিরাট ব্যাপার! মাত্র পাঁচটা তো মিনিট! এই ক'টা মিনিট দেরি হলে পৃথিবীর কী এমন মহাক্ষতি হচ্ছে? মায়ের যত্তসব ম্যানিয়া!

খাওয়ার পর বেসিনে মুখ-টুখ ধুয়ে ও আবার ছুটল 'রক্তাক্ত নিঝুম রাত'-এর দিকে।

আর ঠিক তখনই দুর্ঘটনাটা ঘটল।

শোওয়ার ঘরে ঢোকার সময় হঠাৎই কী করে যেন ওর মাথাটা টাল খেয়ে গেল। সেটা সামাল দিতে গিয়ে দরজার ফ্রেমে মাথাটা বেশ জোরে ঠুকে গেল।

মাথা ঝিমঝিম করে উঠল। চোখের সামনে হলুদ ফুলের ফোয়ারা লাফিয়ে লাফিয়ে উঠল। চারিদিক অন্ধকার হয়ে সানি টলে পড়ে গেল মেঝেতে।

মিনিটখানেক পর জ্ঞান ফিরে দেখল, ও মেঝেতে কাত হয়ে পড়ে আছে। তবে পিঠের খানিকটা আর মাথা দরজার পাল্লায় ঠেস দেওয়া।

চারপাশে তাকিয়ে দেখল, মা কিংবা বাপি আশপাশে নেই। না, ওরা বোধহয় কোনও শব্দ-টব্দ শুনতে পায়নি।

সানি উঠে দাঁড়াল। মাথার পাশটায় বেশ ব্যথা। কপালটা দপদপ করছে। ও বিছানার দিকে পায়ে পায়ে হেঁটে গেল বটে, কিন্তু 'রক্তাক্ত নিঝুম রাত'-এ আর তেমন করে মন বসাতে পারল না।

খুব তাড়াতাড়ি ওর ঘুম পেয়ে গেল।

সকালে ঘুম থেকে উঠেই জানলার দিকে চোখ গেল সানির। আকাশে ছাইরঙা মেঘের ভেলভেট। তার সঙ্গে মিহি বৃষ্টির ঝালর। এরকম আবহাওয়া থাকলে আলসেমি আর ছুটির মুড চেপে ধরে। স্কুলে আর যেতে ইচ্ছে করে না। তা ছাড়া মাথায় বেশ ব্যথা। কিন্তু আজ স্কুলে যেতেই হবে। ফিজিক্যাল সায়েন্স আর ম্যাথ্স-এর ইউনিট টেস্টের খাতা দেবে। নম্বর কী হবে কে জানে! তবে সানির পরীক্ষা তো ভালোই হয়েছিল।

বিছানা থেকে উঠে ও বারান্দায় এল। বারান্দায় টবে লাগানো কয়েকটা

ফুলগাছ। মায়ের খুব ফুলগাছের শখ। সানিরও।

বারান্দায় দাঁড়িয়ে চোখ ঘষে ও ঘুম তাড়াচ্ছিল। তাড়াতাড়ি রেডি হতে হবে। নইলে স্কুলে লেট হয়ে যাবে।

হঠাৎই ওর মনে হল, বারান্দার ডানদিকের রেলিঙের কোনায় একটা কাক এসে বসবে। না, এক্ষুনি নয়—পাঁচ মিনিট পর।

আচ্ছা, এরকম কেন মনে হল ওর? আগে তো কখনও এমনটা মনে হয়নি! আসলে, সবসময় 'পাঁচ মিনিট পর' বলাটা ওর একটা মুদ্রাদোষ। তক্ষুনি-তক্ষুনি কোনও কাজ করতে ইচ্ছে করে না। সেইজন্যই কি হঠাৎ এমন মনে হচ্ছে?

সানি ঘড়ি দেখেনি, তবে পাঁচ মিনিট বোধহয় হয়ে গিয়েছিল। কারণ, আচমকা একটা বৃষ্টি-ভেজা কাক কোত্থেকে যেন উড়ে এসে ঠিক বসে পড়ল বারান্দার ডানদিকের কোনায়। সানিকে দেখে কাকটা মোটেই ভয় পেল না।

ওর কল্পনার ছবিটা মিলে যাওয়ায় সানি একটু হকচকিয়ে গেল, কিন্তু তার পাশাপাশি খুশিও হল।

কাকটাকে কয়েক সেকেন্ড লক্ষ করার পর সানি ঘরে চলে এল। তখনই বন্ধ দরজায় মায়ের ধাক্কা, আর তার সঙ্গে 'তাড়াতাড়ি ওঠ। আর কত দেরি করবি? এই নিয়ে তিনবার ডেকে গেলাম। ওঠ, ওঠ!'

'উঠে পড়েছি, মা, যাচ্ছি—।'

সানির দিন শুরু হয়ে গেল। টুথব্রাশে পেস্ট লাগিয়ে ও বাথরুমের দিকে রওনা হল।

স্কুল থাকলে সানি বড়জোর আধঘণ্টা কি চল্লিশ মিনিট পড়াশোনার সময় পায়। আজ ও কুড়ি মিনিট স্কুলের বই নিয়ে বসল, আর বাকি কুড়ি মিনিট কাল রাতের সেই চূড়ামণি ভাস্করের বইটা।

ন'টার সময় বাপি যখন অফিসে বেরোল, তখন তাড়াহুড়ো করে স্নান করতে ছুটল। ওকে ঠিক সাড়ে ন'টায় রাস্তায় পা দিতে হবে। তারপর বাড়ির কাছে থেকেই অটো। অটো থেকে নেমে পাঁচ মিনিট হাঁটা। তা হলেই ঠিক দশটায় ও স্কুলে পৌঁছে যাবে।

অটো থেকে নেমে ও যখন হাঁটতে শুরু করেছে তখনই ওর হঠাৎ মনে হল, পল্লব স্কুলের গেটে দাঁড়িয়ে ওর জন্য অপেক্ষা করছে।

পল্লব ওর ক্লাসমেট, খুব বন্ধু। ওরা পাশাপাশি ডেস্কে বসে। তা ছাড়া পল্লবও সানির মতো গল্পের বইয়ের পোকা।

পথের শেষ বাঁকটা ঘুরেই স্কুলের দরজাটা দেখতে পেল সানি। আর যা

মনে হয়েছিল ঠিক তাই ঃ স্কুলের গেটের একপাশে পল্লব দাঁড়িয়ে রয়েছে—সানির জন্য অপেক্ষা করছে। গাল ফুলো চেহারা, চোখে চশমা।

সানি অবাক হয়ে গেল। ব্যাপারটা এরকম মিলে গেল কী করে? কারণ, পল্লব কখনোই ওর জন্য স্কুলের গেটে দাঁড়িয়ে থাকে না।

পল্লবের কাছাকাছি পৌঁছতেই ও সানির দিকে এগিয়ে এল।

'অ্যাই, সানি—কেলো হয়ে গেছে। মা খাতা কেনার জন্যে পঞ্চাশ টাকা দিয়েছিল—সেটা পাচ্ছি না।'

'কেন? কোথায় ছিল?'

'এই তো, এই পকেটে—' স্কুল ইউনিফর্মের ডান পকেটে হাত ঢোকাল পল্লব ঃ 'অটো থেকে নেমে ভাড়া দেওয়ার সময়েও দেখেছি পঞ্চাশ টাকার নোটটা পকেটে ছিল...এখন দেখছি নেই।'

'মনে হয় কোথাও পড়ে গেছে—।' সানি বলল।

'চল, দুজনে মিলে আর একবার খুঁজে দেখি। আমি একবার দেখেছি—পাইনি।' মনমরা গলায় বলল পল্লব, 'নোটটা না পেলে বাড়িতে উদোম ঝাড় খেতে হবে।'

সানি হাতঘড়ির দিকে তাকাল। স্কুল বসতে আর মিনিট পাঁচেক আছে। ছেলেরা সব দলে-দলে গেট দিয়ে ঢুকছে।

'চল, তা হলে জলদি চল—' পল্লবকে হাত ধরে টান মারল সানি ঃ 'রাস্তার সাইডগুলো একবার চট করে চেক করে নিই।'

ওরা ব্যস্ত পায়ে হাঁটা দিল। গোয়েন্দার নজরে রাস্তার ধার আর ফুটপাথে তল্লাশি চালাতে লাগল।

হঠাৎই সানির চোখের সামনে পঞ্চাশ টাকার নোটটা ভেসে উঠল। বৃষ্টিভেজা মাটির ওপরে ভাঁজ করা নোটটা পড়ে আছে। কিন্তু জায়গাটা ও ঠিক চিনে উঠতে পারল না।

ও পল্লবকে বলল, 'টাকাটা তুই পেয়ে যাবি মনে হচ্ছে...।'

পল্লব অবাক হয়ে ওর দিকে তাকাল ঃ 'কী করে বুঝলি?'

ফুটপাথের দিকে তাকিয়ে টাকার খোঁজ করতে-করতেই সানি আনমনাভাবে জবাব দিল, 'না, এমনিই...হঠাৎ মনে হল...।'

অটোর রুট পর্যন্ত হাঁটা পথটা চেক করে ওরা দুজনে আবার স্কুলের দিকে ফিরল। স্কুলের সময় হয়ে যাচ্ছে বলে ওরা চলার স্পিড বাড়িয়ে দিল।

স্কুলের কাছাকাছি ফুটপাথের ওপরে কয়েকটা মাটির ঢিবি রয়েছে। তার

পাশেই দুটো বড়-বড় গাছ। টাকার খোঁজে সানি আর পল্লব দুজনেই এদিক-ওদিক চোখা নজর চালাচ্ছিল। হঠাৎই একটা দমকা বাতাসের ঝাপটা ছুটে এল। সঙ্গে-সঙ্গে সানি দেখল, দু-চারটে গাছের পাতা আর ছেঁড়া কাগজের সঙ্গে একটা পঞ্চাশ টাকার নোট ঢিবিগুলোর পিছন থেকে উঠে এল। নোটটা উড়ে এসে দুটো গাছের গুঁড়ির মাঝে পড়ে রইল।

'ওই তো, পেয়েছি!' বলে সানি প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ে নোটটা তুলে নিল।

নোটটা ফিরে পেয়ে পল্লব হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। ওর মুখে একগাল হাসি। কিন্তু ও ভুরু কুঁচকে অদ্ভুত চোখে সানির দিকে তাকিয়ে রইল।

সানি ঘড়ি দেখল। স্কুল বসতে আর একমিনিট।

'চল, চল। দেরি হয়ে যাবে।' বলে ও স্কুলের দিকে বলতে গেলে ছুট লাগাল।

পল্লবও ফিরে পাওয়া নোটটা পকেটে ঢোকাতে-ঢোকাতে সানির পিছন-পিছন ছুটল।

ছুটতে-ছুটতে সানি ভাবছিল, পঞ্চাশ টাকার নোটটা যে খুঁজে পাওয়া যাবে সেটা পাঁচমিনিট আগে ও জানতে পারল কেমন করে?

সকালবেলা কাকটা যখন বারান্দায় এসে বসেছিল তখনও ঠিক এইরকম ব্যাপার হয়েছিল।

তা হলে কি কিছু-কিছু ঘটনা ও পাঁচ মিনিট আগেই জানতে পারছে? ব্যাপারটা বেশ মজার তো!

মজা যে এখনও অনেক বাকি সেটা সানি বুঝতে পারেনি। সেটা টের পাওয়া গেল অমিত স্যারের ক্লাসে।

অমিত স্যার ফিজিক্যাল সায়েন্স পড়ান। ইয়াং, রোগা, স্মার্ট চেহারা। চোখে চশমা। ছাইরঙা শার্ট প্যান্টের ভেতরে গোঁজা। কোমরে বেল্ট।

স্যারের হাতে ক্লাস টেস্টের খাতা। সানির বুকের ভেতরটা একটু গুড়গুড় করে উঠল। এইট্টি পারসেন্ট নম্বর উঠবে তো! মানে কুড়ির মধ্যে ষোলো!

ওর ডানপাশে পল্লব, আর বাঁ-দিকে শ্রবণ বসে। অমিত স্যারের হাতের বান্ডিলটার দিকে তাকিয়ে শ্রবণ সানির হাত চেপে ধরল : 'কী হবে রে? নম্বর ভালো না উঠলে স্যার তো ক্লাসের মাঝে সবার সামনে চাটবে—।'

ঠিক তখনই সানি 'অলৌকিকভাবে' দেখতে পেল ইউনিট টেস্টে শ্রবণ ফেল করেছে। কুড়ির মধ্যে সাড়ে তিন পেয়েছে। খাতার প্রথম পৃষ্ঠায় ওপরের দিকে ভগ্নাংশ লেখার স্টাইলে লাল কালিতে সাড়ে তিন বাই কুড়ি লেখা। তারপর সেটা ঘিরে একটা গোল দাগ।

শ্রবণ তখনও সানির হাত চেপে ধরে নম্বর নিয়ে ওর আশা আর আশঙ্কার কথা বলছে। আর পাশ থেকে পল্লব বিড়বিড় করে বলছে, 'আমার পরীক্ষাও খুব একটা ভালো হয়নি।'

কিন্তু পল্লবের নম্বরটা সানি দেখতে পাচ্ছিল না।

সানি কী করবে ভেবে পেল না। শ্রবণের নম্বর জেনে যাওয়ার যন্ত্রণা ওকে বুকের ভেতরে পিন ফোটাতে লাগল। চাপটা যেন ও আর নিতে পারছিল না।

শেষ পর্যন্ত ও শ্রবণকে বলল, 'শোন, নার্ভাস হয়ে কোনও লাভ নেই। পরীক্ষা একবার তো খারাপ হতেই পারে। পরের বার ভালো করে প্রিপেয়ার করে টেস্টে বসবি। এবার কম নম্বর পেলে কী হবে, পরের বার নিশ্চয়ই তুই আমার চেয়েও বেশি পাবি। ইউনিট টেস্টে এক-দুবার ফেল করাটা তেমন সিরিয়াস ব্যাপার নয়। তুই আগে থেকে মন শক্ত কর...।'

'কেন, আমি কি ফেল করেছি?' শ্রবণ ফ্যালফেলে মুখে সানির দিকে তাকিয়ে কথাটা বলল।

'না, না—ঠিক তা নয়। মানে...।'

মানেটা আর বোঝাতে হল না। কয়েক মিনিট আগেই অমিত্র স্যার নাম ডেকে-ডেকে ইউনিট টেস্টের খাতা দেওয়া শুরু করে দিয়েছিলেন। এবার শ্রবণের নাম ধরে ডাকলেন।

শ্রবণ উঠে দাঁড়াতেই স্যার বললেন, 'তুমি তো ফেল করে গেছ, বাবামণি আমার। এত সোজা কোশ্চেনে কী করে ফেল করলে হে?'

শ্রবণ মাথা নীচু করে স্যারের কাছে গেল। খাতাটা নিয়ে ফিরে এল নিজের জায়গায়।

ওর খাতার দিকে তাকিয়ে সানি বুঝল, পাঁচ মিনিট আগে ও একটুও ভুল দেখেনি।

সানি এই অদ্ভুত ব্যাপারটার কথা কাউকে বলেনি। মা-কে না, বাপিকে না, এমনকী কোনও বন্ধুকেও না। বরং ও নিজে-নিজেই ব্যাপারটা তলিয়ে দেখার চেষ্টা করছিল।

কেন এমনটা হচ্ছে। কিছু কিছু ঘটনার কথা ও কেমন করে পাঁচ মিনিট আগে জানতে পারছে? সেটা কি সেদিন রাতে দরজার ফ্রেমে গুঁতো খাওয়ার

জন্য? নাকি সব কাজের বেলায় 'পাঁচ মিনিট পর' বলার মুদ্রাদোষের জন্য? আচ্ছা, এটা কি কোনও অলৌকিক ক্ষমতা? নাকি সমস্ত ঘটনাই নিছক কাকতালীয়?

অনেক ভেবেও সানি কোনও কূল পেল না। নানান উলটো-পালটা চিন্তা মাথায় ঘুরপাক খাওয়ার জন্য ওর পড়াশোনায় ঠিকঠাক মন বসছিল না। আর ওর সবচেয়ে যেটা প্রিয় কাজ—গল্পের বই পড়া—সেই কাজেও গোলমাল হয়ে যাচ্ছিল।

একদিন রাতে ও বাপির সঙ্গে এসব নিয়ে কথাবার্তা শুরু করে দিল। ওদের স্কুলের একজন স্যারের নাম করে বলল, 'স্যার বলছিলেন, অনেক সাধুসন্তের নাকি ভবিষ্যদ্বাণী করার ক্ষমতা আছে...।'

বাপি টিভিতে একটা স্পোর্টস চ্যানেল চালিয়ে খেলা দেখছিল। ওর কথায় মুখ ফিরিয়ে তাকাল। হেসে বলল, 'দুর, ওসব বাজে কথা। ভবিষ্যতে কী হবে কেউ কখনও বলতে পারে!'

ভবিষ্যতে দেখতে পাওয়া যায় কি যায় না সে নিয়ে ওর কম্পিউটারে বসে ইতিমধ্যেই অনেকটা সময় কাটিয়েছে সানি। তাতে ও নস্ট্রাদামুর ভবিষ্যদ্বাণীর কথা জেনেছে। জেনেছে এক্সট্রাসেন্সারি পারসেপশান আর ক্লেয়ারভয়ান্সের কথাও। যদি ব্যাপারগুলো গাঁজাখুরিই হবে তা হলে ইন্টারনেটে ওসব নিয়ে পাতার পর পাতা লেখাই বা রয়েছে কেন?

'আচ্ছা বাপি, স্যার বলছিলেন, কোনও-কোনও মানুষের মধ্যে নাকি এরকম অলোকদৃষ্টির ক্ষমতা থাকে। কোনও ঘটনা ঘটার আগেই ওরা দেখতে পায়। মানে, পুরোপুরি দেখতে না পেলেও আবছাভাবে আভাস পায়। অনেকদিন আগে পিটার হারকোস নামে এরকম একজন ছিলেন। ভদ্রলোকে রাজমিস্ত্রির কাজ করতেন। বাঁশের ভারা থেকে পড়ে গিয়ে ওর বেশ বড় ধরনের একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়। তারপর থেকেই ওঁর মধ্যে একটা সুপারন্যাচারাল পাওয়ার তৈরি হয়েছিল...।'

ইন্টারনেটে পড়া জিনিসগুলো সানি স্যারের নাম দিয়ে চালাচ্ছিল। কিন্তু বাপি হাত নেড়ে ওর কথাগুলো স্রেফ উড়িয়ে দিল।

'কে তোর মাথাটা খাচ্ছে বল তো? পড়াশোনা ছেড়ে এসব উলটোপালটা জিনিস নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছিস। ভবিষ্যতে দেখতে পাওয়া-টাওয়ার সব ব্যাপারগুলো সায়েন্স ফিকশান গল্পে হয়—বাস্তবে এর কোনও জায়গা নেই। যাকগে, ভুলেও যেন এসব গালগল্প তোর মা-কে শোনাস না। তোকে একেবারে খেয়ে ফেলবে...।'

বাপি সানির সঙ্গে অনেকটা বন্ধুর মতো ব্যবহার করে। তাই সানি ভেবেছিল, ব্যাপারটা বাপির সঙ্গে আলোচনা করলে রহস্যের কিছুটা সুরাহা হতে পারে। কিন্তু সেটা না হওয়াতে ও বেশ দমে গেল।

সানি ব্যাপারটা নিয়ে চিন্তা করছিল ঠিকই, কিন্তু একইসঙ্গে ও বেশ মজাও পাচ্ছিল, তার সঙ্গে অল্পস্বল্প মিশে ছিলে বাড়তি ক্ষমতার অহংকার। ওর এই 'অলৌকিক' ক্ষমতার কথা সবাইকে ওর চেঁচিয়ে বলতে ইচ্ছে করছিল। কিন্তু কী এক আশঙ্কায় ও কাউকে ব্যাপারটা জানাতে পারছিল না। ও ভেতরে-ভেতরে কেমন যেন দিশেহারা হয়ে পড়ছিল।

কয়েকদিন ঠিকঠাক চলার পরেই এক রবিবার ছোট্ট দুটো ঘটনা ঘটল!

সকাল সাড়ে আটটা নাগাদ সানি খবরের কাগজের পাতায় চোখ বোলাচ্ছিল। হঠাৎই ওর চোখে পড়ল ঘরের মেঝেতে একটু জল পড়ে আছে। মা জাগে জল ভরে ডাইনিং টেবিলে রাখতে যাচ্ছিল, তখনই কিছুটা জল চলকে পড়েছে মেঝেতে।

সেদিকে তাকিয়ে সানি হঠাৎই দেখতে পেল, মা তাড়াতাড়ি হাঁটা-চলা করতে গিয়ে সেই জলের ওপরে পা দিয়ে পিছলে পড়ে গেল মেঝেতে।

সানি আর দেরি করল না। চেঁচিয়ে মা-কে বলল, 'মা, মেঝেতে জল পড়েছে। শিগগির মুছে নাও—নইলে তুমি পড়ে যাবে।'

মা ড্রয়িং-ডাইনিং থেকে চেঁচিয়ে বলল, 'হ্যাঁ। এক্ষুনি মুছে দিচ্ছি—।'

তারপর নানান কাজে মা বোধহয় ব্যাপারটা ভুলে গিয়েছিল। সানিও আর খেয়াল রাখতে পারেনি। ফলে মোটামুটি পাঁচ মিনিট পর যা হওয়ার তাই হল। ওই জলে পা পিছলে মা উলটে পড়ল।

পড়ে যাওয়ার শব্দে সানি ছুটে এল মায়ের কাছে। বাপিও খবরের কাগজ ফেলে ছুটে এসেছে।

মা 'উঃ—আঃ' করছিল। ককিয়ে উঠে বলছিল, কোমরে চোট পেয়েছে। ভাগ্যিস মাথায় চোট লাগেনি।

বাপি আর সানি মা-কে ধরে-ধরে নিয়ে গিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিল। সানি একবার আলতো করে বলল, 'তোমাকে তখনই জলটা মুছে নিতে বললাম! দেখলে তো, কী হল!'

সানি মনে-মনে অন্য কথা ভাবছিল। আবারও ও ভবিষ্যতে পাঁচ মিনিট এগিয়ে দেখতে পেয়েছে। বুঝতে পেরেছে, পাঁচ মিনিট পর কী হবে।

দ্বিতীয় ঘটনাটা সন্ধেবেলার।

সানির বাপি বহুদিন ধরেই একটা শখের নাটকের দলের সঙ্গে যুক্ত। প্রতি রবিবার সন্ধেবেলা বাপি সেখানে যায়। সাতটা নাগাদ বেরিয়ে কাজ আর গল্পগুজব সেরে রাত প্রায় দশটা-সাড়ে দশটায় ফেরে।

নতুন 'অলৌকিক' ক্ষমতার ব্যাপারটা সানিকে বেশ ডিসটার্ব করছিল। সেইজন্য ওর পড়াশোনায় ভাটা পড়েছিল। মা সেটা নিয়ে ওকে রাত-দিন বকাবকি করছিল, বাপির কাছে থেকে-থেকে অনুযোগ করছিল।

বাপিও দু-চারদিন ওর পড়াশোনার 'স্টাইল' লক্ষ করে বিরক্ত হল। যে-বাপি সবসময় ওর সঙ্গে বন্ধুর মতো মেশে, মজা-মশকরা করে, সেই বাপি ওকে লাস্ট শুক্রবার পড়াশোনা নিয়ে ধমক দিল।

বাপির ওপরে খুব অভিমান হল সানির। সেই অভিমানে ও প্রচণ্ড বেশিরকম পড়াশোনা শুরু করে দিল। ওর লেখাপড়ার ধুম দেখে মা বলে ফেলল, 'দিনরাত পড়ছিস কেন? এত পড়লে তো ব্রেন ডাল হয়ে যাবে!'

'হলে হোক।' বইয়ের পাতায় চোখ রেখে গম্ভীর গলায় জবাব দিল সানি, 'বাপি বলেছে, আমার নাকি পড়াশোনায় একটুও মন নেই—।'

সানির মুড খারাপ দেখে মা ওকে আর ঘাঁটায়নি।

আজ সন্ধেবেলা বাপি যখন বেরোয় তখন সানি ওর ঘরে বসে অঙ্ক করছিল। পড়ার টেবিলে অঙ্কের দুটো বই, রাফ খাতা আর লাল-কালো কালির দুটো ডট পেন ছড়ানো। ওর মোবাইল ফোনটা সুইচ অফ করে পাশে রাখা।

বাপি বেরোনোর সময় ওকে উৎসাহ জোগাতে কয়েকটা কথা বলল। পড়াশোনায় মনোযোগ ফিরিয়ে আনার জন্য ওকে সাবাস দিল।

বাপি বেরিয়ে যাওয়ার পরই সানি কিন্তু পড়ার টেবিল ছেড়ে উঠে পড়েছিল। কারণ, একটা গল্পের বই ঃ 'ছায়া কালো কালো'। বইটা আজই লাইব্রেরিতে ফেরত দেওয়ার শেষ দিন। অথচ পড়াশোনার চাপে এখনও বইটার প্রায় চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ পৃষ্ঠা বাকি।

লাইব্রেরি রাত ন'টায় বন্ধ হয়। তাই সানি তাড়াহুড়ো করে গল্পের বইটা শেষ করার কাজে লেগে পড়ল।

মা ব্যাপারটা লক্ষ করলেও কিছু বলল না। কারণ, বাপির বকুনি খেয়ে সানি ক'দিন ধরে বড্ড বেশিমাত্রায় পড়াশোনা করছে।

কিন্তু কী আশ্চর্য! দু-মিনিট কাটতে না কাটতেই সানি গল্পের বইটা ঝপ করে বন্ধ করে বালিশের তলায় ঢুকিয়ে দিল। তারপর এক লাফে পড়ার টেবিলে গিয়ে বসল। মাথা ঝুঁকিয়ে অঙ্কের খাতার ওপরে হুমড়ি খেয়ে পড়ল।

মা তো এই দৃশ্য দেখে অবাক। সানিকে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই সানি ঠোঁটের ওপরে আঙুল চেপে মা-কে চুপ করে থাকতে ইশারা করল।

সঙ্গে-সঙ্গেই দরজায় কলিংবেলের আওয়াজ। মা গিয়ে দরজা খুলতেই বাপি ব্যস্ত পায়ে ঢুকে পড়ল ফ্ল্যাটে। বেডরুমের দিকে এগোতে-এগোতে মা-কে বলল, 'আর বোলো না! মানিব্যাগটা নিতেই ভুলে গেছি—।'

যেতে-যেতে সানির ঘরের দরজায় উঁকি মারল বাপি। সানি মগ্ন হয়ে অঙ্ক করছে।

'মন দিয়ে পড়। মন দিয়ে পড়। আমার বকাবকিতে রাগ করিস না। একদিন এই পরিশ্রমের রিটার্ন পাবি। সেদিন বুঝবি, কেন তোকে বকাবকি করেছি—।'

বাপি ম্যানিব্যাগ নিয়ে বেরিয়ে গেল। সঙ্গে-সঙ্গে সানি ছিটকে চলে গেল গল্পের বইয়ের কাছে।

মা অবাক চোখে অনেকক্ষণ ছেলেকে দেখল। তারপর ধীরে ধীরে বলল, 'তুই কেমন করে বুঝলি তোর বাপি ফিরে আসছে?'

সানি বলল, 'বাপির গলার আওয়াজ পেয়েছিলাম, মা।'

মা সন্দেহের গলায় বলল, 'আমাদের ফ্ল্যাটে কেউ এলে কোনওদিনই এ-ঘর থেকে কারও গলার আওয়াজ শোনা যায় না—আজ তুই গলার আওয়াজ পেলি কী করে?'

'আমার হঠাৎই মনে হল যেন বাপি ফিরে আসছে। তুমি আবার বাপিকে কিছু বলতে যেয়ো না...।'

মা সে-কথার উত্তর না দিয়ে বলল, 'সে না হয় বলব না, কিন্তু সকালে আমার পিছলে পড়ার ব্যাপারটা তুই আগে থেকে টের পেলি কেমন করে?'

'টের-টের কিছু পাইনি, মা। আমার জাস্ট মনে হয়েছিল।'

'এখনও কি জাস্ট মনে হল যে, তোর বাপি আবার ফিরে আসবে?'

সানি আবদারের সুরে বলল, 'বলছি তো, জাস্ট মনে হল। তুমি না আমার কথা একটুও বিশ্বাস করতে চাও না...!'

মা উত্তরে কিছু বলল না। সানির দিকে কয়েক পলক তাকিয়ে থেকে দুবার ছোট্ট করে মাথা নেড়ে রান্নাঘরের দিকে চলে গেল।

একটা কৃতিত্বের তৃপ্তি সানির বুকে ঝিলিক মারল।

আবার সেই পাঁচ মিনিট পর!

সানি এই বিচিত্র ক্ষমতার সঙ্গে নিজেকে ধীরে-ধীরে খাপ খাইয়ে নিচ্ছিল। অথবা বলা ভালো, নিজেকে মানিয়ে নিতে চেষ্টা করছিল। মা-কে কিংবা বাপিকেও এখনও কিছু বলেনি, কারণ, ওর মনে হচ্ছিল, ওরা কেউ সানির কথা বিশ্বাস করবে না।

দিন পনেরো-কুড়ি পার হওয়ার পর সানির মনে হতে লাগল ওর এই ক্ষমতাটা নষ্ট হয়ে যাওয়াই ভালো। কারণ, ও এমন সব ভবিষ্যতের 'ছবি' দেখতে পাচ্ছিল যেগুলো নেতান্তই মামুলি, অথবা তার মধ্যে ওর চেনা কোনও মানুষ অথবা চেনা কোনও জায়গা জড়িয়ে নেই। আর সেই মামুলি ঘটনাগুলো ওকে অহেতুক ডিসটার্ব করছিল।

যেমন ও দেখল, একজন ভদ্রলোক একটা ট্রামরাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে কয়েকটা পঞ্চাশ টাকার নোট গুনছেন, আর হঠাৎই একটা নোট হাত থেকে খসে পড়ে গেল। ভদ্রলোক ব্যাপারটা খেয়াল করেননি। তিনি কয়েক পা হেঁটে এগিয়ে যেতেই একজন ভিখারি টাকাটা কুড়িয়ে নিয়ে চলে গেল।

সানি জানে, ঠিক পাঁচ মিনিট পর এই ঘটনাটা কোথাও কোনও ট্রামরাস্তার পাশে ঘটে যাবে। তাতে সানির কিছু করার নেই।

কিন্তু এইরকম সব খুচরো ঘটনা ওকে সারাদিন এমন 'ব্যস্ত' রাখতে লাগল যে, সানি রীতিমতো বিরক্ত হয়ে উঠল। মন দিয়ে ও লেখাপড়া করতে পারছিল না। খেলাধুলো করতে পারছিল না। কিছুই করতে পারছিল না।

একসময় ওর মনে হল, এই মজার 'অলৌকিক' ক্ষমতাটা আসলে একটা বিরক্তিকর বাজে ক্ষমতা।

একদিন সকালবেলা সানি পড়ার টেবিলে বসে খুব মন দিয়ে পড়াশোনা করার চেষ্টা করছিল। আজ একটু জ্বর মতন হওয়ায় ও স্কুলে যায়নি। কিন্তু পড়ায় ওর ঠিকমতো মন বসছিল না। কারণ, পড়ার মাঝে ভবিষ্যতের নানান দৃশ্য ওর মনের মধ্যে ভেসে উঠছিল। ও সেগুলোকে জোর করে মন থেকে সরিয়ে দিচ্ছিল, কিন্তু কাজটা মোটেই সহজ হচ্ছিল না। ও খেয়াল করছিল যে, ও বইয়ের একই লাইন বারবার পড়ছে।

হঠাৎই ওর চোখের সামনে ভেসে উঠল একটা চওড়া রাস্তা। গাড়ি, বাস, মিনিবাস খুব ব্যস্তভাবে এদিক-ওদিক ছুটে যাচ্ছে। তারই ফাঁকফোকর দিয়ে দু-চারজন পথচারী ছুটে রাস্তা পার হচ্ছে।

রাস্তা পার হবে বলে একটা ছোট্ট ফুটফুটে মেয়ে রাস্তার কিনারা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে। সঙ্গে একজন সাতাশ-আটাশের মহিলা। বোধহয় ছোট মেয়েটির মা। ওরা দুজনেই রাস্তার গাড়ি চলাচল দেখছে। রাস্তা পার হওয়ার সুযোগ খুঁজছে।

ছোট মেয়েটির গায়ে লাল-সাদা স্কুল ইউনিফর্ম। মাথায় ভাঁজ দেওয়া দুটো বিনুনি, তার সঙ্গে লাল ফিতের ফুল।

মেয়েটির বয়েস বড়জোর সাত কি আট। কিন্তু হলে হবে কী, বেশ পাকা ও বারবারই মায়ের হাতঘড়িতে আঙুল ছুঁইয়ে কী যেন বলছে, আর ঝগড়ার ঢঙে হাত নাড়ছে। দেখে মনে হচ্ছে, স্কুলের দেরি হচ্ছে বলে ও মা-কে রাস্তা পার হওয়ার জন্য তাড়া দিচ্ছে।

গাড়ি চলাচল একটু কমতেই মা আর মেয়ে ব্যস্ত পায়ে রাস্তা পার হওয়ার জন্য রওনা হল। কিন্তু একটা গাড়ি ছুটে আসতেই মা এক ঝটকায় পিছিয়ে আসতে চাইল। অথচ মেয়েটা তখন সামনের দিকে দৌড় লাগিয়েছে।

মা পাগলের মতো চিৎকার করে মেয়ের নাম ধরে ডাকছিল, ওকে থামতে বলছিল।

মেয়েটা রাস্তার ওপরে থমকে দাঁড়িয়ে মুখ ফিরিয়ে তাকাল মায়ের দিকে।

সেই মুহূর্তে একটা টাটা সুমো বাচ্চা মেয়েটাকে ধাক্কা মেরে পিষে দিল রাস্তায়।

ওকে ডিঙিয়ে যখন সুমোটা প্রচণ্ড শব্দে ব্রেক কষে থামল ততক্ষণে সব শেষ।

রাস্তায় শোরগোল শুরু হল। লোকজনের ভিড়। পুলিশ। হইচই। পথ অবরোধ।

সানির মুখ দিয়ে একটা যন্ত্রণায় চিৎকার বেরিয়ে এল।

ফুটফুটে মেয়েটার মুখ এখন রক্তাক্ত। চোখ দুটো খোলা। মুখটা হাঁ করা। বাকি শরীরটা রাস্তায় লেপটে গেছে।

হা ভাগবান!

পাঁচ মিনিট পরেই এই অ্যাক্সিডেন্টটা কোথাও না কোথাও হবে। সাত-আট বছরের একটা নিষ্পাপ ফুল দলে পিষে শেষ হয়ে যাবে।

এই অ্যাক্সিডেন্টটা রোখার ক্ষমতা সানির নেই। কারণ, ও জানে না, জায়গাটা কোথায়, কিংবা ওর বাড়ি থেকে কতটা দূরে।

সানির মনটা যন্ত্রণায় মুচড়ে-মুচড়ে উঠতে লাগল। ও টেবিল-ঘড়ির দিকে

তাকিয়ে বসে রইল। সেকেন্ডে-সেকেন্ডে কাউন্টডাউন করতে লাগল। দেখতে লাগল, পাঁচ মিনিট সময় কীভাবে ফুরিয়ে যাচ্ছে!

সানির মাথাটা পাগল-পাগল লাগছিল। ওর মুখ দিয়ে আহত পশুর চাপা গোঙানি বেরিয়ে এল। ওই তো, পাঁচ মিনিট শেষ!

শেষ—সব শেষ।

কিন্তু না, এখানেই শেষ নয়। একটার পর একটা ঘটনা ঘটেই চলল। তার মধ্যে বেশ কয়েকটা ঘটনা মর্মান্তিক।

একদিন ও দেখল, সন্ধের মুখে একটা বিশাল পুকুরের পাড়ে তিনজন লোক একটা ছেলেকে কাদামাটির ওপরে ফেলে তার মুখ চেপে ধরেছে। ছেলেটা ছটফট করছে, গোঁ-গোঁ করছে—কিন্তু তিন-তিনটে লোকের সঙ্গে গায়ের জোরে পেরে উঠছে না।

হঠাৎই সানি দেখতে পেল, ওদের পাশেই কাদা আর ঘাসের ওপরে পড়ে আছে একটা কুড়ুল আর একটা লম্বা ছুরি।

সানি বুঝতে পারছিল, একটু পরেই কী ঘটতে চলেছে। ওর বুক দুরদুর করতে লাগল। ও ভগবানকে ডাকতে শুরু করল। মনে-প্রাণে চাইল, ও যা ভাবছে সেটা যেন না হয়।

কিন্তু সেটা হল না।

একজন লোক ছেলেটার বুকের ওপরে চেপে বসে রইল। দু-পা দিয়ে তার দুটো হাত মাটির সঙ্গে চেপে ধরল। ছেলেটা প্রাণপণে পা ছুড়ছিল, দাপাদাপি করছিল; আর তখনই বাকি দুজন লোক ঘাসের ওপর থেকে অস্ত্র দুটো তুলে নিল।

সানি কেমন একটা ঘোরের মধ্যে ছিল। চোখ বড়-বড় করে শূন্য দৃষ্টিতে ও সামনের দেওয়ালটার দিকে তাকিয়েছিল। ও মনে-মনে 'না! না!' বলে চিৎকার করছিল। আতঙ্কে চোখ বুজে ফেলেছিল। কিন্তু দৃশ্যটা ওর চোখের সামনে থেকে সরল না। তারপরই ঘাসের ওপরে রক্তের ছিটে ছড়িয়ে পড়ল।

সানি চিৎকার করে উঠল। একইসঙ্গে কেঁদে ফেলল।

টেবিল-ঘড়ির দিকে চোখ গেল ওর। আর পাঁচ মিনিট। তারপরই...।

ও অবশ আতঙ্কে ঘড়ির কাঁটার পথ চলা দেখতে লাগল।

পাঁচ মিনিট পর ও দু-হাতে মাথা চেপে গুঙিয়ে উঠল। আর ঠিক তখনই ওর পিঠে কে যেন হাত রাখল।

সানি চমকে ফিরে তাকাল।

মা উদ্বেগ নিয়ে তাকিয়ে আছে ওর দিকে।

কী যে হল মনের ভেতরে! ও এক ঝটকায় মায়ের দিকে ঘুরে মা-কে একেবারে জাপটে ধরল। ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল সানি। ফুলে-ফুলে উঠতে লাগল।

মা তো অবাক। ক্লাস নাইনে পড়া এতবড় ছেলে মা-কে জড়িয়ে ধরে কাঁদছে!

তা হলে ব্যাপারটা নিশ্চয়ই সিরিয়াস।

মা সানিকে কিছুই জিগ্যেস করল না। শুধু ছেলের পিঠে মমতা মাখা হাত বোলাতে লাগল।

কিছুক্ষণ পর শান্ত হল সানি।

মা ওর কাছে একটা চেয়ার নিয়ে বসল। ওর মাথায় গালে হাত বোলাতে-বোলাতে জিগ্যেস করল, 'কী হয়েছে বল। তোর কোনও ভয় নেই। আমি আর তোর বাপি—আমরা তো তোর পাশে আছি। তুই সব আমাকে খুলে বল, সানি...।'

সানি শুরু থেকে সব বলতে শুরু করল। কীভাবে ও দরজার ফ্রেমে ধাক্কা খেয়ে কিছুক্ষণের জন্য অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল। তারপর কীভাবে ওর মধ্যে একটা অস্বাভাবিক ক্ষমতা তৈরি হয়ে গেল। ও পাঁচ মিনিট ভবিষ্যতের ঘটনা দেখতে শুরু করল...

মা-কে সব খুলে বলল সানি। বলতে-বলতে ওর চোখে জল এসে গেল আবার।

মা মনে-মনে ভীষণ অবাক হয়ে গেলেও মুখে বলল, 'কিচ্ছু ভাবিস না। সব ঠিক হয়ে যাবে-

রাতে বাপিকে সব কথা জানাল সানির মা।

শুনে বাপি তো স্তম্ভিত হয়ে গেল। কী করবে, কী বলবে ভেবে পেল না।

কিছুক্ষণ দিশেহারাভাবে এদিক-সেদিক তাকিয়ে বাপি বলল, 'সানি, রাতে তোকে একা শুতে হবে না। তুই আমাদের কাছে শুবি।'

মা বলল, 'তুই আর বাপি খাটে শুয়ে পড়বি। আমি মেঝেতে বিছানা করে নেব...।'

সানি শূন্য চোখে তাকিয়ে মাথা নেড়ে সায় দিল।

বাপি চোখ সরু করে ছেলেকে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে লক্ষ করতে লাগল। তারপর একসময় জিগ্যেস করল, 'এখনও কি ওসব উদ্ভট ব্যাপারস্যাপার দেখতে পাচ্ছিস?'

ঘরের দেওয়ালে টাঙানো ঘড়ির দিকে তাকাল সানি। ধীরে-ধীরে বলল, 'হ্যাঁ,

বাপি, দেখতে পাচ্ছি...।'

সানির মায়ের দিকে অসহায় চোখে তাকিয়ে বাপি জিগ্যেস করল, 'ওর তো মনে হচ্ছে রাতে ঘুম-টুম হবে না। শোওয়ার আগে ওকে কি হালকা ঘুমের ওষুধ দেব?'

মা বলল, 'না, না, ওসব দরকার নেই। আমি ওর ঘাড়ে মাথায় জল-টল দিয়ে চাপড়ে-চাপড়ে ঘুম পাড়িয়ে দেব...।'

সানির মুখের দিকে তাকিয়ে মায়ের মনে হচ্ছিল, সানির বয়েস চোদ্দো নয়—পাঁচ বছর। দিশেহারা ফুটফুটে খোকা একটা।

মায়ের হাতের ছোঁয়া আর মমতায় সানি যখন ঘুমিয়ে পড়ল তখন রাত সাড়ে এগারোটা। ওকে ঘুমিয়ে পড়তে দেখে মা আর বাপি স্বস্তির শ্বাস ফেলল। ছেলেটা সারা রাত ঠিকঠাক ঘুমোলে হয়!

ভোরবেলার দিকে হঠাৎ চিৎকার করে জেগে উঠল সানি।

একটা বড় হাসপাতালে আগুন লেগেছে। চারতলা এয়ার কন্ডিশনড বিল্ডিং। সব ঘরেই কাচের জানলা এয়ারটাইট, একটুও ফাঁক নেই। রুগিরা পাগলের মতো ছুটোছুটি করছে। কেউ-কেউ মুখে হাতে নল লাগানো অবস্থায় জানলার কাচ ভাঙতে চেষ্টা করছে। চারদিকে ধোঁয়ায় ধোঁয়া। ফায়ার অ্যালার্মের শব্দ শোনা যাচ্ছে। শোনা যাচ্ছে মরণমুখী মানুষের আর্ত চিৎকার।

সানির চিৎকারে মা আর বাপি দুজনেরই ঘুম ভেঙে গেছে। ওরা ছেলেকে শান্ত করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। কিন্তু সানিকে কিছুতেই শান্ত করা যাচ্ছিল না। ও কোন এক যন্ত্রণায় ছটফট করছিল। ভয় পাওয়া গলায় চেঁচিয়ে বলছিল, 'মা, মা - ওদের বাঁচাও। পেশেন্টদের গায়ে আগুন। ওরা ছুটোছুটি করছে! জানলা ভেঙে ঝাঁপ দিচ্ছে। হাসপাতালের ভেতরে শুধু ধোঁয়া আর আগুন। বাপি, ওদের বাঁচাও...বাঁচাও...!'

মা আর বাপি অসহায়ভাবে সানিকে জাপটে ধরে বসে রইল। ছেলের কষ্ট দেখে দুজনেরই চোখে জল এসে গেল।

ছটফট করতে-করতে সানি হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে গেল।

ওকে তাড়াতাড়ি বিছানায় শুইয়ে দিয়ে মা ওর মাথায় ভেজা রুমাল বুলিয়ে দিতে লাগল।

বাপি একরাশ চিন্তা নিয়ে খোলা জানলার দিকে তাকিয়ে দিল। সেখানে এক টুকরো আকাশ দেখা যাচ্ছে। আকাশে নিশ্চিন্তে উড়ে বেড়াচ্ছে তিনটে চিল। কয়েকটা গাছ দেখা যাচ্ছে। ওদের পাতা বাতাসে নড়ছে।

এসব দেখে যেন মনে হয়, পৃথিবীতে কোথাও কোনও দুঃখ নেই।

ঘড়ির দিকে তাকাল বাপি। পাঁচ মিনিট হয়ে গেছে। সানি একটু আগে যা-যা দেখেছে সেসব এখন সত্যি হচ্ছে। জীবন্ত মানুষগুলো হসপিটালের মধ্যে পুড়ছে, ধোঁয়ায় দম বন্ধ হয়ে মরছে।

হে ভগবান! এসব যেন সত্যি না হয়!

কিন্তু ঘণ্টাখানেক পর কী মনে করে বাপি টিভি খুলতেই দেখা গেল সব সত্যি! দক্ষিণ কলকাতার এক নামি হসপিটাল দাউদাউ করে জ্বলছে। তাকে ঘিরে উদ্বিগ্ন লোকজনের ভিড়, হইচই, ছুটোছুটি। দমকলের অনেকগুলো গাড়ি সেখানে এলেমেলোভাবে দাঁড়িয়ে। দমকলকর্মীরা আগুন নেভানোর কাজে ব্যস্ত।

এসব দেখে সানির মা আর বাপি থরথর করে কাঁপতে লাগল। মা শব্দ করে কেঁদে ফেলল। বাপি একছুটে টিভির কাছে গিয়ে টিভির সুইচ অফ করে দিল।

কী হবে এখন?

ছেলের দিকে তাকাল দুজনে। ছেলে বিছানায় নিথর হয়ে শুয়ে আছে। বোধহয় ঘুমোচ্ছে। নাকি ওর জ্ঞান এখনও ফেরেনি?

বাপি আর মা চাপা গলায় আলোচনা করতে লাগল। ওরা কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছিল না কী করলে সানির ভালো হবে, সানি ভালো হয়ে উঠবে।

ওরা কাকে বলবে সানির এই 'অলৌকিক' ক্ষমতার কথা, ওর এই সাংঘাতিক মানসিক যন্ত্রণার কথা? কারণ, কাউকে ব্যাপারটা জানালে অন্যরকম বিপদ হতে পারে। ব্যাপারটা একজন থেকে জানবে দুজন, দুজন থেকে পাঁচজন. তারপর কারও মাথায় কুবুদ্ধি দেখা দেবে। সে সানিকে হয়তো কিডন্যাপ করবে। ওকে ভয় দেখিয়ে ওর এই ভবিষ্যতে দেখতে পাওয়ার ক্ষমতাটাকে কুকাজে লাগাবে। চুরি, ডাকাতি, জুয়াখেলা, লটারি, ব্যাঙ্ক ডাকাতি এমনকী খুনের কাজেও।

সানির বাপি আর মা এলেমেলো দুশ্চিন্তায় একেবারে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। আঁকড়ে ধরার জন্য একটা খড়কুটোও ওরা খুঁজে পাচ্ছিল না। এমনকী কোনও ডাক্তারকে দেখাতেও তেমন ভরসা হচ্ছিল কই?

দিশেহারা অবস্থায় সারাটা দিন কেটে গেল ওদের। সানি ঘুম থেকে ওঠার পর ওকে সবসময় আগলে রইল দুজনে। অফিসে বেরোনোর কথা বাপির মাথাতেও এল না।

মা আর বাপি সব জেনে যাওয়ায় সানির মন কিছুটা হালকা হয়েছিল, কিন্তু ওর ভেতরের অস্থির ভাবটা কমছিল না। ও কখনও পড়ার টেবিলে বসছিল, কখনও কম্পিউটারের সামনে বসে মাউসে ক্লিক করছিল, কখনও গল্পের বই, আবার কখনও বা টিভি।

ধীরে-ধীরে রাত হয়ে গেল। একসময় দেওয়াল-ঘড়ির মিষ্টি আওয়াজ জানিয়ে দিল রাত ন'টা বাজে। বাপি একটা চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে চোখ বুজে কীসব ভাবছিল। ঘড়ির সুরেলা মিউজিক শুনতে-শুনতে হঠাৎই বাপি চোখ খুলল। চেঁচিয়ে সানির মা-কে ডাকতে লাগল। তারপর অধৈর্য হয়ে এক ঝটকায় চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল। এবং রান্নাঘরের দিকে পা বাড়াল। যাওয়ার সময় সানির ঘরের দিকে উঁকি মেরে দেখল, ও একটা রঙিন ম্যাগাজিনে মুখ ডুবিয়ে বসে আছে।

রান্নাঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে সানির মা আর বাপি বেশ কিছুক্ষণ নীচু গলায় অলোচনা করল। তারপর ওদের মনে হল, আন্দাজে এরকম একটা ঝুঁকি নেওয়া যেতেই পারে, কারণ সানির কষ্ট আর চোখে দেখা যাচ্ছে না।

কাঁটায়-কাঁটায় দশটা বেজে পাঁচ মিনিটে মা চেঁচিয়ে সানিকে খেতে ডাকল।

সানি বিছানায় আধশোয়া হয়ে গল্পের বই নিয়ে ব্যস্ত ছিল। মায়ের ডাক শুনে ও চেঁচিয়ে জবাব দিল, 'মা, পাঁচ মিনিট পর যাচ্ছি—প্লিজ...।'

পাঁচ মিনিট পর ও খাওয়ার টেবিলে হাজির হয়ে দেখল বাপির খাওয়া প্রায় শেষ। খেতে-খেতেই বাপি বারবার দেওয়াল ঘেঁষে রাখা একটা শো-কেসের দিকে তাকাচ্ছিল। কারণ, সেখানে একটা টেবিল-ঘড়ি সময় দেখিয়ে চলেছে।

সানির খাওয়া শুরু হওয়ার একটু পরেই বাপির খাওয়া শেষ হল। হাত-মুখ ধুয়ে বাপি আবার সানির পাশের চেয়ারে এসে বসল। মা পায়ে-পায়ে সানির কাছে এসে দাঁড়াল।

বাপি সানির পিঠে হাত রাখল। স্নেহের গলায় বলল, 'সানি, আমি আর তোর মা একটা জিনিস ভেবেছি...।'

'কী?' সানি বাপির দিকে মুখ ফেরাল।

ওর চোখ-মুখ ক্লান্ত, কেমন একটা বিভ্রান্ত ভাব সেখানে।

'শোন, কথায় বলে, বিষে বিষক্ষয়...।' একটু চুপ করে থেকে বাপি বলল, 'তোর মনে আছে, তোর এই পিকিউলিয়ার ভিশানের ব্যাপারটা যখন শুরু হয় তখন তোর একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল...।'

'তুই ও-ঘরের দরজার ফ্রেমে মাথা ঠুকে পড়ে গিয়েছিলি—' মা বলল,

'তারপর তুই কিছুক্ষণের জন্যে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলি।'

সানি মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে সায় দিয়ে মাথা নড়াল ঃ হ্যাঁ, ভালো করে মনে আছে—।'

বাপি এবার হেসে বলল, 'আজ তোকে সেই অ্যাক্সিডেন্টটার অ্যাকশান রিপ্লে করতে হবে...ঠিক এই সময়ে...।'

'তার মানে?' সানির খাওয়া থেমে গেল।

'মানে আর কিছুই না।' মা ওর পিঠে আলতো হাত রেখে বলল, 'তাড়াতাড়ি খাওয়া শেষ করে তুই ছুটে যা তোর ঘরের দিকে। তারপর দরজার ফ্রেমে ধাক্কা খেয়ে ছিটকে পড়ে যা মেঝেতে। যদি কয়েক মিনিটের জন্যে অজ্ঞান হয়ে যেতে পারিস তা হলে দারুন হবে।' কথা বলতে-বলতে মায়ের চোখে জল এসে গেল ঃ 'তারপর...তারপর দেখবি তোর অসুখ একেবারে সেরে গেছে—।' চোখে জল নিয়ে মা হাসতে চেষ্টা করল।

সানি অবাক চোখে একবার মায়ের দিকে আর একবার বাপির দিকে তাকাচ্ছিল।

সেই রাতের সেই অ্যাক্সিডেন্টটা রিপিট করলেই সব সেরে যাবে! কখনও কি এমন হয়? কে জানে!

মা সানির চিবুকে আঙুল ছুঁইয়ে বলল, 'জানি, দরজায় ধাক্কা খেতে তোর কষ্ট হবে—তুই জোরে ব্যথা পাবি।' মায়ের চোখে জল। কথা জড়িয়ে গেল কান্নায় ঃ 'কিন্তু...কিন্তু উপায় কী বল? আর যে কোনও পথ খুঁজে পাচ্ছি না...।'

বাপি ওর মাথায় হাত বুলিয়ে বলল, 'আমরা কাউকে তোর এই অসুখের কথা বলতে পারছি না, কারণ, ব্যাপারটা জানাজানি হলেই শোরগোল পড়ে যাবে। খবরের কাগজ আর টিভি চ্যানেলের লোকেরা আমাদের ছেঁকে ধরবে। তোকে দিয়ে আজেবাজে আর ইল্লিগাল কাজ করাতে চাইবে অনেকে। তোর লাইফ রিস্ক হয়ে যাবে, সানি।'

'সেইজন্যে তোকে ডাক্তারের কাছেও নিয়ে যেতে পারছি না, বাবা—' মা চোখের জল মুছে বলল।

'এটাই আমাদের শেষ চেষ্টা...শেষ খড়কুটো।' বাপি টেবিলঘড়ির দিকে তাকাল ঃ 'নে বাবা, তাড়াতাড়ি কর। এক্ষুনি সময় পেরিয়ে যাবে...।'

সানি বলল, 'হ্যাঁ, বাপি—বুঝেছি...।'

ভবিষ্যতের ঘটনা দেখতে পাওয়ার যন্ত্রণায় সানি ভেতরে-ভেতরে চুরমার হয়ে যাচ্ছিল। ওর মাথার চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে করছিল, দেওয়ালে মাথা ঠুকতে

ইচ্ছে করছিল। নাছোড়বান্দা একটা অসুখকে ছাড়ানোর চেষ্টায় ওর প্রায় পাগল হওয়ার জোগাড়।

তা হলে ছুটে গিয়ে দরজার ফ্রেমে গুঁতো খাওয়াটা কী এমন কঠিন! তাতে যদি অসুখটা সত্যি-সত্যি সেরে যায় তো দারুণ ব্যাপার হবে!

খাওয়া শেষ করে উঠে দাঁড়াল সানি। ঘড়ির দিকে একবার তাকাল। তারপর চট করে হাত-মুখ ধুয়ে ছুট লাগাল ওর ঘরের দিকে।

দরজার ফ্রেমে ওর মাথাটা প্রচণ্ড জোরে ঠুকে গেল। চোখের সামনে একরাশ হলদে ফুল ফোয়ারা হয়ে ছড়িয়ে পড়ল। 'আঃ!' শব্দ করে সানি ছিটকে পড়ল মেঝেতে। জোরালো ভোঁতা শব্দে ঘরের মেঝে কেঁপে উঠল।

বাপি আর মা সানির পিছন-পিছন বলতে গেলে প্রায় ছুটেই এসেছিল। ওদের চোখের সামনেই সংঘর্ষের ঘটনাটা ঘটল।

মা চিৎকার করে উঠল। বাপি চট করে মেঝেতে বসে পড়ে বলল, 'শিগগির!'

মা ছুটে জলের জাগ নিয়ে এল। সানির ওপর ঝুঁকে পড়ে ওর মাথায় জল ঢালতে লাগল।

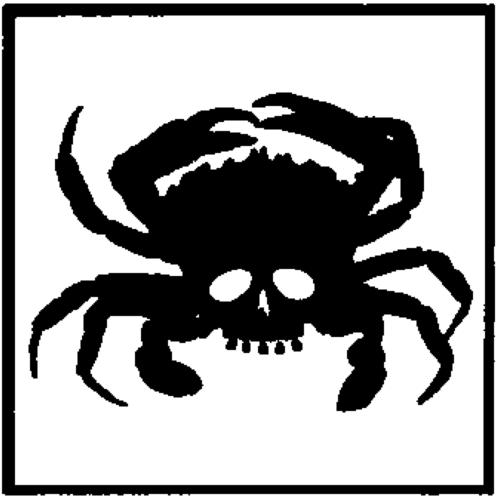
সানির দু-চোখ বোজা। শান্তি মুখ। কপাল আর মাথার চুল ভেজা।

মা আর বাপি সানির নাম ধরে বারবার ডাকছিল। কিন্তু সানির কোনও সাড়া নেই। ও অজ্ঞান হয়ে গেছে।

মা আর বাপি আকুলভাবে সানির মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল। আর মনে-মনে ভগবানকে ডাকছিল। ওরা চাইছিল সানির জ্ঞান ফেরার পর ওর যেন পাঁচ মিনিট ভবিষ্যতে দেখতে পাওয়ার ক্ষমতাটা আর না থাকে।

ওর অসাধারণ ক্ষমতা উঠে গিয়ে ও আবার একটা সাধারণ ছেলে হয়ে যাক।





বিপদে পড়ে আপনাকে বলছি

কথাটা শুনেই ভিকি মুখ ফিরিয়ে তাকাল।

লম্বা রোগা চেহারার ভদ্রলোক। গাল দুটো চুপসে আছে। রং ময়লা। কপালে বেশ কয়েকটা ভাঁজ। ভুরুজোড়া যেন একজোড়া শুঁয়োপোকা। মাথায় কাঁচা-পাকা কদমছাঁট চুল। বয়েস পঞ্চাশের ওপিঠেই হবে বোধহয়।

ভদ্রলোকের চোখে চশমা নেই। তাই ওঁর অদ্ভুত চোখ দুটো স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে। চোখের মণি কটা। মাপে বেশ ছোট। আর কাচের মার্বেলের মতো জ্বলজ্বল করছে।

ভদ্রলোকের পোশাক খুঁটিয়ে দেখল ভিকি।

একটা পুরোনো খয়েরি হাফশার্ট, আর ছাইরঙের ঢোলা প্যান্ট। দুটোই মোটামুটি ময়লা। তার ওপর শার্টের একটা বোতাম নেই। আর পায়ে কালো রঙের চপ্পল।

ভদ্রলোক কথাগুলো ভিকির বাবাকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর শিরা বের করা দু-হাত কচলে হোঁচট খাওয়া গলায় আবার বললেন, 'প্লিজ....খুব.....খুব বিপদে পড়ে আপনাকে বলছি....। আমাকে, আমাকে একটু হেল্‌প করুন....।'

ভিকি লক্ষ করল, ওর বাবা সামান্য ভুরু কুঁচকে চশমার কাচের ওপিঠ

থেকে ভদ্রলোককে জরিপ করছেন। এমনকী ওর মা-ও একটু অবাক চোখে ভদ্রলোককে দেখছেন।

ভিকির কৌতূহল হল। কী বিপদে পড়েছেন, ভদ্রলোক? চেহারা আর পোশাক দেখে ওঁকে ঠিক ভিখিরি বলে মনে হচ্ছে না। আবার খুব যে সচ্ছল এমনও নয়। তবে আজকাল তো লোক ঠকানোর নানানরকম ফন্দিফিকির বেরিয়েছে। কে জানে! ভদ্রলোক—নাকি লোকটা—ঠগ জোচ্চোর হলেও হতে পারে।

কিন্তু ভদ্রলোকের কথায় এমন একটা দিশেহারা ঢং ছিল যে, ভিকির মনে হল, ওঁর বিপদের ব্যাপারটা শুনলে মন্দ হয় না!

কিন্তু ওর বাবা ততক্ষণে চোয়াল শক্ত করে বলে দিয়েছেন, 'সরি, মাপ করুন—।' এবং সেই সঙ্গে ডানহাত নেড়ে ওঁকে সরে যাওয়ার তাচ্ছিল্যের ইশারাও করে দিয়েছেন।

ভদ্রলোক কয়েক সেকেন্ড ভিকির বাবার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন। তারপর খুব শান্ত গলায় বললেন, 'আপনি, স্যার, আমাকে মাপ করবেন। আপনি...আপনি মনে হয় আমাকে...আমাকে ভিখিরি ভেবেছেন। আমি কিন্তু তা নই...।'

ভিকি লক্ষ করল, ওর বাবার চোয়াল একইরকম শক্ত রয়েছে। বাবা লোকটার কথায় বিন্দুমাত্রও আমল না দিয়ে চোখ থেকে চশমা খুলে নিয়েছেন। এবং পকেট থেকে রুমাল বের করে গভীর মনোযোগে চশমার লেন্স পরিষ্কার করছেন।

মায়ের দিকে তাকাল ভিকি।

মা-ও তখন অন্যদিকে মন দিয়েছেন। দূরে ছেলের দল ফুটবল খেলা শেষ করে হইহই করে বাড়ির পথ ধরছে—মা সেদিকে এমনভাবে তাকিয়ে রয়েছেন যেন ফুটবল খেলা শেষ হয়ে গেছে বলে মা বেশ হতাশ। কিন্তু ভিকি জানে, মা ফুটবল খেলা মোটেও ভালোবাসেন না। মায়ের ফেভারিট গেম ক্রিকেট।

ভদ্রলোক হাত দিয়ে মুখের ঘাম মুছলেন। একটা বড় শ্বাস ফেলে বাবাকে লক্ষ করে বললেন, 'ঠিক আছে, স্যার—আপনাকে কোনও হেলপ করতে হবে না। শুধু আমার দিকে একটু দেখুন, আমার কথাগুলো একটু শুনুন—শুনলে আপনার গল্প বলে মনে হবে। তারপর আপনার যা মনে হয় তাই করবেন। বিশ্বাস করুন, আমি ভিখিরি নই....বিশ্বাস করুন....।'

ভদ্রলোকের কথাগুলোয় একটা মরিয়া কাতর ভাব ছিল। সেটা ভিকিকে

নাড়া দিল, কিন্তু ওর বাবাকে নাড়া দিতে পারল না।

ভিকি জানে, ওর বাবা ভীষণ শক্ত ঠাঁই। বাবাকে ঠকানো সহজ নয়। বাবার অনেক বুদ্ধি। বাবার ব্রেন কম্পিউটারের মতো। বাবা নিজেই সবসময় এ-কথা বলেন।

ভিকির বাবা আই আই টি-র কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার। বছর দশেক হল একটা মাল্‌টিন্যাশন্যাল সফ্‌টওয়্যার কোম্পানিতে আছেন। এখন ডিভিশন্যাল ম্যানেজার।

সুতরাং সেই ম্যানেজারের চোয়াল এখনও শক্ত। শুধু চশমাটা এবার চোখে দিলেন।

কিন্তু মায়ের দিকে তাকিয়ে ভিকি একটু অবাক হল। মনে হল, মায়ের মুখের রেখাগুলো একটু যেন নরম হয়েছে। চোখে কিছুটা কৌতূহলও ফুটে উঠেছে যেন।

ভিকিরও গল্পটা খুব শুনতে ইচ্ছে করছিল। দেখাই যাক না, শেষ পর্যন্ত ভদ্রলোক কী হেল্‌প চান। তারপর তো হেল্‌প না করলেই হল।

'বিশ্বাস করুন, আমি খুব বিপদে পড়েছি—।' ভদ্রলোকের গলাটা এবার কান্না-কান্না হয়ে গেল। জ্বলজ্বলে চোখ দুটোর দ্যুতি অনেকটা মলিন হয়ে গেল।

রোজ বিকেলে মায়ের সঙ্গে দেশবন্ধু পার্কে আসে ভিকি। সেখানে পীযূষ স্যারের কাছে ফুটবলের কোচিং নেয়। শনিবার আর রবিবার বাবার অফিস ছুটি। তাই বাবা-মা দুজনেই আসেন ছেলের সঙ্গে। আজ শনিবার।

কোচিং শেষ হয়ে গেলে ভিকি বাবা আর মায়ের সঙ্গে পার্কে কিছুক্ষণ হাঁটাহাঁটি করে। তারপর একটা বেঞ্চে বসে পড়ে তিনজনে। খেয়ালখুশিমতো ঝালমুড়ি. ভেলপুরি বা টুকটাক কিছু খায়। নিজেদের মধ্যে গল্প করে।

আজও ঠিক তাই।

এই ভাবে একসময় সন্ধে নেমেছে। পার্কের আলোগুলো সব জ্বলে উঠেছে। যেসব ছেলের দল বড় মাঠটায় ফুটবল খেলছিল তারা খেলার পাট চুকিয়ে হইহই করে বাড়ির দিকে রওনা দিয়েছে।

মাঠটাকে ঘিরে রিং-এর মতো একটা পিচরাস্তা আছে। সেই রাস্তায় নানান বয়েসের লোকজন হাঁটাহাঁটি করে। তাদের অনেকে, অবশ্য এখনও হেঁটে চলেছে।

বাবা ঘড়ি দেখছিলেন। একটু পরেই হয়তো ভিকিরা উঠে পড়বে, হাঁটা দেবে বাড়ির দিকে। ঠিক সেই সময় এই অচেনা ঢ্যাঙা ভদ্রলোক এসে হাজির। যিনি একটা 'গল্প' শোনাতে চান।

সন্ধের মুখে মিষ্টি বাতাস বইছিল। এখনও তেমন অন্ধকার হয়নি। পার্কের বেশিরভাগ বেঞ্চেই লোকজন বসে আছে। ভিকিদের বেঞ্চ থেকে একটু দূরে

পিচরাস্তার ধার ঘেঁষে ফুচকাওয়ালা, ঝালমুড়িওয়ালারা দাঁড়িয়ে। তাদের ঘিরে খদ্দেরের ভিড় তার ঠিক পরেই পার্কের মেন গেট। গেট পেরোলেই বড় রাস্তা। সেখানে এদিক-ওদিক গাড়ি-অটো-সাইকেল ছুটে যাচ্ছে।

ভিকিদের বাঁ-দিকটায় বেশ কয়েকটা বড়-বড় গাছ। গাছের পাতায় পার্কের লাইটপোস্ট থেকে কমলা রঙের আলো পড়েছে। বাতাসে পাতাগুলো নড়ছে। সারা বিকেল ধরে যে গুমোট ভাব ছিল সেটা বোধহয় এবার কাটল।

বাতাসে ধুলোর গন্ধ পাওয়া যাচ্ছিল। ভিকি দেখল, মা নাকে রুমালে চাপা দিয়েছেন। নাকে ধুলো গেলে মায়ের খুব হাঁচি হয়। বাবা বলেন, ওটা নাকি অ্যালার্জি।

'স্যার, বলব?' ভদ্রলোক আবার আর্জি জানালেন।

বাবা ভুরু কুঁচকে ওঁর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন, বোধহয় মনে-মনে ভাবলেন, লোকটা তো মহা নাছোড়বান্দা!

সবার চোখের আড়ালে মা বাবাকে আঙুলের খোঁচা দিলেন। বাবা মায়ের দিকে তাকাতেই মা চাপা গলায় ইংরেজিতে বললেন, 'লেটস হিয়ার হিম আউট।'

বাবা সায় দিয়ে ছোট্ট করে মাথা নাড়লেন। তারপর ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে একটা লম্বা শ্বাস ছেড়ে বললেন, 'বলুন, কী বলবেন—।'

ভদ্রলোক দু-হাত নেড়ে একটা ভঙ্গি করে বললেন, 'একটা রিকোয়েস্ট আছে কিন্তু....।'

'কী?'

'আমার গল্পটা যতই আজগুবি বা উদ্ভট শোনাক—আপনারা কিন্তু আমাকে মাঝপথে থামিয়ে দেবেন না। পুরোটা শুনবেন—প্লিজ....।'

গল্পটা শুরু হচ্ছে না কেন? ভিকির বেশ অধৈর্য লাগছিল।

ভদ্রলোকের কথায় বাবা আর মা একবার মুখ চাওয়াচাওয়ি করলেন। ভিকি মায়ের আরও গা ঘেঁষে বসল।

বাবা গম্ভীর গলায় ভদ্রলোককে বললেন, 'ঠিক আছে। বলুন।'

ভদ্রলোক বলতে শুরু করলেন।

'আমার নাম —আপনাদের ভাষায় বলতে হলে— আর ফাইভ। আমি অন্য গ্রহের প্রাণী, না, হাসবেন না, স্যার-আমি সত্যি সত্যি এলিয়েন। বার্নার্ড্‌স স্টারের চার নম্বর গ্রহ প্যাক-ফোর থেকে আমি আসছি। আপনাদের সূর্যের কাছাকাছি

যেসব নক্ষত্র রয়েছে ডিসট্যান্সের হিসেবে বার্নার্ড্‌স স্টার হল চার নম্বর—প্রায় ২২.৬ লাইট-ইয়ার দূরে। আমার নিজের একটা বিজনেস আছে। মহাবিশ্বের নানান জায়গায় ঘুরে ঘুরে ফিজিক্যাল ডেটা কালেকশানই আমার কাজ। আজ পর্যন্ত যে পরিমাণ ডেটা আমি কালেক্ট করেছি সেটা বিলিয়ন বিলিয়ন গিগা টেরা বাইট ছাড়িয়ে যাবে। রাফলি বলতে গেলে সেই সংখ্যাটা টেন টু দ্য পাওয়ার ওয়ান জিরো টু ফোরের চেয়েও বেশি। এত ডেটা ভলিয়ুম আপনারা কল্পনাও করতে পারবেন না....।'

এক নিশ্বাসে এই পর্যন্ত বলে আর-ফাইভ বোধহয় দম নেওয়ার জন্য একটু থামলেন।

অন্ধকার একটু গাঢ় হয়েছে। পার্কের কমলা রঙের আলো খানিকটা জোরালো হয়েছে। ভদ্রলোকের মুখের একদিকে সেই আলো পড়ায় লম্বাটে মুখটা অদ্ভুত দেখাচ্ছে।

এই লোকটা ভিনগ্রহের প্রাণী ভিকির বাবা ভাবছিলেন। এটা ঠিকই যে, বার্নাড্‌স্ স্টার নামে একটা তারা সত্যিই আছে। কিন্তু তার চার নম্বর গ্রহ প্যাক-ফোর-এর কথা ভিকির বাবা কিংবা মা কখনও শোনেননি।

তবে ভদ্রলোকের কথাবার্তায় কোনও হোঁচট খাওয়ার ব্যাপার নেই। দিব্যি গড়গড় করে বলে চলেছেন। আর ইংরেজি উচ্চারণগুলোও এত ঠিকঠাক যে, মনে হয় না ইংরেজি বলতে বা বুঝতে ওঁর কোনও অসুবিধে আছে।

ভিকির মা মনে-মনে একটু লজ্জা পেয়ে গেলেন। একটু আগেই ভিকির বাবাকে তিনি ইংরেজিতে যে-কথা বলেছিলেন তার উদ্দেশ্য ছিল যাতে এই অচেনা ভদ্রলোক সে-কথার মানে বুঝতে না পারেন।

ভদ্রলোকের পোশাক আশাকের সঙ্গে তাঁর কথাবার্তার ঢং মোটেই মিলছিল না। খুব স্মার্টভাবে তিনি তাঁর বানানো গল্পটা শোনাচ্ছিলেন।

অবশ্য চিটিংবাজরা সাধারণত বেশ স্মার্ট হয় আর অ্যাক্টিং এ-ও বেশ পোক্ত হয়। ভদ্রলোকের মুখের দিকে তাকিয়ে ভিকির বাবা ভাবছিলেন। আচ্ছা, এঁকে দু-একটা কোশ্চেন করলে কেমন হয়!

'এক লাইট-ইয়ার মানে কতটা ডিসট্যান্স?'

ঠোঁট চওড়া করে হাসলেন আর-ফাইভ ঃ 'এ তো স্কুল লেভেল নলেজ, স্যার। এক বছরে লাইট যত দূর যেতে পারে। সেই দূরত্ব....মানে, অ্যাপ্রক্সিমেটলি ন' লক্ষ ছেচল্লিশ হাজার পঞ্চাশ কোটি কিলোমিটার....।'

ভিকির মনে হচ্ছিল ব্যাপারটা ঠিক কল্পবিজ্ঞানের গল্পের মতো শোনাচ্ছে

ঃ ভিনগ্রহ, ভিনগ্রহী প্রাণী, লাইট-ইয়ার। আচ্ছা, যদি এই আর-ফাইভ ভদ্রলোক ওঁর গ্রহ থেকে আলোর গতিবেগে পৃথিবীতে এসে থাকেন তা হলে তো ওঁর, সাড়ে বাইশ বছরের বেশি সময় লেগে যাওয়ার কথা। তা ছাড়া আলোর গতিবেগে তো কোনও মহাকাশযানের পক্ষেই ওড়া সম্ভব নয়! তা হলে কি ভদ্রলোক ট্যাকিয়ন রকেটে চড়ে এসেছেন? ভিকি কল্পবিজ্ঞানের গল্পে পড়েছে ট্যাকিয়ন রকেটের কথা। ট্যাকিয়ন এমন এক ধরনের কণা যা আলোর চেয়েও বেশি গতিবেগে ছুটতে পারে।

ভিকি মনে মনে ব্যাপারটা ভাবছিল, আর বাবা ঠিক সেই প্রশ্নটাই ভদ্রলোককে করে ফেললেন। তারপর মায়ের কানের কাছে মুখ নিয়ে নীচু গলায় কী যেন বললেন।

বাবার প্রশ্নে আর-ফাইভ নামের ভদ্রলোক ঠোঁটে হাসলেন, বললেন, 'বলছি। কিন্তু আমি আপনাদের বেঞ্চের এই কোণটায় একটু বসতে পারি? অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে আছি...পা টনটন করছে...।'

বাবা মায়ের দিকে একবার আড়চোখে তাকালেন। তারপর ভদ্রলোকের দিকে ফিরে বললেন, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ,—বসুন।'

এমনিতে আপত্তি করার কোনও কারণ নেই—যেহেতু বেঞ্চিটা মাপে বেশ বড়।

ভদ্রলোক বসলেন, একপাশে শরীরটা কাত করে পকেট থেকে কালো রঙের ডায়ালের মতো কী একটা যন্ত্র বের করে একবার দেখলেন।

কমলা রঙের আলোয় ভিকি যেটুকু বুঝতে পারল, জিনিসটা দেখতে ম্যাগনেটিক কম্পাসের মতো। তার ভেতরে ডায়ালে অনেক লেখা। তা ছাড়া, গোল যন্ত্রটার পাশ থেকে গোটাতিনেক নব বেরিয়ে আছে।

ভিকির কৌতূহলী নজরের দিকে তাকিয়ে ভদ্রলোক বললেন, 'এটা সুপারক্রোনোমিটার, বাবুসোনা। আমাদের প্যাক-ফোর-এ এইরকম যন্ত্র ইউজ করা হয়—তোমরা যাকে ঘড়ি বলো...।' এবার বাবার দিকে তাকালেন তিনি ঃ হ্যাঁ, আপনি ওই ট্যাকিয়ন রকেটের কথা বলছিলেন। না, স্যার, আমি ট্যাকিয়ন রকেটে চড়ে আসিনি। কারণ ট্যাকিয়ন পার্টিকল দিয়ে কোনওদিনই রকেট তৈরি করা সম্ভব নয়। অন্তত আমাদের প্যাক-ফোর-এর, টেকনোলজি সেটা এখনও পারেনি। আমরা বহু দূর-দূর পর্যন্ত স্পেস ট্রাভেল করি হাইপার ড্রাইভ আর স্পেস জাম্প ব্যবহার করে। ব্ল্যাক হোল দিয়ে ঢুকে হোয়াইট হোল দিয়ে বেরিয়ে আসি। খুব কমপ্লিকেটেড টেকনোলজি। আর, আমার রকেটের ফুয়েল হাইড্রোজেন—

মহাকাশ থেকে বিনিপয়সায় পাওয়া।

'যাকগে—যা বলছিলাম। খুব সংক্ষেপে বলছি। আমি স্পেস ট্র্যাভেল করে নানান গ্রহ থেকে যেসব ডেটা কালেক্ট করি সেগুলো আবার বিক্রি করি—আমার বিজনেস। আমাদের গ্রহে অনেকগুলো মাল্টিন্যাশানাল কোম্পানি আছে—আপনাদের মতন। সেই কোম্পানিগুলো বিভিন্ন প্ল্যানেটে মাইনিং অপারেশান চালায়। ওরা আমার কাছ থেকে সেইসব প্ল্যানেটের র' ডেটা কেনে, তারপর ওদের মাইনিং প্রজেক্টের ব্লু প্রিন্ট তৈরি করে। আমি...' আর-ফাইভ সুপার ক্রোনোমিটারটা পকেটে ঢুকিয়ে রাখলেন। তারপর হঠাৎ শূন্যে নাক উঁচিয়ে শব্দ করে কয়েকবার গন্ধ নেওয়ার চেষ্টা করলেন। তারপর বললেন, সোডিয়ামের গন্ধ পাচ্ছি...সোডিয়ামের গন্ধ পাচ্ছি...।'

ভিকির মা পার্কের কমলা রঙের আলোগুলো দেখিয়ে বললেন, 'ওগুলো সোডিয়াম ভেপার ল্যাম্প...।'

'ও তাই বলুন। আসলে আমাদের গ্রহের প্রাণীদের ওল্‌ফ্যাক্টরি সেন্স খুব স্ট্রং...।'

ভিকি বুঝতে না পেরে জিগ্যেস করল, 'কী ফ্যাক্টরি বললেন?'

ভিকির বাবা ছেলের মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, 'ওলফ্যাক্টরি সেন্স ভিকি—মানে ঘ্রাণশক্তি।'

আর-ফাইভ হাসলেন ভিকির দিকে তাকিয়ে : 'হ্যাঁ, ভিকিবাবু, ঘ্রাণশক্তি। ওই আলোগুলোর জন্যেই সোডিয়ামের গন্ধ পাচ্ছি। অবশ্য গোল্ডেন ইয়েলো কালারের আলো দেখে আমার আগেই বোঝা উচিত ছিল। এটা সোডিয়ামের সিগনেচার কালার। ফ্লেম টেস্ট করলে ওই সিগনেচার কালারই দেখা যায়—।'

ভিকির বাবা হেলে পড়লেন ভিকির মায়ের দিকে। খুব নীচু গলায় বললেন, 'ব্যাটা সুপারচিটিংবাজ দেখছি! লোককে চিট করার জন্য গুচ্ছের সায়েন্স ফিকশন গল্প মুখস্থ করে এসেছে। একটা অ্যাসিড টেস্ট আমার মাথায় এসেছে। ওই টেস্টেই ঠগটার সব জারিজুরি ফাঁস হয়ে যাবে। আগে দেখি, ব্যাটা কী চায়....কত টাকা চায় ।'

ভিকি ওর বাবার কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে জিগ্যেস করল, 'বাপি, উনি সোডিয়ামের ফ্লেম টেস্ট না কী বলছেন, সেগুলো সত্যি?'

ওর বাবা চাপা গলায় বললেন, 'হ্যাঁ রে, হান্ড্রেড পারসেন্ট সত্যি। মনে হয়, লোক ঠকানোর জন্যে একটু-আধটু ফিজিক্স-কেমিস্ট্রি পড়ে এসেছে.....।'

আর-ফাইভ এইসব পারিবারিক ফিসফিসানিকে আমল না দিয়ে শব্দ করে একবার কাশলেন। তারপর আবার তাঁর কাহিনির খেই ধরলেন।

'আমার সঙ্গে একটা জিয়োগ্রাফিক্যাল ইনফরমেশান সিস্টেম ছিল—জি.আই.এস.। সেই যন্ত্রটাকে ইংরেজিতে প্ল্যানেট মাইক্রোট্র্যাকার বলা যেতে পারে। এই ইন্সট্রুমেন্টটা দিয়ে আমি যে-কোনও অচেনা গ্রহের পথঘাট চিনে নিতে পারি। এ ছাড়া কোনও গ্রহে ল্যান্ড করার আগে আমি সে গ্রহটাকে চুলচেরাভাবে স্টাডি করে নিই। গ্রহের ইতিহাস, ন্যাচারাল রিসোর্সেস, মিনারেল ডিপোজিট, অ্যাটমস্‌ফিয়ার—সব। তারপর স্টাডি করি সেখানকার প্রাণীদের ভাষা, পোশাক, কালচার, চেহারা, যানবাহন—সবকিছু।

'যাই হোক, আমি তো ধরুন আপনাদের হিসেবে...' পকেট থেকে আরও একবার সুপারক্রোনোমিটার যন্ত্রটা বের করলেন আর-ফাইভ। সেটা কিছুক্ষণ দেখে নিয়ে বিড়বিড় করে কী যেন হিসেব করে বললেন, 'আপনাদের হিসেবে প্রায় সাঁইতিরিশ ঘণ্টা হল কলকাতায় নেমেছি। আমার বত্রিশ ঘণ্টা এখানে থাকার কথা ছিল,—অলরেডি পাঁচ ঘণ্টা দেরি হয়ে গেছে। আমার স্পেসক্র্যাফটের অটোমেশান সিস্টেম টাইমার দিয়ে সেটা করা আছে। বারো ঘণ্টা ওভারস্টে হয়ে গেল অটোমেশান সিস্টেমের সেটিংস পালটে যাবে। তখনই হবে বিপদ। হাইপার ড্রাইভ আমাকে হয়তো ভুল পথে নিয়ে যেতে পারে। কারণ, এত দেরি হলে মহাকাশের জ্যোতিষ্কদের রিলেটিভ পজিশান যাবে পালটে...যাকগে, সে অনেক ঝঞ্ঝাটের ব্যাপার। আমি...বুঝতেই পারছেন, সেসব অ্যাভয়েড করতে চাই—।'

আর-ফাইভ একটু থামলেন। ভিকিদের তিনজনের মুখের ওপরে একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন। তারপর ভিকির বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে নীচু গলায় একটু করুন স্বরে বললেন, 'স্যার, আমার হাতে...আপনাদের হিসেবে...আর মাত্র সাত ঘণ্টা সময় আছে। তারপর...বলতে গেলে...আমি...শেষ হয়ে যাব।' গলার স্বরটা কেমন ভারী হয়ে এল ঃ 'আপনি...আপনি...ইচ্ছে করলে আমাকে বাঁচাতে পারেন, স্যার...।'

গল্পখানা ব্যাপক ফেঁদেছেন ভদ্রলোক। ভিকির বাবা মনে-মনে বললেন। খেটেখুটে বিজ্ঞান চর্চা করে গল্পটাকে সায়েন্স ফিকশনের চেহারা দিয়েছেন। আজকাল সিনেমা-টিনেমায় এলিয়েন, ব্ল্যাক হোল, হোয়াইট হোল, অন্য গ্যালাক্সির গ্রিন প্ল্যানেট—এসব ব্যাপারগুলো খুব পপুলার হয়েছে। মনে হচ্ছে, এই লোকটার আই কিউ বেশ হাই। কারণ, হোমওয়ার্কটা সে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে

করে এসেছে।

কিন্তু মাত্র দুটো প্রশ্ন ভিকির বাবা আর-ফাইভকে করতে চান। সেই দুটো প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলেই তার সব জারিজুরি আর ছেলে ভোলানো গপ্পো ধুলোয় মিশে যাবে।

কিন্তু এখন না। একটু পরে সেই দুটো কোশ্চেন করা যাবে। তার আগে দেখা যাক লোকটা কতদূর বাড়তে পারে।

ভিকির বাবা ভিকির কানে-কানে কী যেন বললেন।

তারপর চাপা গলায় ওর মায়ের সঙ্গেও আট-দশ সেকেন্ড কথা বললেন।

আর-ফাইভ সব দেখছিলেন, কিন্তু অনুভূতিহীন পাথরের মূর্তির মতো বসে রইলেন। ওঁর চোখের জ্বলজ্বলে ভাব এখন অনেক কমে এসেছে। চোখের দৃষ্টি এখন কেমন যেন অসহায় দেখাচ্ছে।

পার্কের অন্ধকার যেমন আরও ঘন হয়েছে, তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে বাতাসের ঠান্ডা আমেজটা যেন আরও ঠান্ডা হয়েছে।

ভিকির মনে হচ্ছিল, আচ্ছা, ভদ্রলোকের প্রবলেমটা ঠিক কী? বাপি কিংবা মা সে-কথাটা ওঁকে জিগ্যেস করছে না কেন?

ভিকি মা-কে সেই কথাটাই বলল। মা-ও বোধহয় মনে মনে একই কথা ভাবছিলেন, তাই আর-ফাইভকে করেই বসলেন প্রশ্নটা।

'কিন্তু আপনার প্রবলেমটা এগজ্যাক্টলি কী? আমাদের কাছে আপনি কীসের হেল্প চাইছেন?'

ভদ্রলোক মুখে একবার হাত বুলিয়ে নিয়ে জবাব দিলেন, 'আমার প্রবলেম হল একটা ব্যাটারি। আপনাদের কাছে দশো টাকা সাহায্য চাইছি—ওটা কেনার জন্যে।'

'মানে?' মা অবাক হলেন। বাবাও।

'আমার প্ল্যানেট মাইক্রোট্র্যাকারের ব্যাটারি সাডেনলি ডাউন হয়ে গেছে। অনেক খোঁচাখুঁচি করে দেখেছি—কিছুতেই কাজ করছে না। তাই ব্যাটারিটা না পালটালেই নয়।'

'আপনার ওই প্ল্যানেট কী যেন? —হ্যাঁ মাইক্রোট্র্যাকারের ব্যাটারি খারাপ হয়েছে বলে আপনার যত সমস্যা, তাই তো?'

'হ্যাঁ—।' ভিকির বাবার প্রশ্নে মাথা নেড়ে বললেন আর-ফাইভ।

'কিন্তু সেটা কেন?' বাবা যেন পুলিশি জেরা শুরু করে দিলেন।

'আমার মাইক্রোট্র্যাকার চালু না করতে পারলে আমি আমার স্পেসশিপটাকে

খুঁজে পাব না। জি আই এস সিস্টেম ছাড়া ওটাকে খুঁজে বের করা অসম্ভব। তা হলে আমি দেশে ফিরব কী করে!' আর-ফাইভের শেষ কথাটায় একটা কাতর ভাব টের পাওয়া গেল।

'স্পেসক্র্যাফটটা আপনি রেখেছেন কোথায়?'

'সেটাই তো আমার প্রবলেম। এই শহরেই কোথাও ওটা রেখেছি। সেখানে কয়েকটা বড়-বড় গাছ ছিল...ওইরকম।' বলে পার্কের বড়-বড় গাছের দিকে আঙুল তুলে দেখালেন ভদ্রলোক।

কলকাতার বহু জায়গাতেই ওরকম বড়-বড় গাছ রয়েছে। সব জায়গা পালা করে খুঁজতে গেলে সাত ঘণ্টার অনেক বেশি সময় পার হয়ে যাবে। ভিকির বাবা মনে-মনে ভাবছিলেন। অবশ্য লোকটার গল্প যদি সত্যি হয়।

'আপনার স্পেসশিপটা যদি অন্য কেউ দেখতে পায় তা হলে...যদি কোনও খবর পাওয়া যায়...।' ভিকি হঠাৎ বলে উঠল।

আর-ফাইভ হেসে তাকালেন ভিকির দিকে : 'না, ভিকিবাবু, সেটা সম্ভব নয়। প্রথমত, আমার স্পেসশিপটা অটো-ক্যামুফ্লেজ টাইপের। মানে, যেখানে ওটা রাখা হবে সেই পরিবেশের ওটা রং মিলিয়ে নেবে। তোমাদের গ্রহের কামিলিয়ান—মানে, বহুরূপীর মতো। তাই ওটাকে কেউ দেখতে পাবে না।' একটু থেমে লম্বা একটা শ্বাস ফেললেন ভদ্রলোক। তারপর : 'আর যদিও বা কেউ ওটা দেখতে পায়, তা হলে আমার সঙ্গে কনট্যাক্ট করবে কেমন করে?'

সত্যিই একটা সমস্যা বটে।

ভিকির মা এবার বলে উঠলেন, 'আপনার ওই প্ল্যানেট মাইক্রোট্র্যাকার যন্ত্রটা একবার দেখান তো!'

ভিকি মনে-মনে মায়ের উপস্থিত বুদ্ধির তারিফ করল। ভিকির বাবাও স্ত্রীর দিকে এমন চোখে তাকালেন যার অর্থ, 'ঠিক বলেছ। আমিও ঠিক এই কথাটাই বলতে যাচ্ছিলাম।'

আর-ফাইভ প্যান্টের পকেটে আবার হাত ঢোকালেন। এবার যে-যন্ত্রটা বেরিয়ে এল সেটা দেখতে বেশ লম্বা-চওড়া একটা মোবাইল ফোনের মতো।

সেটা ভিকির মায়ের দিকে এগিয়ে দিলেন, বললেন, 'দেখুন। তবে ব্যাটারি নেই বলে যন্ত্রটা এখন অন করা যাবে না। অন করতে পারলে আপনাদের এর কয়েকটা সুপারস্মার্ট ফিচার দেখিয়ে দিতে পারতাম। নিন, হাতে নিয়ে দেখুন...।'

মা প্রথম যন্ত্রটা হাতে নিলেও ভিকিরা তিনজনেই ওটা হাতে নিয়ে বেশ

ভালো করে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল।

পার্কের কমলা রঙের আলো বেশ জোরালো। ভিকিদের বেঞ্চের কাছাকাছি তিনটে ল্যাম্পপোস্ট রয়েছে। সেই আলোয় ওরা তিনজন যখন যন্ত্রটা পরখ করে দেখছিল তখন আর-ফাইভ চুপ করে ওদের লক্ষ করছিলেন।

যন্ত্রটা দেখতে আধুনিক স্মার্ট ফোনের মতো। রং কালো। বেশ বড় মাপের স্ক্রিন। তবে ওটার গায়ে কোনও কোম্পানির নাম নেই বা কোনও লোগো নেই।

ভিকির বাবা চাপা গলায় স্ত্রী-কে বললেন, 'এটা হয়তো পাতি একটা স্মার্ট ফোন—খারাপ সেকেন্ড হ্যান্ড মাল, কি চাইনিজ মাল। কোম্পানির অকেজো ফোনটাকে প্ল্যানেট মাইক্রোট্র্যাকার বলে আমাদের ব্লাফ দিচ্ছে।'

ভিকির মা বললেন, 'জিনিসটা অন থাকলে বোঝা যেত এটা আসলে সত্যি-সত্যি কী। এখন তো চেক করার কোনও পথ নেই....।

চিটিংবাজির কতরকম যে ফন্দিফিকির বেরিয়েছে আজকাল।' বলে ভিকির বাবা আর-ফাইভ এর দিকে অকেজো ডিভাইসটা বাড়িয়ে দিলেন ঃ 'নিন, রেখে দিন....।'

ভদ্রলোক যন্ত্রটা নিয়ে আবার প্যান্টের পকেটে ঢুকিয়ে রাখলেন। তারপর একটু ইতস্তত করে কাঁচুমাচু মুখে মিনমিন করে জানতে চাইলেন, 'স্যার. তা হলে ওই...ইয়ে, মানে....দুশোটা টাকা...কি দেবেন? আমাকে এই সাংঘাতিক বিপদে কি....একটু হেল্প করতে পারবেন? বুঝতে পারছি, আপনি আমাকে ভিখিরি কিংবা চিট ভাবছেন। কিন্তু বিশ্বাস করুন, আমি সেসব নই। আমি সত্যি সত্যি প্যাক-ফোর প্ল্যানেট থেকে আসছি। প্লিজ....স্যার.....আমাকে ফিরিয়ে দেবেন না....।'

ভদ্রলোকের কাতর অনুনয় বিনয়ের মরিয়া ধরন দেখে ভিকির খুব খারাপ লাগছিল।। যদিও ওর সঙ্গে মা আর বাপি না থাকত তা হলে ও অবশ্যই ভদ্রলোককে যতটুকু পারত ততটুকু হেলপ করত। ভিকি জানে, ওর বাপির কাছে এখন দুশো টাকার চেয়ে অনেক বেশি টাকাই আছে। এমনকী ওর মায়ের কাছেও। কিন্তু ওঁরা দেবেন না। ওঁরা ভাবছেন, এই ভদ্রলোক বেশ চালাক-চতুর একজন ঠগ।

কিন্তু ভিকি এও জানে, ওর বুদ্ধি ভীষণ কম—বাপি আর মায়ের বুদ্ধি অনেক বেশি। বয়েসেও ওঁরা অনেক বড়। সেইজন্যই কি ওঁরা সহজে কোনও কিছু বিশ্বাস করতে চান না?

পার্কে অন্ধকার নামলেও লোকজনের কমতি নেই। তবে ছোট-ছোট ছেলেমেয়েরা এখন নেই। তার বদলে বড়রা স্বাস্থ্যের জন্য হেঁটে বেড়াচ্ছে। ল্যাম্পপোস্টের নীচে বসে দু-দল মানুষ তাস খেলছে। তাদের ঘিরে আরও কয়েকজন বসে আছে। তা ছাড়া এখানে-সেখানে ছোট-ছোট দলে বসে অনেকে আড্ডা মারছে, হাওয়া খাচ্ছে।

ভিকির বাবা ভদ্রলোকের দিকে সামান্য ঘুরে বসলেন। তারপর শক্ত গলায় বললেন, 'দেখুন, আপনার কথা শুনতে গিয়ে আমাদের অনেক দেরি হয়ে গেছে। আপনি যা-ই মনে করুন, আপনার এই গাঁজাখুরি গল্প দিয়ে আপনি আমাদের ঠকাতে পারবেন না। আপনি বরং অন্য কোথাও এই গল্প ফেঁদে টাকা হাতানোর চেষ্টা করুন। আপনাকে আমি বড়জোর কুড়ি টাকা দিয়ে হেল্‌প করতে পারি। আপনার হয়তো খিদে পেয়েছে—কিছু কিনে খেয়ে নিন...।'

কথা বলতে-বলতে ভিকির বাবা পকেট থেকে দুটো দশ টাকার নোট বের করলেন। কপালে ভাঁজ ফেলে হাতঘড়িতে সময় দেখলেন।

ভদ্রলোক দশ টাকার নোটগুলো নেওয়ার জন্য মোটেও হাত বাড়ালেন না। শুধু স্থির চোখে ভিকির বাবার দিকে তাকিয়ে রইলেন। ভিকির মনে হল, ওঁর চোখের কোন যেন চিকচিক করছে। ভদ্রলোক কি কাঁদছেন?

বাবা বললেন, 'কুড়ি টাকা না নেবেন তো না নিন।' নোট দুটো আবার পকেটে ঢুকিয়ে রাখলেন : 'ভাবছিলাম করব না, কিন্তু এখন দেখছি করতেই হবে। দুটো কোশ্চেন। এই দুটো কোশ্চেনের জন্যেই আপনার গল্পটা বারবার...চেষ্টা করা সত্ত্বেও সলিড বেসের ওপরে দাঁড়াতে পারছে না...।'

'কী কোশ্চেন?' চোখের কোণ মুছে আর ফাইভ বললেন।

'বলছি। অনেকক্ষণ ধরে এই প্রশ্ন দুটো আমার মাথায় ঘুরছে। প্রথমে বলুন, আপনার ওই প্যাক-ফোর প্ল্যানেটে সবাই কি আপনার মতো বাংলায় কথা বলে? আর তার মধ্যে অল্প স্বল্প ইংরেজি মেশানো থাকে?'

বাবার বুদ্ধি দেখে ভিকি মনে-মনে বাবার তারিফ করল। সত্যি, এতক্ষণ ধরে ও আর-ফাইভ-এর গল্প শোনায় এতই মশগুল ছিল যে, এই সহজ-স্বাভাবিক প্রশ্নটা ওর মাথায় আসেনি।

ভদ্রলোক কিছুক্ষণ মাথা নীচু করে বসে রইলেন। মনে হচ্ছিল, তিনি এই মোক্ষম প্রশ্নের জুতসই একটা জবাব খুঁজছেন।

অন্তত পাঁচ-সাত সেকেন্ড পর মুখ তুললেন। কেমন যেন আনমনাভাবে ল্যাম্পপোস্টের একটা আলোর দিকে তাকালেন। তারপর ধীরে-ধীরে বললেন,

'ঠিক বলেছেন। এই ব্যাপারটা আমার আগেই এক্সপ্লেইন করা উচিত ছিল। অন্য কোনও প্ল্যানেটে গেলে আমরা টু ওয়ে সেরিব্রাল ট্রানস্লেটার ব্যবহার করি। তাতে ভাষার সমস্যাটা মিটে যায়। এর জন্য ছোট্ট ফুটকির সাইজের একটা মাইক্রোডট আমার মাথায় বসানো আছে। বাইরে থেকে রিমোট ইউনিট দিয়ে ওটার নানান প্রোগ্রাম দরকার মতো অ্যাক্টিভেক্ট করা হয়। তাই অন্য কোনও প্ল্যানেটের ভাষা বলতে বা বুঝতে আমাদের কোনও প্রবলেম হয় না।' একটু থামলেন ভদ্রলোক। মুখ নীচু করে হতাশভাবে এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়লেন। তারপর শব্দ করে শ্বাস ছেড়ে বললেন, 'কিন্তু আপনাকে এসব বলে কী লাভ। আপনি তো এসব বিশ্বাস করবেন না। কারণ, এর কোনও প্রমাণ আমি দিতে পারব না...।'

ভিকির বাবার মুখে বিজয়ীর হাসি ফুটে উঠল। তিনি একবার স্ত্রীর দিকে একবার ছেলের দিকে তাকালেন। যার অর্থ, 'এইবার বাবাজির গাঁজা খুরি গল্প ক্যাচ কট কট।'

ভদ্রলোক বেঞ্চ ছেড়ে উঠে পড়লেন। হেরে যাওয়া সুরে আলতো করে বললেন, 'স্যার, আমি যাই। অন্য কারও কাছে রিকোয়েস্ট করে দেখি। আমার সময় তো একটু-একটু করে কমছে....।'

'কিছু মনে করবেন না।' বাবা সান্ত্বনা দেওয়ার ঢঙে বললেন, 'আপনার গল্পটা বিশ্বাস করতে বেশ কষ্ট হচ্ছে। আপনি যদি সরাসরি হেল্প চাইতেন— সত্যি কথা বলতেন,—তা হলে আপনাকে আমি কুড়ি টাকা নয়, পঞ্চাশ টাকা দিতাম। আপনি...।'

ভদ্রলোক নীচু গলায় বললেন, 'আমার কী দোষ? আমি তো সত্যি কথাই বলছি। জানি না, কী করব এখন...।' তারপর চলে যাওয়ার জন্য পা বাড়ালেন।

'শুনুন—' পিছু ডাকলেন ভিকির বাবা ঃ 'সেকেন্ড যে প্রশ্নটা আমার মাথায় ঘুরছে সেটা আপনাকে বলতে যাচ্ছিলাম। সেটার উত্তর জানতে চাইছিলাম।'

'বলুন—' ভদ্রলোক নিস্তেজ গলায় বললেন।

বাবার মুখে সামান্য তেরছা হাসি দেখতে পেল ভিকি। ও তাকাল আর-ফাইভ-এর দিকে। ইস, ভদ্রলোকের সব কথা যদি সত্যি হত তা হলে কী থ্রিলিং ব্যাপারই না হত! স্কুলে গিয়েও বন্ধুদের বলতে পারত যে, ও একজন এলিয়েনকে সামনাসামনি দেখেছে, তার সঙ্গে কথা বলেছে। তখন বন্ধুরা একেবারে হাঁ হয়ে যেত। বুঝত যে, সত্যি অনেক সময় গল্পকেও ছাপিয়ে যায়।

ভিকির বাবা শান্ত অথচ গম্ভীর গলায় বললেন, 'আপনাদের প্যাক-ফোর গ্রহের প্রাণীদের তো দেখছি হুবহু পৃথিবীর মানুষের মতো দেখতে। বলুন, এ-

কথা কি কেউ এক ফোঁটাও বিশ্বাস করবে?'

ভিকি ভাবল, সত্যিই তো! ও ভদ্রলোকের গল্পে এতটাই ডুবে গিয়েছিল যে, এ-ব্যাপারটাই কথা ওর খেয়াল হয়নি।

মা ভিকির গা টিপে দিয়ে চাপা গলায় বললেন, ' তোর বাপি এবারে সবচেয়ে ভাইটাল কোশ্চেনটা করেছে....!'

ভিকি ঘাড় নেড়ে সায় দিল।

আর-ফাইভ তখন ওর বাবাকে বলছেন, 'আপনি ঠিক প্রশ্নই করেছেন, স্যার। আমাদের গ্রহের প্রাণীরা মোটেই আপনাদের মতন দেখতে নয়। এই যে আমাকে দেখছেন, এটা আমার ছদ্মবেশ। আমি ডেটা কালেকশনের কাজে যখন যে-গ্রহে যাই, সেই গ্রহের বুদ্ধিমান প্রাণীর ছদ্মবেশ নিই। সেইজন্যই আপনাদের এই পৃথিবীতে ল্যান্ড করার সময় আমি মানুষের চেহারার ছদ্মবেশ নিয়েছি আবার সেরকম ড্রেসও পরেছি।'

'এটা আপনার ছদ্মবেশে?' তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে ব্যঙ্গ মেশানো প্রশ্ন ছুড়ে দিলেন ভিকির বাবা।

ভদ্রলোক কিন্তু তাতে কিছু মনে করলেন। বেশ শান্তভাবেই বলে চললেন, 'হ্যাঁ, আমার ছদ্মবেশ। কারণ, প্রত্যেক গ্রহের বুদ্ধিমান প্রাণীদের একটা মেন্টাল প্রবলেম থাকে। মেন্টাল প্রবলেম মানে মেন্টাল ব্লক। তারা নিজেদের চেহারাটাকে এত পছন্দ করে যে, সেটাই তাদের কাছে সেরা চেহারা। তো পৃথিবীর মানুষের—মানে, আপনাদের সেই একই সমস্যা। হাতি, গণ্ডার, কুমির কিংবা জিরাফের চেহারার কোনও বুদ্ধিমান প্রাণীকে আপনারা মেনে নিতে পারবেন না। আবার যদি সেই চেহারাটা এমন হয় যে, আপনারা সে রকম চেহারা আগে কখনও দেখেননি, তা হলে তো আরও একশো গুণ বিপদ।

'আপনাদের চোখে তখন সেটা বিকৃত, বীভৎস, কুৎসিত। সে-চেহারা আপনারা কিছুতেই মেনে নিতে পারবেন না। যেমন ধরুন কুমিরকে কখনও আপনারা সুন্দর বলে ভাবতে পারবেন? কিংবা গণ্ডারকে, বা জিরাফকে? না, পারবেন না।

'সুতরাং আমার আসল চেহারাটা আপনারা মানতে পারবেন না। আপনাদের চোখে সেটা বীভৎস, বিকৃত, কুৎসিত। সেই চেহারাটা দেখলেই আপনারা ঘেন্না করবেন, ভয় পাবেন। আমি জানি। সেইজন্যেই আমি আপনাদের পছন্দের ছদ্মবেশ নিয়েছি, স্যার....।'

আর-ফাইভ কথা শেষ করার পর কিছুক্ষণ সবাই চুপচাপ। ব্যাপারটা এবার

আজগুবি গল্পের সুপার-লেভেল ছাড়িয়ে গেছে।

ভদ্রলোক তো বেশ চালাক! ভিকির বাবা ভাবলেন। যখন যেমন দরকার সেরকম গল্প ফেঁদে বসছেন। ওঁর কোনও কথাই সত্যি না মিথ্যে যাচাই করার কোনও উপায় নেই। এখন যদি ওঁকে আসল চেহারাটা দেখাতে বলা হয় তা হলে ভদ্রলোক নির্ঘাত বলবেন, এখানে সেটা দেখানো সম্ভব নয়। ওঁর ছদ্মবেশটা এমন যে শুধুমাত্র ওঁর ওই প্যাক-ফোর গ্রহে পৌঁছোনোর পরই সেটা ছেড়ে নিজের চেহারায় আসা সম্ভব—নইলে নয়।

ওঃ, আজ সত্যি-সত্যি ভিকির বাবা একজন উপযুক্ত বুদ্ধিমান চ্যালেঞ্জারের মুখোমুখি হয়েছেন! সেই তখন থেকে বুদ্ধির প্যাঁচ কাটাকাটি চলছে তো চলছেই!

ভিকির বাবার কেমন একটা জেদ চেপে গেল। হ্যাঁ, ভদ্রলোককে দুশো টাকাই উনি দেবেন। কিন্তু তার আগে ভদ্রলোককে স্বীকার করতে হবে যে, ওঁর গল্পটা পুরোপুরি মিথ্যে। লোক-ঠকানোর জন্য বানানো এক আজগুবি কাহিনি।

এই জেদটা ভিকির বাবার মাথার ভেতরে ছটফট করছিল। তবুও বাইরে শান্তভাবে বজায় রেখে তিনি বললেন, 'আপনার আসল চেহারাটা একবার দেখান তো!'

'আমার আসল চেহারা দেখাব?' ভদ্রলোক কেমন যেন দিশেহারাভাবে বললেন, 'এখানে? এই পার্কের মধ্যে? না, না, একদম ঠিক হবে না। এ রিকোয়েস্ট আপনি করবেন না। প্লিজ, স্যার...।'

'আপনাকে আমি পুরো দুশো টাকাই দেব। যদি আপনি স্বীকার করেন যে, এতক্ষণ ধরে আপনি আমাদের যে গল্প শোনালেন সেটা আগাপাশতলা হান্ড্রেড পারসেন্ট মিথ্যে। আপনাকে কনফেস করতে হবে যে, আপনি দুশো টাকা হাতানোর জন্যে এই উদ্ভট গল্প ফেঁদেছেন।'

ভিকির বাবার গলায় চোর-ধরা ধমকের সুর ছিল। হয়তো সেইজন্যই ভিকির মনে হল, আর-ফাইভ যেন খানিকটা ঘাবড়ে গেছেন।

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর ভদ্রলোকে বললেন, 'আমি কী কনফেস করব? আমি তো সব সত্যি কথাই বলেছি।'

'ও, তাই বুঝি? তা হলে এখনই আপনি ছদ্মবেশ ছাড়ুন, আপনার আসল চেহারাটা দেখান। তবেই বুঝব, আপনি সত্যি কথা বলছেন, আপনার গল্পের প্রতিটি কথা সত্যি...।' কথা শেষ করতে-করতে উঠে দাঁড়ালেন ভিকির বাবা। মুখ-চোখ দেখে বোঝা যাচ্ছে বেশ উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন।

'এখানে...এই লোকজনের মাঝে...না, না। আমার আসল চেহারা দেখলে

সবাই ভয় পেয়ে যাবে। এ সম্ভব নয়, স্যার।'

'না, আপনাকে আমি ছাড়ছি না।' ভদ্রলোকের ডানহাতটা কবজির কাছে মুঠো করে চেপে ধরলেন : 'কথা দিচ্ছি, দুশো টাকা—দুশো কেন, তিনশো টাকা আপনাকে দেব—।'

আর-ফাইভ বেশ ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছেন, বন্দি ডানহাতটা ছাড়ানোর কোনও চেষ্টা করলেন না। মিনমিন করে বললেন, 'এখানে...এই পাবলিক প্লেসে? আপনি এত জেদ করবেন না, স্যার...।'

ভিকি অবাক হয়ে বাবাকে দেখছিল। বাবাকে এত এক্সাইটেড হতে কখনও দেখেনি ও। মুখ-চোখ কেমন যেন দেখাচ্ছে।

ভিকির মা-ও স্বামীর দিকে তাকিয়ে ছিলেন। যে-একরোখা জেদি ভাবটা ওঁর মুখে ফুটে উঠেছে সেটা ভিকির মা আগে কখনও দেখেননি।

ভিকির বাবা তখন ভদ্রলোককে বলছেন, 'চলুন, ওই গাছগুলোর আড়ালে চলুন। ওখানে আপনি ছদ্মবেশ ছেড়ে আসল চেহারা দেখালে আমি ছাড়া আর কেউ দেখতে পাবে না। তা হলে তো আপনার আর কোনও প্রবলেম হবে না?'

ভিকিদের বেঞ্চের বাঁ-দিকে একটা করপোরেশনের সিংহের মুখওয়ালা কল। কলটা পেরিয়েই সরু পিচের রাস্তা, রাস্তার ওপাশে বড়-বড় চার-পাঁচটা গাছ। আর তাদের পাশে কোমর সমান উঁচু পাতাবাহার গাছের সারি। রাস্তার আলো ওদিকে ছিটকে গিয়ে পড়েছে বটে, তবে অন্ধকারকে খুব একটা তাড়ানো যায়নি।

ভদ্রলোকের হাত ধরা অবস্থাতেই ভিকির বাবা সেই গাছগুলোর দিকে রওনা দিলেন। যাওয়ার আগে ভিকির মায়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তোমরা একটু বোসো, আমি এক্ষুনি আসছি। জাস্ট পাঁচ মিনিট—।'

'ছেড়ে দাও না। কী দরকার এই জেদাজেদি করার!' ভিকির মা বেঞ্চ ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন : 'অনেক দেরি হয়ে গেছে। সাড়ে সাতটায় ভিকির টিউটর আসবেন...।'

ভিকির বাবা ছোট্ট করে হেসে বললেন, 'ডোন্ট উয়ারি। বললাম তো জাস্ট পাঁচ মিনিট। আসলে কী জানো? আমাকে কেউ বোকা বানানোর চেষ্টা করলে ব্যাপারটা আমি ঠিক টলারেট করতে পারি না। চিন্তা কোরো না, কেসটা এখুনি মিটে যাবে...।'

ভিকির বাবা ভদ্রলোককে নিয়ে রওনা হলেন। তখন ভদ্রলোক নীচু গলায় বললেন, 'স্যার, আমি কিন্তু মোটেই আপনাকে বোকা বানাচ্ছি না। আপনি শুধু

শুধু আমাকে সন্দেহ করছেন...।'

ভিকির বাবা ওঁর দিকে আড়চোখে তাকিয়ে বুদ্ধিমানের ভঙ্গিতে হাসলেন : 'হ্যাঁ, বুঝেছি। আপনি সত্যবাদী যুধিষ্ঠির। চলুন...।'

আর-ফাইভের মিনমিনে প্রতিবাদে ভিকির বাবা কোনও আমল দিলেন না। ওঁরা দুজনে বড়-বড় গাছগুলোর আড়ালে চলে গেলেন।

ভিকি আর ভিকির মা অপেক্ষা করতে লাগলেন। ভিকির মা আনমনাভাবে দাঁত দিয়ে বাঁ-হাতের কড়ে আঙুলের নখ কাটতে শুরু করলেন। নজর আলো-ছায়া মাখা গাছগুলোর দিকে।

দু-মিনিট পার হয়েছে কি হয়নি। গাছের আড়াল থেকে এক ভয়ংকর চিৎকার শোনা গেল। বাঁচার মরণপণ ইচ্ছেয় কেউ যেন গলা ফাটিয়ে চিৎকার শোনা গেল। সে-চিৎকারে পার্কের বাতাসে চিড় ধরে গেল। বাতাসের স্তরগুলো কোন এক অজানা কম্পাঙ্কে কাঁপতে লাগল।

পার্কের অনেকেই সেই চিৎকার শুনে চমকে উঠল। কোত্থেকে চিৎকারটা এল সেটা ঠাহর করার চেষ্টা করতে লাগল।

প্রথম চিৎকারটা শুনে ভিকি কিংবা ভিকির মা গলাটা চিনতে পারেননি। শুধু ভয় পেয়ে দিশেহারা হয়ে গিয়েছিলেন।

কিন্তু চিৎকারটা আবার শোনা গেল।

তারপর আবার।

তারপর আরও একবার।

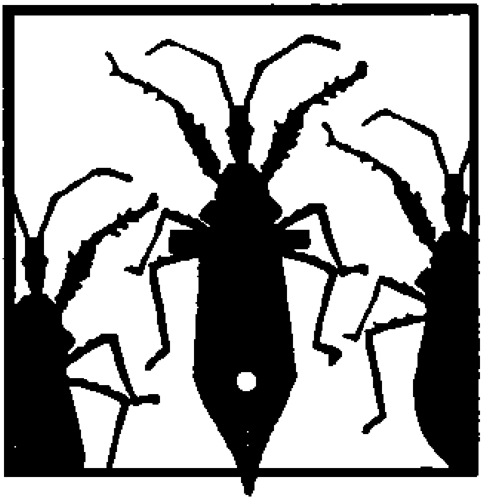
তিনবারের বার গলাটা চিনতে পারল ওরা।

ভিকির মা হাউমাউ করে কেঁদে উঠলেন। ভিকিরও কান্না পেয়ে গেল। ওরা দুজনে বড়-বড় গাছগুলোর দিকে ছুট লাগাল।

যখন ওরা গাছগুলোর কাছাকাছি এসে পড়েছে তখন একটা চশমা, পাতাবাহার গাছের ওপাশে থেকে যেন উড়ে এল। ভিকির পায়ের কাছে এসে পড়ল।

ভিকি সঙ্গে-সঙ্গে দাঁড়িয়ে পড়ল। চশমাটা ভেঙে দু-টুকরো হয়ে গেলেও ও সেটাকে চিনতে পারল।

ঠিক তখনই চিৎকারটা শোনা গেল আরও একবার।



কালো ঘাস ভালো নয়

সবসময় লেখালিখি ভালো লাগে না। তা ছাড়া অনেক সময় এমন হয় যে, শত মাথা খুঁড়েও কোনও নতুন লাগসই আইডিয়া মাথায় আসতে চায় না। একেই বোধহয় 'রাইটার'স ব্লক' বলে।

এইরকম একটা 'বন্ধ্যা' সময়ে ভীষণ পাগল-পাগল লাগছিল। তাই কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে বেরিয়ে পড়েছিলাম। আমার মনে হয়েছিল. একটা গোটা দিন কোনও অজানা অচেনা গ্রাম-গঞ্জে ঘুরে এলে মাথাটা টাটকা বাতাস খেয়ে সাফ হবে। কিন্তু সেইসঙ্গে যে কালোরঙের ঘাসের কথা জানতে পারব, স্বচক্ষে দেখতেও পাব, সেটা ভাবিনি।

হাওড়া স্টেশনে গিয়ে বর্ধমান পর্যন্ত টিকিট কেটে কর্ড লাইনের ট্রেনে উঠে পড়লাম। ঠিক করলাম, ট্রেন চলার সময় জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে যে-জায়গাটা পছন্দ হবে সেখানেই নেমে পড়ব। এবং সেই থিয়োরি ফলো করেই চন্দনপুরে নেমে পড়লাম।

স্টেশনের কাছাকাছি একটা খোলার চালের হোটেলে দুপুরের খাওয়া সেরে নিলাম। হোটেলের তরুণ মালিক কাম বেয়ারা আরিফুলের সঙ্গে গল্প করতে-করতে অনেক গ্রামের নাম শুনে ফেললাম। আমি লেখক মানুষ জানার পর আরিফুল আমাকে নানা গ্রামের নানান অদ্ভুত কাহিনির কথা শোনাতে লাগল।

দোকানে সেসময়টায় খদ্দেরপাতি না থাকায় আমাদের গল্প বেশ জমে উঠেছিল। ওর সঙ্গে কথা বলার সময় আমি গল্পের আইডিয়ার সন্ধানে বলতে গেলে ওত পেতে ছিলাম।

একসময় আরিফুল হঠাৎ করে বলে উঠল, '...তারপর ধরেন আমাগো নকুলচাঁদি গাঁয়ের কথা। সেইহানের কালা ঘাস তো ডেইঞ্জারাস।'

'কালো ঘাস!' অবাক হয়ে গেছি আমি : 'তার ওপর ডেঞ্জারাস? কালো রঙের আবার ঘাস হয় নাকি?'

চোখ বড়-বড় করে ফেলল আরিফুল। দাড়িতে একবার হাত বুলিয়ে বলল, 'হয়, হয়। কালা ঘাস। যাউক গা, ছাড়ান দ্যান...।'

আমি তো 'ছাড়ান' দেওয়ার পাত্র নই। কিন্তু আরিফুল কি ঠিকঠাক বলছে? যদ্দুর জানি, কালো রঙের ঘাস বলে কিছু নেই। যেটাকে 'ব্ল্যাক গ্রাস' বলে সেটা আসলে গাঢ় সবুজ—বা বড়জোর বলা যায় কালচে সবুজ। সেই ঘাসের শিষ আট ইঞ্চির বেশি লম্বা হয় না। যদিও একে ঘাস বলে, কিন্তু সঠিকভাবে বলতে গেলে বলতে হয় 'ঘাসের মতো।' আর নামটাও 'ব্ল্যাক মোন্ডো গ্রাস।'

আরিফুলকে হাজার চাপাচাপি করেও কালো ঘাস সম্পর্কে আর কোনও কথা আদায় করা গেল না। তখন ওর কাছে নকুলচাঁদি গ্রামের হদিস জানতে চাইলাম।

আরিফুল আমাকে হদিসটুকুই শুধু দিল—তার বেশি কিছু নয়। গ্রামটা প্রায় সাড়ে ছ' কিলোমিটার ভেতরে—একটা খাল পেরিয়ে যেতে হয়।

এমন সময় ওর হোটেলে দুজন খদ্দের ঢুকল। আরিফুল দাড়িতে একদফা হাত বুলিয়ে বলল, 'সাবধান থাকবেন, বাবু। ফেরার পথে আমার থনে খাটবেন কিন্তু...।' বলে বেঞ্চে বসা দুজনের কাছে চলে গেল।

ভেবেছিলাম আজই ফিরে যাব, কিন্তু নকুলচাঁদির হদিস জানার পর মনে হল, তেরো কিলোমিটার হাঁটাহাটির ধকলের পর গ্রামে যদি বেশ কিছুটা সময় কাটাতে চাই তা হলে শরীর বিশ্রাম চাইবে। রাতটা হয়তো নকুলচাঁদিতেই কাটাতে হবে। সুতরাং একটা আস্তানা তো চাই!

কিন্তু আমার মতো অচেনা মানুষকে রাতে ঠাঁই দেবে কে? তাই আবার আরিফুলের শরণাপন্ন হলাম। ওকে কাছে ডাকলাম।

ও তখন খদ্দের দুজনের শালপাতার থালায় ডাল দিচ্ছিল। ডালের ডেকচি আর হাতা নিয়েই এগিয়ে এল আমার কাছে।

ওকে সমস্যার কথাটা বলতেই ও মেঘলা আকাশের দিকে কয়েক লহমা তাকিয়ে থেকে তারপর আমার চোখে তাকাল। একটু ইতস্তত করে বলল,

'আমারে কিন্তু দুষ দিবেন না, বাবু। আপনে জিগাইলেন তাই কইতাসি...।'

আমি ওকে অভয় দিয়ে বললাম, 'চিন্তা কোরো না, তোমার কোনও পাপ হবে না। আমিই তো তোমার কাছে জানতে চাইছি...।'

'তাইলে আসল নামডা আপনারে কই। গুপাল মাস্টার। তিনি সব খোঁজ জানেন। তিনিই কালা ঘাসের মালিক।' এ-কথা বলেই আরিফুল পিছন ফিরল। হোটেলের এক কোণে মেঝেতে ছোট-বড় কয়েকটা ডেকচি আর হাঁড়িতে রান্না করা ভাত, তরকারি, ডিমের কারি, মাছের ঝোল এসব রাখা ছিল। আরিফুল সেদিকে চলে গেল। যেতে যেতে বলল, 'কাল যখনই ফিরেন আমার হোটেলে খাইবেন...।'

আমি হোটেলের ছাউনি ছেড়ে কাঁচা রাস্তায় নেমে এলাম। একটা ট্রেনের হুইস্‌ল কানে এল। চোখ তুলে আকাশের দিকে তাকালাম। মেঘের রং আরও গাঢ় হয়েছে। বৃষ্টি নামতে পারে যখন-তখন। নামলে নামুক—আমার ঝোলা ব্যাগে ছাতা আছে। তা ছাড়া বৃষ্টিতে ভিজতে আমার ভালোই লাগে।

সুতরাং হাঁটতে শুরু করলাম।

বর্ষার সময়, তাই চারপাশে মনোহর সবুজ। ভিজে বাতাসে ভিজে গাছের গন্ধ। এ-গাছ থেকে ও-গাছে ছিটকে-ছিটকে পাখি উড়ে যাচ্ছে। তাদের কালো শিলুয়েট দেখে গায়ের রং আঁচ করার উপায় নেই।

রং থেকেই মনে এল কালো ঘাসের কথা। চোখ নামিয়ে পায়ের দিকে তাকালাম।

চলার পথের দু-ধারে সবুজ ঘাস। বর্ষায় শিষগুলো বেশ লম্বা হয়েছে। আর ওদের বৃষ্টি-ধোওয়া চেহারা কী সুন্দর! ছোঁওয়ার জন্যে মন টানে।

আচ্ছা, যদি ওদের রং কোকিলের মতো কালো হত! তা হলে কি ওদের বৃষ্টি-ধোওয়া রূপ আমাকে টানত? হয়তো টানত—নিশির ডাকের মতো। কারণ, আরিফুল বলেছে, কালো ঘাস ডেঞ্জারাস।

চলতে-চলতে কয়েকটা পুকুর, ছোট-ছোট ঘর-বাড়ি চোখে পড়ছিল, একটা পুরোনো মন্দির দেখতে পেলাম। তার যা জরাজীর্ণ দশা তাতে মনে হয় না দেবতা আর পুজো পান—যদি অবশ্য তিনি মন্দিরের ভেতরে এখনও থেকে থাকেন।

মন্দিরের পরেই একটা বেশ বড়সড় মাঠ। মাঠের এক সীমানায় একটা একতলা স্কুল। সাদা রঙের, সারি-সারি ঘর। ঘরে কুচোকাঁচারা বসে আছে। ঘরগুলোর সামনে চওড়া বারান্দা। স্কুলের সামনের মাঠটায় জায়গায়-জায়গায়

বৃষ্টির জল জমে আছে। সেই জলে স্কুল-বাড়ির ঘোলাটে ছায়া দেখা যাচ্ছে।

আর কতদূর নকুলচাঁদি?

শুরু থেকেই নানান লোককে জিগ্যেস করে পথ হাঁটছিলাম। কপাল ভালো যে সকলেই একই দিকে আঙুল তুলে দেখিয়েছে। কিন্তু সাড়ে ছ' কিলোমিটার শেষ হতে আর কতটা পথ বাকি?

একটা বড় গাছের আড়াল থেকে কোকিল ডেকে উঠল। আমার মনে হল, কোকিলটা যেন সাংকেতিক ভাষায় বলে উঠল, দূ-র। দূর। আরও দূর।'

আমি আর একটু জোরে পা চালালাম। নকুলচাঁদি পৌঁছেই আরিফুলের কথা মতো গোপাল মাস্টারমশাইয়ের খোঁজ করব। তিনি নিশ্চয়ই কালো ঘাসের ব্যাপারে অনেক কিছু জানবেন। কারণ, আরিফুলের কথা মতো তিনিই কালো ঘাসের মালিক। যদিও সে-কথার কী যে মানে তা আমি পুরোপুরি বুঝেছি বলে মনে হয় না।

বেলা বারোটার কাছাকাছি নকুলচাঁদিতে পৌঁছলাম। জায়গাটা এখনও শতকরা আশি ভাগ তার গ্রাম্য চেহারা ধরে রেখেছে। গ্রামে ঢোকার মুখেই 'নকুলচাঁদি' লেখা সাইনবোর্ড। সাইনবোর্ডের চেহারা যেমন তোবড়ানো, লেখার অবস্থাও তেমন ক্ষয়াটে। কোনও অক্ষরের সিকিভাগ, তো আর একটার অর্ধেক উধাও। তবে 'চাঁদি' কথাটা বোঝা যাচ্ছে।

একটা চায়ের দোকান চোখে পড়ায় সেখানে গিয়ে বসলাম।

দোকানটার তিন দেওয়ালে অসংখ্য তাপ্পিমারা। কোথাও সিনেমার ফ্লেক্সে নায়ক-নায়িকার মুখের ছবির অংশ, কোথাও বা নীল আর কালো প্লাস্টিকের টুকরো, আবার কোথাও চটের টুকরো সেলাই করা। তা ছাড়া দোকানের কাঠামোটা এমনভাবে পেছনদিকে হেলে রয়েছে যে, মনে হচ্ছে জোরে বাতাস দিলে সবিনয়ে কাত হয়ে পড়ে যাবে।

দোকানের চেহারা যেমন, মালিকের চেহারাও অনেকটা তাই—দোকানের সঙ্গে বেশ মানিয়ে গেছে। চোখে চশমা। খালি গা। রোগা জিরজিরে চেহারা। বুকে অনেক পাকা চুল। মাথায় যদিও কাঁচা-পাকা।

দোকানের সামনে তিনটে প্লাস্টিকের টুল ছিল। তারই একটায় বসে পড়লাম। দোকানদার ভদ্রলোক তোলা উনুনে কড়াই চাপিয়ে কী একটা ঝোল-টোল রান্না করছিলেন। আমাকে দেখেই রুক্ষ গলায় বললেন, 'এখন চা হবে না। ক'টা

বাক্সে ঘড়ি দেখেছেন?'

আমি হেসে বললাম, 'চা না হোক, বিস্কুট তো হবে। আমাকে চারটে বিস্কুট দিন—বড্ড খিদে পেয়েছে—।'

দোকানদার উঠে এলেন। একটা কাচের বোয়েমের প্লাস্টিক ঢাকনা খুলে কালোজিরে খোদাই করা চারটে বিস্কুট তুলে নিলেন। বিস্কুটগুলো আমার হাতে দিতে-দিতে প্রশ্ন করলেন, 'কোত্থেকে আসছেন? কলকাতা?'

আমি ঘাড় নেড়ে বললাম, 'হ্যাঁ।'

বুঝলাম, আমার পোশাকআশাক যতই মামুলি হোক না কেন আমি নকুলচাঁদির পরিবেশে মোটেই মানানসই হয়ে উঠতে পারিনি।

'এখানে কার কাছে এয়েচেন?' দোকানদারের কপালে ভাঁজ পড়েছে, ভুরু কুঁচকে গেছে।

আমি বিস্কুটে কামড় দিয়ে বললাম, 'গোপাল মাস্টারমশাইয়ের কাছে...।'

'গোপাল মাস্টারের কাছে?' ভুরু-টুরু এখনও কুঁচকে আছে। চশমার কাচের ওপর দিয়ে আমাকে তিনি দেখছেন। কী সন্দেহ করছেন কে জানে!

'হ্যাঁ—ওই মাস্টারমশাইয়ের কাছেই এসেছি।'

'কেন? কী দরকারে?' ভদ্রলোক বোধহয় গত জন্মে সি.বি.আই.-তে কাজ করতেন।

আমি যা সত্যি তাই বললাম।

'কালো ঘাসের ব্যাপারে এসেছি। উনিই তো কালো ঘাসের মালিক?'

'কালো ঘাস' কথাটা উচ্চারণ করার সঙ্গে-সঙ্গে 'সি. বি. আই' অফিসারের দাপুটে ভঙ্গি একেবারে চুপসে গেল। জোঁকের মুখে নুন পড়ল যেন।

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর গলা নামিয়ে জানতে চাইলেন, 'আপনি কি রিপোর্টার?'

'না, রিপোর্টার নই—তবে একটু-আধটু লেখালিখি করি।'

'হুঁ—'আমাকে জরিপ করতে লাগলেন। তারপরঃ 'যান, মাস্টারের সঙ্গে দেখা করুন। একটু পাগলাটে, তবে মানুষটা খারাপ না।' একটা লম্বা শ্বাস ছেড়ে বললেন, 'ওই কালো ঘাসই মাস্টারকে পাগল করে দিল। আর ক'টা বছর বাঁচবেন কে জানে...।

এরপর কোথায় গেলে মাস্টারমশাইয়ের দেখা পাওয়া যাবে তার খুঁটিনাটি নিশানা ভদ্রলোক আমাকে বলে দিলেন।

হঠাৎই ঝিরঝির করে বৃষ্টি শুরু হল।

আমি একবার আকাশের দিকে তাকালাম, তারপর বিস্কুটের পয়সা মিটিয়ে ব্যাগ থেকে ছাতা বের করে নিলাম।

ছাতা খুলে রওনা হব, তখন দোকানদার ভদ্রলোক কেমন যেন চাপা গলায় বললেন, 'সাবধানে থাকবেন...।'

আমি পেছন ফিরে ওঁকে একবার দেখলাম। আরিফুলের কথা মনে পড়ল। কিন্তু কৌতূহল অতি বিষম বস্তু। এই বস্তুটির কল্যাণে শত বিপদ জেনেও মানুষ বিপদের দিকে ছুটে যায়। নিশির ডাকের টানের মতো।

মাথা নেড়ে ওঁকে জানালাম যে, আমি অবশ্যই সাবধানে থাকব। তার পর ভেজা কাঁচা রাস্তায় নেমে পড়লাম। মাস্টারমশাইয়ের আস্তানায় পৌঁছতে খুব বেশি হলে আর মিনিট দশেক লাগবে।

ঘন্টি বাজিয়ে দুটো সাইকেল আমার পাশ দিয়ে চলে গেল। যাওয়ার সময় দুজনেই আমার দিকে একবার মুখ ঘুরিয়ে দেখে গেল। হয়তো ভাবল, 'গাঁয়ে এই বিদেশিটা' কে?

মাস্টারমশাইকে যখন খুঁজে পেলাম তখন বৃষ্টি থেমে গেছে, তবে আকাশ মুখ কালো করে থম মেরে আছে।

মাটির বাড়ি। টালির ঘর। চালের ওপরে লতানে কুমড়োগাছ। তাতে দু-চারটে হলদে ফুল ফুটে রয়েছে।

বাড়ি বলতে দুটো ঘর। ঘরের সামনে বড় মাপের উঠোন। বৃষ্টি-ভেজা উঠোনে ডানদিকে একটা টিউবওয়েল। বাঁ দিকে তিনটে সুপুরি গাছ, আর একটা নিম গাছ। গাছগুলোর পাতা থেকে টুপটাপ করে জল ঝরে পড়ছে। সেটাকে ঘিরে বেশ কিছুটা জায়গা সিমেন্ট দিয়ে বাঁধানো।

মাস্টারমশাই ঘরের দাওয়ায় চেয়ারে বসে কী একটা বই পড়ছিলেন। আমি বাখারি দিয়ে ঘেরা সীমানার গেটের কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই তিনি মুখ ফিরিয়ে আমার দিকে তাকালেন।

রোগা শরীর। মাথায় টাক। চোখে চশমা। গায়ে ঘিয়ে রঙের একটা পাতলা কাপড়ের পাঞ্জাবি। তবে পাঞ্জাবিটার সুসময়ের দিনে রংটা সাদা ছিল কি না কে জানে!

পাঞ্জাবির সঙ্গে লুঙ্গি পরেছেন মাস্টারমশাই। নীল আর খয়েরি রঙের চওড়া চেকের লুঙ্গি। দেখেই বোঝা যায়, সেটা ব্যবহারে-ব্যবহারে বেশ পুরোনো

হয়েছে—মানুষটারই মতো।

'মাস্টারমশাই আছেন?' সব বুঝেও সৌজন্যের প্রশ্নটা করলাম।

বৃদ্ধ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। এখন বোঝা গেল, মানুষটা বেশ লম্বা।

হাতের বইটা চেয়ারে উলটে রেখে দাওয়া থেকে নেমে এলেন উঠোনে। তখন খেয়াল করলাম, ওঁর চশমার বাঁ-দিকের কাচটা ঘোলাটে।

সদরের গেটের দিকে কয়েক পা এগিয়ে এসে একটু ঘড়ঘড়ে গলায় বললেন, 'আমিই মাস্টারমশাই—গোপাল মাস্টার। আপনি কে?'

আমি দু-হাত জড়ো করে নমস্কার করে বললাম, 'আপনি আমাকে চিনবেন না, মাস্টারমশাই। আমি কলকাতা থেকে আসছি...আপনার সঙ্গে দেখা করতে...।'

মাস্টারমশাই পালটা নমস্কার জানিয়ে আমাকে ভেতরে ডাকলেন : 'আসুন, আসুন—ভেতরে আসুন—।'

আমাকে নিয়ে দাওয়ায় ওঠার পর চেয়ারটা দেখিয়ে বললেন, 'বসুন।' এবং চেয়ারে রাখা খোলা বইটা হাতে তুলে নিলেন।

ওঁর বসার কোনও চেয়ার বা টুল চোখে না পড়ায় আমি দাঁড়িয়েই রইলাম। মাস্টারমশাই, 'আসছি' বলে সামনের ঘরটায় ঢুকে গেলেন। কিন্তু একটু পরেই আবার বেরিয়ে এলেন।

হাতের বইটা রেখে এসেছেন। তার বদলে ওঁর হাতে একটা পুরোনো বেতের মোড়া। তার নানান জায়গায় বেতের শলা বেরিয়ে রয়েছে।

এমন সময় টিয়া পাখির ডাক কানে এল। ডাকটা এত জোরে আর এত স্পষ্ট যে আমি চমকে উঠলাম. আরও মনে হল, পাখিটা যেন কোনও কথা বলার চেষ্টা করছে।

তখন খেয়াল করে দেখি, দাওয়ার শেষ-প্রান্তে নারকোল গাছের আড়া থেকে একটা তারের খাঁচা ঝুলছে। সেই খাঁচায় একটা চন্দনা পাখি চঞ্চলভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তার দু-ডানায় লাল রঙের ছোপ।

আমার নজর লক্ষ করে মাস্টারমশাই হাসলেন : 'ও কৃষ্ণদাস—আমার বহুদিনের পোষা। বেলা হয়েছে তো, তাই " খেতে দাও, খেতে দাও" বলছে।'

আমি কবজি ঘুরিয়ে ঘড়ি দেখলাম। পৌনে একটা। এখন হয়তো মাস্টারমশাইয়েরও খাওয়ার সময়। সত্যি, বড় অসময়ে এসে পড়েছি!

মাস্টারমশাই আমাকে চেয়ারে বসতে বললেন আবার। নিজে মোড়ায় বসতে-বসতে বললেন, 'চোখের অবস্থা ভালো না। তবু জোর করে পড়ার অভ্যেসটা ধরে রেখেছি—!' একটু থেমে তারপর : 'বলুন, আমার কাছে কী দরকারে

এসেছেন— ।'

আমি চেয়ারে বসে সংকোচের গলায় বললাম, 'কিছু মনে করবেন না— বড় অসময়ে এসে পড়েছি....।'

'তাতে কী হয়েছে?' হেসে বললেন, 'আমার কাছে কেউই খুব একটা আসে না। গাঁয়ের মানুষ-জনও আমাকে এড়িয়ে চলে।'

'আপনি ইচ্ছে করলে দুপুরের খাওয়া সেরে নিতে পারেন।' ইতস্তত করে বললাম, 'আমার তো এখানে কেউ চেনা নেই যে তাদের বাড়িতে ঘন্টাখানেক কাটিয়ে পরে আপনার সঙ্গে এসে দেখা করব। আমি বরং এই দাওয়ায় বসে ওয়েট করছি, আপনি স্নান খাওয়াদাওয়া সেরে নিন...।'

আবার হাসলেন গোপাল মাস্টারমশাই : 'এসব শহুরে ভদ্রতা মুছে ফেলুন। আমাদের নকুলচাঁদিতে এক-দু মিনিটের পরিচয়েই একজন আর একজনের আত্মীয় হয়ে যায়। তাই ওসব ছেড়ে বলুন তো কী দরকারে এসেছেন—।'

আমি কথাটা বলব কি বলব না ভেবে কিছুক্ষণ চুপ করে রইলাম। এভাবে হুটহাট করে এসে কালো ঘাস নিয়ে কথা তুললে গোপালবাবু কী মনে করবেন কে জানে!

বৃষ্টি আবার শুরু হয়ে গেছে—তবে তেমন জোরে নয়। কাছাকাছি কোনও গাছ থেকে কোকিলের ডাক শোনা গেল। চারপাশে বর্ষার ঘোর সবুজ গাছপালা। সামনের কাঁচা রাস্তায় বৃষ্টির জল জমে আছে। তার পাশে প্যাচপ্যাচে কাদা। কাদার মাঝে পা ফেলার জন্যে পাঁচটা ইট পরপর সাজানো।

মাস্টারমশাইয়ের মুখের দিকে তাকালাম। শিথিল, কপালে বয়েসের অনেক ভাঁজ। কপালের ডানদিকে একটা ছোট আব উঁচু হয়ে আছে। গাল আর চিবুকের নীচে দু-তিন দিনের না-কামানো খোঁচা-খোঁচা সাদা দাড়ি।

আমি এবার আমার পরিচয় দিলাম। বললাম যে, কলকাতায় থাকি, সেখানেই একটা বেসরকারি ব্যাঙ্কে চাকরি করি। মাঝে-মাঝে নিজের খেয়ালে অজানা-অচেনা গাঁয়ে ঘুরতে চলে যাই। সামান্য লেখালিখির শখ আছে—কবিতা কিংবা গল্প লেখার ভূত হঠাৎ-হঠাৎ মাথায় চেপে বসে।

'তো আপনার এই নকুলচাঁদিতে এসে কালো ঘাসের কথা শুনলাম। শুনলাম যে, আপনি সেই কালো ঘাসের মালিক। কালো ঘাসের কথা শুনে প্রথমেই মনে হল, ব্যাপারটা নেহাতই গালগল্প। ঘাস কখনও কালো হতে পারে না। কিন্তু একইসঙ্গে, মাস্টারমশাই, কৌতূহলও হচ্ছিল। তখন সেই টানে টানে আপনার কাছে চলে এসেছি। এখন জানি না কী করব। যদি ব্যাপারটা ফালতু

গাঁজাখুরি হয় তা হলে কিছু মাইন্ড করবেন না। আমি আপনার সময় নষ্ট....'

মাস্টারমশাই বৃষ্টির দিকে তাকালেন। চশমার একটা কাচে ঘোলাটে আলো ঠিকরে যাচ্ছিল। আমার কথা শেষ হওয়ার আগেই হেসে উঠলেন। তারপর আমার দিকে তাকালেন ঃ 'গাঁজাখুরি গালগল্পই বটে। কালো ঘাস! আমার জীবনের কালো অভিশাপ। হ্যাঁ—আমিই সেই অভিশাপের মালিক। তাই আমার কাছে কেউ ঘেঁষে না।' একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল মানুষটার রোগা শরীর থেকে ঃ 'বলুন, কী জানতে চান?'

আমি ভেতরে-ভেতরে এক্সাইটেড হয়ে পড়ছিলাম। মাস্টারমশাইয়ের কথা শুনে মনে হল, কালো ঘাসের ব্যাপারটা সত্যি-সত্যি সত্যি।

চন্দনা পাখিটা খিদের চোটে আবার একদফা চেঁচিয়ে উঠল। গোপাল মাস্টারমশাই ঘাড় ঘুরিয়ে একবার পাখিটার দিকে দেখলেন। তারপর তাকালেন আমার দিকে। কিন্তু ওঁকে দেখে মনে হল উনি অনেক দূরে দৃষ্টি মেলে দিয়ে কিছু একটা দেখার চেষ্টা করছেন।

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর গোপালবাবু বললেন, 'আপনাকে একটা অনুরোধ করছি—দয়া করে ফেলবেন না। আপনাকে আমি সব বলব। এত বছর ধরে সেই সব অদ্ভুত কাণ্ডকারখানার কথা আমি কাউকে বলিনি। আমার কোনও দোষ নেই, কিন্তু তবুও সবাই আমাকে দাগি করে দিল, অচ্ছুৎ করে দিল। আমি...।'

আমি কী বলব ভেবে পেলাম না। কিন্তু ওঁর রিকোয়েস্টটা কী?

'আপনাকে আমি সব বলব, তবে আর আগে আমার সঙ্গে বসে আপনাকে দুটি অন্ন গ্রহণ করতে হবে...।'

'না, না, সে কেমন করে হয়? আমি আচমকা এসে পড়েছি—বিনা নোটিশে। তা ছাড়া আমাকে আপনি চেনেন না...।'

'ওসব আপনাকে চিন্তা করতে হবে না। ভাত, ডাল, আলুসেদ্ধ, ঘি, আর কাঁচা লঙ্কা। আমার নিজের হাতে রান্না। সংসারে আমি একা মানুষ—একেবারে একা। আজ কোনও সঙ্গী নিয়ে খেতে বসলে আমার খুব ভালো লাগবে, নইলে সবসময় তো ওই কৃষ্ণদাসকে পাশে নিয়ে খেতে বসি। যাকগে, কিচ্ছু ভাববেন না। রান্না যা আছে তাতে আমাদের দুজনের দিব্যি হয়ে যাবে...।'

অগত্যা কী আর করা!

দাওয়াতেই আমরা দুজনে পাশাপাশি খেতে বসলাম।

বাইরে বৃষ্টি ঝরে পড়ছে। কলাপাতায় ধোঁয়া ওঠা গরমভাত, ঘি, আলুসেদ্ধ,

মুগের ডাল, আর তার সঙ্গে কাঁচা লঙ্কা। এই সাধারণ খাবার সেই ভেজা দুপুরে কী করে যেন অসাধারণ হয়ে উঠল।

খেতে-খেতে গোপালবাবু বললেন, 'এই বাড়ির পেছনে আমার একফালি জমি আছে। সেখানে চাষবাস কিছু হয় না—শুধু আগাছার জঙ্গল....আর কালো ঘাস। যার জন্যে সবাই বলে, আমি কালো ঘাসের মালিক। খাওয়া হয়ে যাক, তার পরে আপনাকে ওই কালো ঘাস দেখাব। তার আগে শুনিয়ে দেব ওই ঘাসের কাহিনি।'

খাওয়াদাওয়া শেষ হলে পর গোপাল মাস্টারমশাই সেই কাহিনি আমাকে শুনিয়েছিলেন।

শোনার পর আমার স্পষ্ট মনে হয়েছিল, এ-কাহিনি কিছুতেই সত্যি হতে পারে না। আবার মাস্টারমশাইকে দেখে মনে হয়েছিল, উনি কিছুতেই মিথ্যে কথা বলার মানুষ হতে পারেন না।

বহুদিন আগে এই কাহিনি শুনলেও আজও আমার মধ্যে বিশ্বাস-অবিশ্বাসের টানাপোড়েন চলছে।

বেশ কয়েকবার গলখাঁকারি দিয়ে কেশে নিয়ে তারপর গোপাল মাস্টারমশাই ওঁর কাহিনি শুরু করেছিলেন।

এই যে আমার বাড়ি দেখছেন, এটাই আমার সাতপুরুষের ভিটে। আজ থেকে পঞ্চান্ন-ছাপ্পান্ন বছর আগে আমাদের এই বাড়ি লোকজনের হাঁটাচলা, কথাবার্তা আর হাঁকডাকে গমগম করত। আর এখন? এখন আমি একা—শিবরাত্রির বুড়ো সলতে। আজ আছি, কাল নেই।

আমার এই টালির ঘরজোড়ার পেছনে তখন আরও চার-চারখানা বিশাল-বিশাল ঘর ছিল। আমাদের সঙ্গে থাকত আরও দু-কাকার পরিবার। তাদের মোট সাতজন ছেলে-মেয়ে। আর আমি, আমার ছোটবোন মিলে আমাদের সংসার ছিল চারজনের। তা হলে ছোট-বড় মিলিয়ে মোট কজন হল? পনেরোজন। পনেরো জনের একান্নবর্তী পরিবার।

আমাদের বিঘে-বিঘে চাষজমি ছিল। আমার বাবা চন্দনপুরের প্রাইমারি স্কুলে বাংলার মাস্টারমশাই ছিলেন। তিনি অপঘাতে মারা গেলে সেই চাকরিটা আমি পেয়েছিলাম। ছোটবেলায় ওই প্রাইমারি স্কুলেই আমি পড়েছি।

স্কুলে চাকরির সময়টুকু ছাড়া বাবা চাষবাসের কাজ করতেন। দিন-রাত

পরিশ্রম করতেন। আর তাঁর সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে খাটতেন আমার দু-কাকা।

আমরা ভাই-বোনেরা মিলে বেশ ভালোই ছিলাম। অল্প পড়াশোনা, আর বেশি খেলা—এটাই ছিল আমাদের জীবন।

গাছে চড়া, আম-লিচু-পেয়ারা গাছ থেকে পেড়ে খাওয়া, ঘুড়ি ওড়ানো, ফুটবল খেলা, ক্রিকেট খেলা, ডাণ্ডা-গুলি খেলা—কিছুই বাদ ছিল না, অবশ্য মাঝে মাঝে আমরা চাষের কাজও করতাম। বলদের লেজ পাকিয়ে দিতাম, ধান ঝাড়াইয়ের কাজ করতাম। বেশ কেটে যাচ্ছিল দিনগুলো।

আমাদের একটা বড়সড় ইঁদারা ছিল। কুয়োটা—মানে, ইঁদারাটা বেশ গভীর। আমার ঘরের পেছনের ওই পতিত জমিতেই ছিল ওটা। অবশ্য তখন জমিটা পতিত ছিল না। কুয়োতলার বাঁধানো চাতালটা ছিল একপাশে। তার বাকি জমিটায় ফুলকপি, বেগুন, টমেটো, ঝিঙের চাষ হত। তবে কুয়োতলার পাশাপাশি বেশ কয়েকটা গাছ ছিল।

আমার বয়েস তখন চোদ্দো কি পনেরো। সময়টা ছিল ঘোর বর্ষাকাল। সন্ধে সাতটা কি সাড়ে সাতটা হবে। ঝমঝম করে বৃষ্টি হচ্ছিল। ব্যাঙের ভারী আর কর্কশ ডাকে কান ঝালাপালা হয়ে যাচ্ছিল। তার সঙ্গে ঝিঁঝির ডাক।

আমি আর ছোট বোন আমাদের ঘরে বসে পড়াশোনা করছিলাম। বৃষ্টির জন্যে, জানলা বন্ধ থাকলেও পাল্লার ফাটল দিয়ে বাইরের অন্ধকার দেখা যাচ্ছিল, আর বৃষ্টির মিহি ছাট ঘরে ঢুকে পড়ছিল। সেইসঙ্গে মেঘের গম্ভীর ডাক।

এমন সময় একটা সোঁ-সোঁ শব্দ শুনতে পেলাম। কালীপুজোর বাজি পোড়ার সোঁ সোঁ শব্দের মতো। আর তার সঙ্গে চোখ ধাঁধানো আলো ঝলসে উঠল। আমরা ভাবলাম এখুনি বুঝি বাজ পড়ার শব্দ শোনা যাবে। তাই আমি আর বোন দু-কানে হাত চাপা দিয়েছিলাম। কিন্তু বাজ পড়ার কোনও শব্দ পেলাম না। তার বদলে অন্যরকম একটা শব্দ শুনতে পেলাম। যেন একটা বিশাল মোটরগাড়ি ইঞ্জিনের গরগর শব্দ করে তিরবেগে ছুটছে।

তারপরই একটা 'ঝপাং'—যেন জলের মধ্যে কোনও ভারী জিনিস আছড়ে পড়ল। আর দেরি নয়। বই-টই ফেলে আমরা দুজনে ছুট লাগালাম বাইরে. বাবা আর মা-কে ডাকাডাকি করে খুঁজে না পেয়ে শেষ পর্যন্ত আমরা হাজির হলাম গিয়ে কুয়োতলায়।

সেখানে তখন বড়দের ভিড়। তবে ছোটরাও পিছিয়ে নেই—একে একে এসে জড়ো হচ্ছে। কারও-কারও মাথায় ছাতা, আর বাকিদের মাথায় বৃষ্টি। সকলে

নানান কথা বলছে। বেশ একটা কলরব তৈরি হয়েছে কুয়োটাকে ঘিরে।

বাবাকে দেখতে পেলাম। একহাতে ছাতা, একহাতে টর্চ। টর্চের আলো কুয়োর জলের দিকে। ছোট কাকারও হাতে টর্চ, তবে মাথায় ছাতা নেই। টর্চের আলোয় কুয়োর ভেতরটা দেখতে চেষ্টা করছেন। মা-কাকিমারা হ্যারিকেন হাতে সেখানে হাজির হয়েছেন। পুরুষদের আশপাশ দিয়ে উঁকি ঝুঁকি মারার চেষ্টা করছেন। আর ছোটদের তাড়া দিয়ে, ধমক দিয়ে ঘরে চলে যেতে বলছেন, বৃষ্টিতে ভিজতে বারণ করছেন। কিন্তু ছোটরা সেসব কথা শুনলে তো! কারণ, গ্রামে একঘেয়ে সাদামাঠা জীবন। সেখানে হঠাৎ করে কোনও রোমাঞ্চকর ঘটনা ঘটে গেলে ছোট-বড় সকলেই তার স্বাদ নিতে চায়!

আমাদের ইঁদারার পাড় বাঁধানো ছিল—যেমনটা হয় আর কী! তবে কপিকলের কোনও ব্যবস্থা ছিল না। কুয়োতলাটাও বাঁধানো ছিল—স্নান করা, কাপড় কাচা, বাসনপত্র খোয়ার জন্যে। আর বাঁধানো চাতালের পর থেকে কুয়োর দুপাশে প্রচুর গাছপালা ছিল, তবে তার মধ্যে বেশিরভাগই কলাগাছ।

বাবা কাকাদের সঙ্গে নানান কথাবার্তা বলছিলেন আর টর্চের আলো ঘুরিয়েফিরিয়ে সব দিকে দেখছিলেন। সেই আলোয় দেখলাম, কুয়োর পাড়টা পুড়ে ঝামা, আর তাতে তিন-চারটে বড়-বড় ফাটল। দু-জায়গায় পাড়ের কিনারার দু-খাবলা কোথায় যেন খসে পড়ে গেছে। এ ছাড়া পাঁচ-ছ'টা কলাগাছ ঝলসে পুড়ে শুকিয়ে কালো দড়ি হয়ে গেছে।

সকলের কথাবার্তা শুনে যেটা জানতে পারলাম সেটা হল, ওই অদ্ভুত ঘটনাটা স্বচক্ষে দেখেছেন, তিনজন ঃ আবার বাবা, মেজোকাকা আর ছোট কাকিমা। ওঁদের টুকরো-টুকরো কথাগুলো জুড়ে ঘটনাটা আঁচ করা গেল।

অন্ধকারে হঠাৎই একটা আগুনের পিণ্ড দেখা যায় আকাশে। দুরন্ত গতিতে সেটা ছুটে আসছে নীচের দিকে। তারপর নিমেষের মধ্যে সেটা প্রচণ্ড সোঁ সোঁ শব্দে চারপাশ জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ঢুকে যায় ইঁদারার ভেতরে। ওটার আঁচেই কলাগাছগুলো পুড়ে গেছে, ইঁদারার পাড় পুড়ে ঝামা, আর পাড়ে ফাটল ধরেছে।

বাবা ইঁদারার জলের দিকে টর্চের আলো ফেলে কিছুক্ষণ দেখলেন তারপর কাকা-কাকিমাদের বললেন, ইঁদারার জল টগবগ করে ফুটছে।

অথচ তখন ঘটনার পর অন্তত পনেরো কুড়ি মিনিট কেটে গেছে!

আর কিছু হওয়ার নেই, দেখে আমরা সবাই ফিরে এলাম—যে যার ঘরে চলে গেলাম। বৃষ্টি তখন অনেকটা কমে গেছে। মেঘের ডাকও আর শোনা যাচ্ছে না।

পরদিন সকালে আবার আমরা কুয়োতলার ভিড় জমালাম। না, নতুন কিছু আর দেখতে পেলাম না—সবকিছু কাল রাতের মতোই। এমনকী কুয়োর জলও কাল রাতের মতোই ফুটছে।

এই শেষের ব্যাপারটাই সবাইকে অবাক করে দিল।

বাবা বললেন, উনি কাল সন্ধেবেলা দাওয়ায় বসে সার মেশাচ্ছিলেন। তখন আগুনের গোলাটা বাবা দেখেছেন। সেটা নিশ্চয়ই একটা খসে-পড়া-তারা। মানে, উল্কাপিন্ড। সেটা মারাত্মক গরম ছিল ঠিকই। সেজন্যে কাল রাতে অনেকটা জল ধোঁয়া হয়ে উবে গেছে। কিন্তু আজ সকালের মধ্যে তো বাকি জল ঠান্ডা হয়ে যাওয়ার কথা! অথচ ইঁদারার জল এখনও ফুটছে।

আমরা তিন-তিনটে দিন কুয়োর জল থেকে দূরে থাকলাম। স্নান-টান সব টিউবওয়েলের জলে সেরে নিলাম। কিন্তু চার নম্বর দিনেও দেখলাম, কুয়োর জল ফুটছে। অবশ্য 'ফুটছে' মানে টগবগ করে ফুটছে এমন নয়—তবে জলের ওপরটা খুব অস্থিরভাবে ছটফট করছিল। ছোট-ছোট ঢেউ কুয়োর দেওয়ালে ঝাপটা মারছিল। ব্যাপারটা অনেকটা কড়াইয়ে ডালের মধ্যে কাঁটা ঘোরালে যেমনটা হয়, সেইরকম।

আমরা সবাই খুব তাজ্জব হয়ে গেলাম। গাঁয়ের অনেকেই এই অদ্ভুত কাণ্ড দেখতে এল। তাদের কেউ-কেউ বলল, কুয়োর জলের ভেতরে অপদেবতা ঢুকে পড়েছে। অথচ আমরা ভেবে পেলাম না, অত টগবগে গরম উল্কায় চেপে অপদেবতা কেমন করে আকাশ থেকে মাটিতে নেমে আসবে।

ইঁদারার জলের ঢেউ, ছলাৎ-ছলাৎ করে কখনও বাড়ে, কখনও কমে—কিন্তু কখনও থামে না।

দশ দিন ধরে অসুবিধে সওয়ার পর এগারো দিনের দিন বাবা-কাকারা মিলে অনেক আলোচনার পর ঠিক করলেন, কুয়োর জল ব্যবহার করে দেখা যাক তাতে কোনও সমস্যা হয় কি না।

বড়রা খুব সাবধানে কুয়োর জল ধাপে-ধাপে পরীক্ষা করে দেখলেন, নাঃ, তাতে ভয়ের কিছু নেই। তবে বাড়ির সবাইকে বারবার করে বলে দেওয়া হল, কেউ যেন ভুল করেও কুয়োর জল মুখে না তোলে।

এইভাবে আমাদের ইঁদারার 'ফুটন্ত' জল আমরা ব্যবহার করা শুরু করলাম।

কয়েকদিনের মধ্যেই একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটল।

ছোটকাকা বেলা একটার সময় ইঁদারায় স্নান করতে গিয়েছিলেন। সেখানে বালতি-দড়ি দিয়ে জল তুলছিলেন, হঠাৎই দড়ি ছিঁড়ে বালতিটা জলে ডুবে গেল।

তখন ছোটকাকা ঘরে গিয়ে বালতি তোলার কাঁটা আর দড়ি নিয়ে এলেন। তখনকার দিনে প্লাস্টিকের বালতি তো আর ছিল না, সবই লোহার বালতি। বালতি কুয়োয় ডুবে গেলে যে-কাঁটা দিয়ে বালতি জল থেকে খুঁজে পেতে তোলা হত সেটা দেখতে অনেকটা মাকড়সার মতো। চারটে বড়-বড় বঁড়শির মতো কাঁটা একটা লোহার আংটায় লাগানো। সেইটা দড়িতে ঝুলিয়ে মেঝেতে ফেললে চারটে কাঁটা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে—ঠিক চার পা-ওয়ালা মাকড়সার মতো।

তো ইঁদারার জলে কাঁটা ডুবিয়ে দিয়ে ছোটকাকা দড়ি ছাড়তে লাগলেন। খুব লম্বা দড়ি, কিন্তু সেটা পুরোপুরি খরচ করেও কাঁটা কুয়োর একেবারে তলায় পৌঁছোল বলে মনে হল না। ছোটকাকা বালতির খোঁজে হাত নাড়িয়ে-নাড়িয়ে কাঁটা এপাশ-ওপাশ করছিলেন। কাঁটাগুলো যদি বালতির নীচের দিকের লোহার বেড়ের খাঁজে একবার আটকে যায় তা হলেই দড়ি টানলে বালতিটা উলটো হয়ে জল থেকে উঠে আসবে। আর কপালগুণে যদি একটা কাঁটা কোনওরকমে বালতির হাতলে আটকে যায় তা হলে তো কথাই নেই! শুধু বালতিটা সোজা হয়ে থাকায় সেটা জলে ভরতি হয়ে থাকবে। সেইজন্যেই বালতি তোলার কাঁটার দড়িটা বেশ শক্তপোক্ত আর মোটা হয়। মনে রাখবেন, সেসময়ে কিন্তু নাইলনের দড়ির চল শুরু হয়নি।

ছোট কাকা অনেক কসরত করেও বালতি তুলতে পারছেন না দেখে মেজোকাকা কখন যেন কুয়োতলায় চলে এসেছিলেন। 'দে, আমাকে দে—' বলে তিনি ছোটকাকার থেকে দড়ির শেষ প্রান্তের গিঁট পাকানো অংশটা হাতে নিয়েছিলেন। এবং বালতির খোঁজ শুরু করেছিলেন।

বঁড়শিতে মস্ত বড় মাছ গেঁথে গেলে হঠাৎ যেমন ঝটকা লাগে, সেরকমই একটা ঝটকা পড়ল রশিতে। সেই ঝটকা টানে আর একটু হলে মেজোকাকা ইঁদারার ভেতরে হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাচ্ছিলেন। ছোটকাকা চিৎকার করে মেজোকাকার কোমর জাপটে ধরলেন। তারপর ওঁরা দুজনে মিলে দড়ি টানাটানির লড়াইয়ে শামিল হয়ে গেলেন।

ইঁদারার ভেতরে জলের গভীরে কী ছিল জানি না—বা কে ছিল জানি না। কিন্তু ওদিকের প্রবল টানে আমার দুই কাকা একেবারে নাস্তানাবুদ হয়ে যাচ্ছিলেন। ওঁরা এমন চিৎকার জুড়ে দিয়েছিলেন যে, বাবা-মা-কাকিমা আর ছোটরা সব কুয়োতলায় ছুটে এসেছিল।

কুয়োর জলের দিকে তাকিয়ে আমি একপলকের জন্যে দেখেছিলাম, জলের মধ্যে উথালপাথাল চলছে, জল এদিক-ওদিক ছিটকে গিয়ে ইঁদারার দেওয়ালে

লাগছে। এর বেশি কিছু দেখার আগেই বাবা হাত ধরে টেনে আমাকে কুয়োর পাশ থেকে দূরে সরিয়ে দিলেন। তারপর ওঁরা তিন ভাই মিলে দড়ি টানাটানির লড়াই চালাতে লাগলেন।

এক-দু-মিনিটের মধ্যেই বাবা-কাকারা হাঁপিয়ে উঠলেন। মা আর কাকিমারা বারবার চিৎকার করে নিজের-নিজের স্বামীকে বলছিলেন, 'ছেড়ে দাও! দড়ি ছেড়ে দাও!'

এইরকম একটা সংকটের মুহূর্তে অত মোটা কাছিটা ছিঁড়ে গেল। বাবারা তিন ভাই ছিটকে পড়ে গেলেন কুয়োতলায়।

নিজেদের সামলে নিয়ে হাঁপাতে-হাঁপাতে ওঁরা দড়ির ছেঁড়া প্রান্তটা পরীক্ষা করে দেখলেন। যে-জায়গাটায় দড়িটা ছিঁড়েছে সে-জায়গাটা মোটেই রোঁয়া ওঠা কমজোরি ছিল না। তা হলে কি দড়িটা কেউ আচমকা কেটে দিয়েছে? এমন কেউ, যে ইঁদারার জলের ভেতরে ডুবসাঁতার কেটে চলেছে? একটানা এত দিন ধরে?

ইঁদারার জলে তখনও আলোড়ন চলছে।

বড়দের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, ওঁরা সবাই কেমন যেন হতভম্ব হয়ে গেছেন। সেইসঙ্গে ভয়ও পেয়েছেন। তবে অন্য সবাই পিছিয়ে গেলেও বাবা পুরোপুরি হার মানেননি। তখনকার মতো কুয়োতলা থেকে সরে এলেও ওঁর যুক্তিবাদী মনে অশান্তি চলতে লাগল।

রোজ রাতে এই ব্যাপারটা নিয়ে মায়ের সঙ্গে বাবা অনেক কথা বলতেন। অনেক সময় নাকি উল্কার টুকরোর সঙ্গে ভিনগ্রহের কোনও অজানা প্রাণের বীজ পৃথিবীতে চলে আসে। তারপর পৃথিবীর জল-হাওয়ার সঙ্গে খাপ খাওয়াতে না পেরে মারা যায়। কিন্তু যদি কোনও বীজ পৃথিবীর পরিবেশে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারে, সেখানে টিকে যায়, তা হলে তার বেড়ে উঠতে অসুবিধে কোথায়! আর অজানা প্রাণী হলে তার বেড়ে ওঠার ব্যাপারটা অন্যরকম হতে পারে। খুব তাড়াতাড়ি সেটা বেড়ে উঠতে পারে, অথবা খুব ধীরে ধীরে।। সেই প্রাণীটা কেমন, আমরা জানি না হয়তো স্থলচর, কিংবা জলচর। আবার পাখির মতো হতে পারে, কিংবা ব্যাঙের মতো উভচরও হতে পারে।

আমাদের ইঁদারাটার মধ্যে যদি কোনও ভিনগ্রহী এখনও বেঁচেবর্তে থাকে, তা হলে সে অবশ্যই জলচর কিংবা উভচর

বাবা এসব উলটোপালটা ভাবলেও সেসব আমাদের মনে ধরেনি। দু-কাকা স্পষ্টই বাবার মুখের ওপর বলে দিলেন, ওঁরা ব্যাপারটাকে অলৌকিক —মানে,

কোনও অপদেবতার কাণ্ড বলেই মনে করছেন।

একদিকে এসব তর্কবিতর্ক চলতে লাগল, আর অন্যদিকে ইঁদারাটাকে আমরা এড়িয়ে চলতে লাগলাম। শুধু বাবা-কাকারা মাঝে-মাঝে কুয়োতলায় যেতেন, কুয়োর ভেতরে উঁকিঝুঁকি মারতেন।

আমাদের বালতি ডুবে যাওয়া এবং তারপর কাঁটার দড়ি কেটে বা ছিঁড়ে যাওয়ার ঘটনা গাঁয়ে বেশ ছড়িয়ে পড়েছিল। সেই ছড়িয়ে পড়া কাহিনিটি শুনে একদিন সকালে মামুদ আলম আমাদের বাড়িতে এসে হাজির। সে নাকি ইঁদারার ভেতরে নেমে আমাদের হারানো বালতি 'উদ্ধার' করে দেবে।

মামুদ আমাদের গাঁয়ের হাট্টাকাট্টা জোয়ান ছেলে। চাষবাস করে খায়। আর সময়-সুযোগ পেলেই গাঁয়ের লোকের উপকার করে। বাবা মামুদকে ভালোই চেনেন।

মামুদ বলল, বালতি খোঁজার জন্যে ওকে কোনও টাকাপয়সা দিতে হবে না। কারণ, ওর বন্ধুরা ওর সঙ্গে কুড়ি টাকা বাজি ধরেছে—আমাদের বালতিটা যদি ও খুঁজে দেয় তা হলে বন্ধুরা চাঁদা তুলে ওকে বিশ টাকা দেবে। আর মামুদ যদি ওটা তুলতে না পারে তা হলে মামুদকে পালটা একটি পয়সাও দিতে হবে না।

মামুদ ডাকাবুকো ছেলে। ভূতের ভয়-টয় কাকে বলে জানে না। তাই বাবা-কাকার অনুমতি নিয়ে ও কাজে নেমে পড়ল।

মামুদ জামা-টামা সব খুলে ফেলল। একটা গামছা নিয়ে ল্যাঙটের মতো টাইট করে বেঁধে নিল। তারপর কুয়োর পাড়ে চড়ে বসল।

মামুদের শরীর যেন কালো পাথরে খোদাই করা। মাথায় কোঁকড়া চুল। গলায় কালো কারে বাঁধা তিনটে ছোট্ট সাদা কড়ি।

আমাদের ইঁদারার ভেতরের দেওয়ালে সিঁড়ির ধাপের মতো অনেকগুলো লোহার আংটা লাগানো ছিল। ওই আংটায় পা রেখে-রেখে কুয়োর একেবারে নীচ পর্যন্ত চলে যাওয়া যায়। হঠাৎ কোনও এমার্জেন্সির জন্যে এই ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল।

সেই আংটায় পা দিয়ে-দিয়ে মামুদ তরতর করে কুয়োর ভেতরে নেমে যেতে লাগল। আমরা উঁকি মেরে মামুদের কোঁকড়া চুলে ঢাকা মাথাটা দেখতে পাচ্ছিলাম। আর দেখতে পাচ্ছিলাম কুয়োর জল। সেখানে তখনও আলোড়ন চলছে। যেন একটা পাঁচ কেজি ওজনের কাতলা মাছ জলের আড়ালে ঘাই মারছে।

মামুদ যে সেই নীচে নেমে গেল, আর উঠল না। জলের তলায় কিছু একটা ওকে আটকে দিল। বালতি তোলা তো দূরের কথা, ও নিজেকেই আর তুলতে পারল না। আর ও ডুবে যাওয়ার পর কুয়োর জল এতই পাগলা হয়ে গেল যে, মনে হল পাঁচ কেজির কাতলা মাছটা পলকে দশ কেজি হয়ে গেছে।

এই ঘটনার পর বাবাও কেমন যেন কুঁকড়ে গেলেন। বড়রা ছ'জন মিলে ইঁদারার কিনারায় দাঁড়িয়ে নানান আলোচনা জুড়ে দিলেন। বাবা আর দু-কাকা বেশ কয়েকটা মাটির ঢেলা আর ইটের টুকরো কুয়োর জলে ছুড়ে দিলেন, কিন্তু কুয়োর জল যেমন ছিল তেমনই রইল। মনে হল না তার মধ্যে কোনও হেলদোল তৈরি হয়েছে।

মামুদের মর্মান্তিক ঘটনাটা বাতাসে-বাতাসে গোটা গাঁয়ে ছড়িয়ে গেল। ওর বন্ধুরা এসে ভিড় করল কুয়োর পাড়ে। ওর নাম ধরে চেঁচিয়ে ডাকতে লাগল বারবার। মামুদের বিধবা মা কুয়োতলায় হাত-পা ছড়িয়ে বসে হাহাকার তুলে কাঁদতে লাগল।

আমাদের বাড়ি তখন ভিড়ে ভিড়। বয়স্ক মানুষ-জন বাবা-কাকাদের নানান পরামর্শ দিচ্ছেন। কেউ বলছেন বিপত্তারিণীর পুজো দিতে, আবার কেউ বা বলছেন অভিশপ্ত কুয়োটাকে বুজিয়ে দিতে।

বাবার মনে হল, কুয়োটাকে বুজিয়ে দেওয়াটাই নিরাপদ। তা হলে কুয়োর জলের ভেতরে যে-প্রাণী বা অপদেবতা থাকুক না কেন, তার সমাধি হয়ে যাবে। তারপর সব নিশ্চিন্ত।

রাতে কাকাদের সঙ্গে আলোচনা করার সময় মেজোকাকা হঠাৎ বলেন, মাটি দিয়ে কুয়োটা বুজিয়ে দেওয়ার আগে তাতে অ্যাসিড ঢেলে দিলে কেমন হয়! প্রস্তাবটা আর দু-ভাইয়ের মনে ধরেছিল। ফলে অনেক রাত পর্যন্ত বসে বহু জল্পনা-কল্পনার পর তিনজনে একমত হয়ে ঠিক করলেন, প্রথমে প্রচুর অ্যাসিড ঢালা হবে ইঁদারার জলে—তা সে পঞ্চাশ-ষাট কি একশো বোতল হলেও সই। তাতে বাড়তি পয়সা খরচ হলে হবে। আর অ্যাসিডের পরই ঢালা হবে লরি-কে লরি মাটি।

এইভাবেই অভিশপ্ত কুয়োটাকে 'কবর' দেওয়া হবে।

সমস্ত ব্যবস্থা করতে তিন দিন সময় লাগল। তার পরের দিন সকালে হইচই করে কাজ শুরু হল।

বর্ধমান আর কলকাতা থেকে তিরাশি বোতল অ্যাসিড কেনা হয়েছিল। লম্বা-লম্বা বাদামি বোতল। গোরুর গাড়িতে কাঠের পেটিতে বোতলগুলো চাপিয়ে

আমাদের বাড়ি পর্যন্ত নিয়ে আসা হল।

তিনজন খেতমজুরকে অ্যাসিড ঢালার কাজে লাগানো হল। তাদের নাকে-মুখে গামছা বাঁধা, যাতে অ্যাসিডের গ্যাস না ঢোকে। বাবা কাজের তদারকি করছিলেন। তিনিও হঠাৎ বুদ্ধি দিলেন, বোতল থেকে অ্যাসিড না ঢেলে বোতলের ছিপি খুলে বোতলটা সরাসরি ইঁদারার মধ্যে ফেলে দিতে। তা হলেই অ্যাসিড জলে দিব্যি মিশে যাবে।

তাই করা হল। এই বুদ্ধির সুবাদে কাজটা নির্বিঘ্নে মিটতে লাগল।

আমরা একটু দূরে দাঁড়িয়ে অভিনব কাণ্ডকারখানা দেখছিলাম। বাবা, দুই কাকা, আমার মা আর কাকিমারা কুয়োর কাছাকাছি ছিলেন। বাবা-কাকারা শুধু কাছাকাছি ছিলেন না, কুয়োর পাড় ঘেঁষে ঝুঁকে দাঁড়িয়েছিলেন। দেখছিলেন, কুয়োর জলের ধরনধারণে কোনও চেঞ্জ হচ্ছে কি না। বাবা বারবার বলছিলেন, এবার সবকিছু ঠিকঠাক হয়ে যাবে। অ্যাসিডের পর দু-লরি মাটি আর ইট-পাথর ঢেলে দিলে আর দেখতে হবে না।

এই কথা বলে বাবা আঙুল তুলে একটু দূরে দাঁড়ানো একটা মাটি ভরতি লরির দিকে দেখিয়েছিলেন। অ্যাসিডটা জলে গুলে যাওয়ার জন্যে আট-দশমিনিট সময় দিয়ে তারপর মাটি ফেলার কাজ শুরু হবে।

চল্লিশ-পঞ্চাশটা অ্যাসিডের বোতল ফেলার পর বাবার মনে হল ইঁদারার জলের 'ছটফটানি' যেন অনেকটা কমে এসেছে। হাসি-হাসি মুখে সে-কথাই তিনি কাকাদের বলছিলেন।

হঠাৎই একটা ভয়ংকর ব্যাপার ঘটল।

এখনও মনে আছে, আমার সমস্ত শরীর তক্ষুনি যেন হিম-ঠান্ডা হয়ে গিয়েছিল। পেটের ভেতরটা খালি-খালি লাগছিল।

ইঁদারার গভীর থেকে লম্বা অজগর সাপের মতো কী একটা যেন একলাফে শূন্যে উঠে এল।

জিনিসটার রং কুচকুচে কালো। লালা মাখানো। চকচকে।

একটা প্রকাণ্ড সাপ আচমকা ফণা তুলে ছিটকে শূন্যে উঠে ছোবল মারতে গেলে যেমন দেখায় ঠিক সেইরকম ঢঙে অচেনা জিনিসটা আচমকা উঠে এল। কুয়োর পাড় ছাড়িয়ে সেটা প্রায় হাতদশেক উঁচুতে উঠেছিল। তখনই দেখতে পেয়েছিলাম, ওই সরীসৃপটার শেষ প্রান্তে তিনটে লম্বা-লম্বা কালো আঙুল।

সবাই গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠল। সে-চিৎকারে আতঙ্ক, দুঃখ, বিস্ময় আর হাহাকার মিশে ছিল।

ঠিক পরের মুহূর্তে সেই তিন-আঙুলে হাতটা আমার বাবার চুলের মুঠি ধরে এক টান মারল। খেলনা পুতুল নিয়ে ছেলেখেলা করার মতো বাবার শরীরটাকে অবলীলায় মুঠোয় ঝুলিয়ে ঝুপ করে নেমে গেল কুয়োর ভেতরে, জলের তলায়।

এইবার সবাই ভয়ে চিৎকার করে পালাতে শুরু করল। এক মিনিটের মধ্যেই দেখি সব ফাঁকা। শুধু আমাদের পরিবারের চোদ্দোজন কুয়োতলা থেকে অনেকটা দূরে দাঁড়িয়ে আছে। কেউ কাঁদছে, কারও হাত-পা থরথর করে কাঁপছে। আর আমার মা মাটিতে পাগলের মতো আছাড়ি পিছাড়ি খাচ্ছেন। বুক ভাঙা চিৎকার করে হাউমাউ করে কাঁদছেন।

তিনজন খেতমজুর—যারা অ্যাসিড ঢালার কাজ করছিল—ছুটে অনেকটা দূরে পালিয়ে গেলেও একেবারে উধাও হয়ে যায়নি। মজুরির পয়সা পাওয়ার আশায় দূরের একটা কাঁঠাল গাছের নীচে বসে রয়েছে।

আমার দুই কাকা বারবার চোখ মুছছিলেন। সেই অবস্থাতেই নিজেদের মধ্যে ভয় পাওয়া গলায় আলোচনা করছিলেন। দুই কাকিমা তখন মা-কে জড়িয়ে ধরে সামলানোর চেষ্টা করছেন। আর আমরা ন' ভাই-বোন ঘরের দাওয়ার কাছে মাটিতে উবু হয়ে বসে আছি—ভয়ে দুঃখে কাঁদছি।

এক-দেড় ঘণ্টা অপেক্ষা করেও বাবার সন্ধান পাওয়া গেল না। মামুদ আলমের মতো বাবাও কুয়োর জলের তলায় হারিয়ে গেলেন।

একসময় কাকারা কুয়োর পাড়ে গেলেন। চট করে ভেতরে উঁকি মেরেই ছিটকে সরে এলেন।

না, জলে কারও চিহ্ন নেই। তবে জলে এখন পাগলের মতো ঢেউ খেলছে।

আরও একঘন্টা অপেক্ষা করার পর কাকারা ঠিক করলেন, বাবার অসমাপ্ত কাজ শেষ করা হবে। এবং সেটা এখনই।

সুতরাং সেই কাজ এবার শুরু হল। খেতমজুরদের না ডেকে আমার দু-কাকাই কান্না চাপতে-চাপতে কাজে নেমে পড়লেন।

খুব তাড়াতাড়ি ওঁরা কাজ সারতে লাগলেন। বাকি বোতলগুলোর ছিপি পটাপট খুলে বোতলগুলো তড়িঘড়ি কুয়োয় বিসর্জন দিতে লাগলেন।

পাঁচ-সাত মিনিটের মধ্যেই কাজ শেষ হয়ে গেল।

কুয়োতলার একপাশে দু-বালতি জল ধরা ছিল। কাকারা সেই জলে ভালো করে হাত-টাত ধুয়ে নিলেন। তবু ওঁদের হাত অল্পস্বল্প জ্বালা করছিল।

ঠিক সেই সময়ে দ্বিতীয়বার লাফিয়ে উঠল সেই ভয়ংকর হাত। রোদ পড়ে তার কালো রং চকচক করতে লাগল। আমরা সবাই ভয়ে চিৎকার করে উঠলাম। কুয়ো থেকে আরও দূরে ছুটে পালাতে চাইলাম।

কিন্তু তখনই দেখি, ওই প্রকাণ্ড লম্বা হাতটা একটা প্রবল ঝাঁকুনি দিল। ওটার লম্বা-লম্বা চকচকে সাপের মতো মোটা আঙুলগুলো 'অশান্তির জল' ছেটানোর মতো ভঙ্গি করল। সঙ্গে-সঙ্গে কালো রঙের একটা চটচটে আঠালো তরলের ফোঁটা ছিটকে এসে লাগল আমাদের সবার মাথায়, গায়ে।

আমরা অসহ্য জ্বালায় চিৎকার করে উঠলাম। শরীরের যেখানে-যেখানে ওই কালো আঠার ছোঁওয়া লাগল, সেই জায়গাগুলো একেবারে জ্বলে পুড়ে যেতে লাগল।

অজগর সাপের মতো কালো হাতটা নিমেষের মধ্যে আবার ইঁদারার ভেতরে সেঁধিয়ে গিয়েছিল।

রাগে, হতাশায় আমার দু-কাকা কেমন যেন পাগলের মতো হয়ে গেল। ইঁদারার দিকে তাকিয়ে ওঁরা অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ করতে লাগল। ভুলেই গেল যে, আমরা ছোট-ছোট ছেলেমেয়েরা ওঁদের আশেপাশেই রয়েছি।

গনগনে রাগ নিয়ে মেজোকাকা আর ছোটকাকা ছুট লাগাল মাটির লরির দিকে। পাগলের মতো চিৎকার করে বারবার বলতে লাগল, 'তোর একদিন কি আমাদের একদিন! আমাদের দাদাকে খেয়েছিস—এবার তোকে জিয়ন্ত কবর দেব!'

তো শেষ পর্যন্ত তাই-ই দেওয়া হল।

ইট-পাথরের টুকরো বৃষ্টির মতো ফেলা হল কুয়োর ভেতরে। তার সঙ্গে ঝুড়ি-ঝুড়ি মাটি। কুয়োর পাড় শাবল দিয়ে ভেঙে চাঙরগুলো ফেলা হল শয়তানের কবরে। যে যা পারল তাই ফেলতে লাগল কুয়োর ভেতরে।

তিনঘণ্টার পরিশ্রমে অভিশপ্ত ইঁদারাটা বোজানো হল। কিন্তু তা সত্ত্বেও রাতে আমরা কেউই ঘুমোতে পারলাম না।

আতঙ্কে-আতঙ্কে পনেরো দিন কেটে গেল। বাবার শ্রাদ্ধ-শান্তি মিটে গেল। সেইসঙ্গে আমাদের বাড়ির অভিশাপ কাটানোর জন্যে পুরুতমশাইকে দিয়ে শান্তি-স্বস্ত্যয়ন করানো হল। তা সত্ত্বেও আমাদের বাড়ির অবস্থাটা শ্মশানের মতো থমথমে হয়ে রইল। শুধু মানুষের মাংস পোড়ার গন্ধটা নাকে আসছিল না, এই যা।

গাঁয়ের লোকজন কেউ আর আমাদের বাড়িতে আসত না। পথে বা রাস্তায় হঠাৎ দেখা হয়ে গেলে দু-এক টুকরো দায়সারা কথা বলেই পাশ কাটিয়ে যেত। আমরাও ধীরে-ধীরে এইরকম অদ্ভুত পরিস্থিতির সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে নিতে লাগলাম।

ইঁদারা বোজানো জায়গাটা আমি মাঝে-মাঝেই লক্ষ করতাম। কখনো-কখনো

মনে হত ওপরের মাটিটা যেন কাঁপছে। তবে আমি ভেবেছিলাম সেটা আমার মনের ভুল। পরে বুঝেছি, মনের ভুল ভাবাটাই ছিল আমার মনের ভুল। কিন্তু ব্যাপারটা আমি আর কাউকে বলিনি।

মাটির কাঁপুনির ব্যাপারটা বড়দেরও নজরে পড়েছিল। ওঁরা তখন নিজেদের মধ্যে শলা করে কুয়োর জমিটাকে বাঁশ দিয়ে ঘিরে দেওয়ার ব্যবস্থা করল। আধ বিঘে ঘেরা জমির মধ্যে প্রায় মাঝখানটিতে কুয়োর জমিটা অভিশাপ হয়ে টিকে রইল। জমির সীমানায় বেড়ায় নোটিশ লাগানো হল ঃ 'সাবধান! এ-জমিতে কেউ প্রবেশ করবেন না। এটা অভিশপ্ত জমি।'

কয়েক বর্ষা পর যখন সেই জমিতে ঘাস গজাল তখন তার চেহারা দেখে আমরা সবাই অবাক হয়ে গেলাম। কালো রঙের অদ্ভুত এক চকচকে ঘাস। তার শিষগুলো সাধারণ ঘাসের চেয়ে বেশ লম্বা। আর আশ্চর্য ব্যাপার, ওই কালো ঘাস গজিয়েছে সেই ইঁদারা বোজানো জমিটুকুতেই—তার আশপাশে সব সাধারণ সবুজ ঘাস।

একটা কথা আগে বলিনি—এখন বলছি। সেই যে জ্বালা-ধরানো চটচটে আঠালো কালো রঙের ফোঁটা আমাদের ফ্যামিলির সবার গায়ে কম-বেশি এসে পড়েছিল, তার জ্বালা আর সারল না। ডাক্তার-বদ্যি করে চেষ্টা কিছু কম হল না, কিন্তু সবই বেকার।

আমার বেলায় সে-ফোঁটা শুধু গায়েই পড়েনি, একটা ফোঁটা ঠোঁটে এসেও পড়েছিল। আর আমি কোনও কিছু ভেবে ওঠার আগেই সেটা জিভ দিয়ে চেটে ফেলেছি। আর শরীরের ভেতরে সেটা চলেও গেছে।

কী বলব আপনাকে, ওরকম জঘন্যভাবে গায়ে এসে পড়া ওই কালো আঠা যে অমন মিষ্টি হতে পারে সেটা ভাবিনি।

ভুল করে ওই বিশ্রী জিনিসটা চেটে খেয়ে ফেলায় আমার ঘেন্না করছিল। আরও মনে হচ্ছিল, আমি যেন একটা ঘোরতর অন্যায় করে ফেলেছি।

কিন্তু সেই 'অন্যায়ই' আমাকে হয়তো বাঁচিয়ে দিল। কারণ, আমাদের পরিবারের সবাই একে-একে মারা যেতে লাগল। ছোট-বড় কেউ বাদ গেল না।

এটুকু জানা গিয়েছিল যে, ওদের সবার ক্যান্সার হয়েছিল। তবে গায়ে যেখানে ওই কালো ফোঁটা পড়েছিল, সেখানে নয়। প্রত্যেকেরই কর্কট রোগ হয়েছিল শরীরের ভেতরে—শরীরের নানান জায়গায়।

সাড়ে সাত বছর সময়ের মধ্যে ওরা সবাই একে-একে চলে গেল। কোনও চিকিৎসায় কিছু হল না। আমি একেবারে একা হয়ে গেলাম।

এই শ্মশান হয়ে যাওয়া ভিটেতে আমি একেবারে যখের মতো বেঁচে রইলাম। আর আমার সঙ্গে বেঁচে রইল ওই কালো ঘাস।

আমি পেছনের জমির ওই বেড়ার কাছে দাঁড়িয়ে প্রায়ই ওই কালো ঘাসের দিকে তাকিয়ে থেকেছি, ওটাকে লক্ষ করেছি। দেখেছি, বাতাস না থাকলেও ওই কালো ঘাসের শিষ নড়ে। ওরা কেমন যেন অস্থির হয়ে ওঠে। আর সেই সময় ওই কালো ঘাসের জমির জায়গাটুকুও নড়ে, কেঁপে ওঠে, কেঁপে ওঠে।

এসব কথা কাউকে বলিনি, কারণ, শুনলে কেউ বিশ্বাস তো করবেই না—উলটে আমাকে পাগল ভাববে। অবশ্য এমনিতেই সবাই আমাকে পাগল ভাবে। ভাবে ফ্যামিলির পরপর চোদ্দোজনের মৃত্যু দেখার পর, আর চোদ্দোজনের শ্রাদ্ধ করার পর, আমার মাথার আর ঠিক নেই।

কথাটা যে খুব একটা ভুল তা অবশ্য নয়। কারণ, মাঝে-মাঝে আমার নিজের মনেই তো সন্দেহ জাগে, আমার মাথাটা ঠিক আছে কি না।

একদিন দেখলাম, ওই কালো ঘাসের জমিতে একটা কালো ছাগল মরে পড়ে আছে। আকাশ তখন মেঘলা ছিল। হয়তো সেইজন্যেই ছাগলটা প্রথমে আমার নজরে পড়েনি—ঘাসের কালো রঙের সঙ্গে ছাগলের কালো রং মিশে গিয়েছিল।

এ-ঘটনায় যতটা অবাক হওয়ার কথা ততটা অবাক আমি হইনি। কারণ, কালো ঘাসের জন্মের ইতিহাস তো আমার জানা!

লোক ডেকে এনে লম্বা-লম্বা বাঁশ দিয়ে দূর থেকে ছাগলটার ডেডবডি সরানো হল। সরানোর সময় সাবধান থাকলাম, যাতে কারও পায়ে কালো ঘাসের ছোঁওয়া না লাগে।

যাদের ছাগল মারা গিয়েছিল তাদের রাগ কমাতে ক্ষতিপূরণ দিতে হয়েছিল। তারপর জমিটার বেড়া আবার নতুন করে তৈরি করলাম—শক্তপোক্ত ঘন বেড়া, যাতে গোরু, ছাগল, হাঁস, মুরগি—কিছুই না ভেতরে ঢুকতে পারে। তবে পাখি-টাখির ওপর আমার তো আর হাত ছিল না! তাই এখন যদি ওই কালো ঘাস দেখতে যান দেখবেন হয়তো কয়েকটা কাক, চড়ুই, শালিক কি বুলবুলি মরে পড়ে আছে।

তো এইভাবেই দিন-মাস-বছর কাটতে লাগল। আমি স্কুলের চাকরিটা কোনওরকমে চালিয়ে যেতে লাগলাম। বাবার আমলে যেমন গাঁয়ের ছেলেমেয়েরা বাবার কাছে পড়তে আসত, বাবা চলে যাওয়ার পর আর কেউ আসত না। এমনকী আমি মাস্টারির চাকরিটা পাওয়ার পরেও ছেলেমেয়েরা আর কেউ পড়তে আসেনি।

পেছনের ঘর চারটে—আর সবাই চলে যাওয়ার পর—এমনি পড়ে থাকত।

ওগুলোর ঝাড়পোঁছ, মেরামতি, তদারকি—কিছুই হত না। তাই প্রতি বছরের ঝড় আর বর্ষায় ঘরগুলো একটু-একটু করে ক্ষয়ে যেতে লাগল। তারপর একদিন ওগুলো শেষ হয়ে গেল। ভিটের পেছনটায় ধীরে ধীরে আগাছার জঙ্গল হয়ে গেল।

ব্যস, এই আর কী! এখন শুধু কালো ঘাসের মালিক হয়ে আমি বেঁচে আছি। শেষের দিন গুনছি।

কথা শেষ করতে-করতে মাস্টারমশাই কান্নায় ভেঙে পড়লেন। চোদ্দো জন কাছের মানুষকে হারানোর শোক অতীতের কবর খুঁড়ে উথলে উঠল।

কিছুক্ষণ পর নিজেকে সামলে নিয়ে গোপাল মাস্টারমশাই আমাকে কালো ঘাস দেখাতে নিয়ে গেলেন। কাদা প্যাচপ্যাচে মাটিতে সাবধানে পা ফেলে ওঁর বাড়ির পেছনের জমির দিকে হাঁটা দিলাম।

আকাশ ঘোর মেঘলা। টুপটাপ করে মিহি বৃষ্টি পড়ছে—সে-বৃষ্টি গায়ে তেমন লাগছে না। বাতাস থমকে দাঁড়িয়ে। গাছের পাতা নড়ছে না।

সেই জমিটার কাছে পৌঁছে সাইনবোর্ডটা দেখতে পেলাম। অপটু হাতে নোটিশ লিখে মানুষ-জনকে সাবধান করে দেওয়া হয়েছে। কে যেন সেই লেখার পাশে লাল রং দিয়ে একটা ব্যাকাট্যারা মড়ার মাথা এঁকে দিয়েছে।

মাস্টারমশাই যেমন-যেমন বলেছিলেন, কালো ঘাসের ব্যাপারটা ঠিক তাই। জমির বেড়ার ওপর দিয়ে নজর চালিয়ে দূর থেকে যেটুকু দেখতে পেলাম তাতেই বোঝা গেল। দু-একটা মরা পাখিও দেখতে পেলাম।

কালো। চকচকে। লম্বা-লম্বা শিষ। বাতাস না থাকলেও সেই শিষগুলো এপাশ-ওপাশ নড়ছে। তবে জমিটা কাঁপছে কি না সেটা বোঝা গেল না।

মাস্টারমশাইকে বললাম, 'এবার আমাকে ফিরতে হবে—নইলে অনেক রাত হয়ে যাবে।'

মাস্টারমশাই আমাকে চা না খাইয়ে ছাড়লেন না। পাঞ্জাবির হাতা দিয়ে মুখ মুছে নিলেন। তারপর বাউন্ডারি-গেট পর্যন্ত আমাকে এগিয়ে দিলেন। নীচু গলায় বললেন, 'এই কালো ঘাসের কথা-সম্পূর্ণ কাহিনি-কখনও কাউকে বলিনি। দু-একজন রিপোর্টার কখনো সখনো খোঁজ করতে এসেছে। কিন্তু এ-ব্যাপারে একটি কথাও না বলে তাদের সব্বাইকে ফিরিয়ে দিয়েছি। কিন্তু আজ....আজ... আপনাকে সব বলতে পেরে বেশ হালকা লাগছে।'

আমি হেসে বললাম, 'মন খারাপ করবেন না, মাস্টারমশাই। ভেবে দেখুন,

আপনি কত লাকি। আপনার ফ্যামিলির চেদ্দোজন ক্যান্সারে মারা গেলেও আপনি সেই মারণ রোগের হাত থেকে বেঁচে গেলেন, তাই না?'

এ-কথা শোনামাত্রই গোপাল মাস্টারমশাই কেমন যেন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। আমার মুখের ওপর মুখ নিয়ে এসে ওই রোগা বৃদ্ধ গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠলেন, 'বেঁচে গেলাম! বেঁচে গেলাম! তাই বুঝি?'

একটানে ওঁর বৃষ্টিতে ভেজা পাঞ্জাবিটা ছিঁড়ে ফেললেন। ফড়ফড় শব্দে পাঞ্জাবিটা দু-ফাঁক হয়ে গেল।

তারপর...তারপর...চোখের সামনে আমি এ কী দেখছি!

'ওই কালো আঠা এককৌটা চেটে খেয়ে ফেলেছিলাম বলে আমি ....আমি বেঁচে গেলাম, তাই না?' গোপাল মাস্টারমশাই তখনও চেঁচিয়ে যাচ্ছিলেন।

আর আমি তাকিয়ে ছিলাম 'বেঁচে যাওয়া' মানুষটার খালি গায়ের দিকে।

ওঁর সারা বুকে কুচকুচে কালো রঙের কী একটা জিনিস লেপটে রয়েছে। ঠিক তেল রঙের মতো। চকচক করছে। আঠালো।

রংটা ছড়িয়ে গেছে বুকের দুপাশে। বগলের নীচে। হয়তো পিঠেও তার রাজ কায়েম করেছে।

কোমরের দিকেও ছড়িয়ে গেছে সেই কালো রং।

মাস্টারমশাই পাগলের মতো বুক চাপড়াতে লাগলেন।

'ওই কালো শয়তানটাকে বুকে-পিঠে জড়িয়ে আমি এইভাবে বেঁচে আছি। আমার সারা শরীরে জ্বালা, মনে জ্বালা! আমি আর সইতে পারছি না। এর চেয়ে ক্যান্সার অনেক ভালো...অনেক ভালো...'

গোপাল মাস্টারমশাই বুক চাপড়ে হাউহাউ করে কাঁদতে লাগলেন। কখন যেন বৃষ্টি নেমেছে—টেরই পাইনি। মানুষটা বৃষ্টিতে ভিজতে লাগল। আমিও।

অসহায় সর্বহারা মানুষটাকে পেছনে ফেলে আমি পা বাড়ালাম। বৃষ্টি পড়ছিল, কিন্তু ছাতা খুলে মাথা বাঁচাতে ইচ্ছে করল না।

ঠিক করলাম, এই অদ্ভুত ঘটনা নিয়ে যদি কখনও গল্প লিখি তা হলে গ্রামের নাম, মাস্টারমশাইয়ের নাম—সবকিছু পালটে দেব।





উপন্যাস



গোলাপি, নরম এবং ঠান্ডা

দৃশ্যটা দেখে সুতনয় যেন পাথর হয়ে গেল। ঠিক বুঝে উঠতে পারছিল না ব্যাপারটাকে কীভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। ও বোধহয় একটা চিৎকার করতে চেয়েছিল। তাই বেশ বড় মাপের হাঁ-ও করেছিল। কিন্তু কেন জানি না শব্দটা মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসেনি। যদি বেরিয়ে আসত তা হলে কী হত কে জানে। শর্মি রান্নাঘরে রান্না করছে, হয়তো ও হাতা খুন্তি ছুড়ে টুড়ে ফেলে সুতনয়ের কাছে দৌড়ে আসত। আর রূপান যার কাণ্ড দেখে সুতনয়ের মনের এই টালমাটাল অবস্থা—রূপান হয়তো ভয় পেয়ে বাবার কাছে ছুটে আসত। বাবাকে জাপটে ধরে পাজামার ভাঁজে মুখ গুঁজে দিয়ে ডুকরে উঠে বলত, 'কী হয়েছে, বাপি? কী হয়েছে...?'

ভাগ্যিস চিৎকারটা গলা দিয়ে বেরোয়নি। কারণ, যার ভালোমন্দের দুশ্চিন্তায় চিৎকারটা বেরিয়ে আসতে চাইছিল সে তো দিব্যি নির্বিকার! এখন বিছানায় বসে ঘাড় ঘুরিয়ে বাবার দিকে চেয়ে রয়েছে। গোল-গোল দুষ্টুমিভরা চোখ, সামান্য থ্যাবড়ানো নাক, মিষ্টি একজোড়া ঠোঁট, আর একমাথা কদমফুলের ধাঁচের চুল—গতকাল চুল কাটা হয়েছে তাই। আর সদ্য চুল ছাঁটার জন্য রূপানের দুষ্টু-মিষ্টি মুখটা আরও দুষ্টু, আরও মিষ্টি দেখাচ্ছে।

বিছানায় রূপানকে ঘিরে ছড়ানো একরাশ খেলনা। ছোট, বড়, চৌকো, লম্বা,

গোল—কতরকমের আর কত রঙের যে খেলনা তার কোনও হিসেব করাই মুশকিল! ওর চারদিকে গোটাপাঁচেক সফ্‌ট টয়—তার মধ্যে প্রকাণ্ড মাপের দুটো অ্যানাকোন্ডা—একটার গায়ের রং নীল, তার ওপরে কালো প্যাঁচালো ছোপ। আর অন্যটার রং হলদে—তার ওপরে কালো নকশা। এ ছাড়া রয়েছে ডোরাকাটা বাঘ, সিংহ আর একটা পান্ডা।

কিন্তু রূপানের তাদের দিকে নজর নেই।

ওর সামনে-পিছনে অবহেলায় লটকে-পটকে পড়ে রয়েছে নিন্‌জা টার্টল, বেন টেন, ছোটা ভীম এবং জি. আই. জো-র মডেল।

কিন্তু সেদিকে কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই সাত-সাড়ে সাতের ছেলেটার।

ও একমনে তাকিয়ে ছিল সামনের দিকে। ওর ছড়ানো দু-পায়ের ফাঁকে জিনিসটা পড়ে ছিল। একদলা প্লাস্টিসিন। সিনথিটিক ক্লে-ও বলা যায়। গোলাপি রঙের এই নমনীয় জিনিসটি দিয়ে ক্লে মডেলিং করা যায়। রূপানের স্কুলে আর্ট ক্লাসে এই মডেলিং শেখানো হয়। তবে জিনিসটার রং ঠিক সাদা-মাঠা গোলাপি নয়—তার ওপরে চিতাবাঘের মতো কালো চাকা-চাকা দাগ রয়েছে।

ওই একদলা প্লাস্টিসিনের দিকে তাকিয়ে ছিল রূপান। শুধু তাকিয়ে ছিল নয়, হেসে কুটিপাটিও হচ্ছিল। তবে সুতনয় ঘরের দরজায় উঁকি মারতেই রূপান চমকে বাবার দিকে ফিরে তাকিয়েছে। একইসঙ্গে ওর হাসিও গেছে থেমে।

আজ রবিবার—ছুটির দিন। দুপুরের খাওয়াদাওয়া হয় একটু বেলা করে। তাই বারোটা বেজে দশ মিনিটের সময় সুতনয় ডাইনিং স্পেস-এ বসে টিভি দেখছিল, শর্মি রান্নাঘরে ছ্যাঁকছোঁক করছিল, আর রূপান স্নান-টান সেরে খেতে বসার আগে শোওয়ার ঘরের বিছানায় খেলনাপাতি নিয়ে হুটোপাটি করছিল। ও জানে মায়ের হাত খালি হলেই খেতে বসার জন্য ডাক পড়বে। তাই প্রাণপণে খেলার 'গুরুত্বপূর্ণ' কাজটুকু সেরে নিচ্ছিল।

টিভি দেখতে-দেখতে শোওয়ার ঘর থেকে হাসির শব্দ শুনতে পাচ্ছিল সুতনয়। রূপান খেলতে-খেলতে হেসে উঠছে বারবার। এরকমটা প্রায়ই হয়। রূপান আপন খেয়ালে খেলে, আর আপন খেয়ালে নানান বকবক করে—আর কখনও বা হেসে কুটিপাটি হয়।

হঠাৎই কেন যেন সুতনয়ের কৌতূহল মাথাচাড়া দিয়েছে। ছেলেটা এত হাসছে কেন, একটু দেখি তো!

তারপর টিভি দেখা ছেড়ে উঠে পড়েছে। পা টিপে-টিপে এসে পড়েছে শোওয়ার ঘরের দরজায়। এবং আড়াল থেকে ঘরের ভেতরে উঁকি মেরেছে।

সেই মুহূর্তে সুতনয় যা দেখেছে তা বিশ্বাস না হওয়ারই মতো। এবং দৃশ্যটা দেখে পাথর হয়ে যাওয়াটা মোটেই অস্বাভাবিক নয়।

কারণ, বিছানার ওপরে পড়ে থাকা প্লাস্টিসিনের পিণ্ডটা নিজে-নিজেই নড়ছিল। আকার পালটাচ্ছিল। আর সেই অদ্ভুত কাণ্ড দেখে রূপান হেসে গড়িয়ে পড়ছিল।

কিন্তু সুতনয়ের হাজিরা টের পাওয়ামাত্রই সিনথিটিক ক্লে-র দলাটা নিমেষে জড় পদার্থ হয়ে গেছে। তার অলৌকিক নড়াচড়া বন্ধ হয়ে গেছে। আর রূপানের হাসিও গেছে থেমে।

সুতনয় কি ভুল দেখল? নাকি ঠিক? ওই জড় পদার্থটা কি কিছুক্ষণের জন্য নড়াচড়ার শক্তি পেয়েছিল। কিন্তু সেটা তো প্র্যাকটিক্যালি অসম্ভব।

সুতনয় একটা ঘোরের মধ্যে পড়ে গিয়েছিল। তাই চুপচাপ দরজার কাছটিতেই দাঁড়িয়ে ছিল।

ওর ঘোর কাটল রূপানের কথায়।

'তুমি যাও না, বাপি! টিভি দ্যাখো না। তোমার জন্য আমি খেলতে পারছি না।'

'কেন, খেলতে পারছ না কেন?'

'তুমি থাকলে ও খেলবে না।' প্লাস্টিসিনের ডেলাটার দিকে দেখাল রূপান : 'আমরা কী সুন্দর মজা করছিলাম...!'

সুতনয় দু-এক সেকেন্ড কী যেন ভাবল। তারপর দরজার কাছ থেকে সরে এল। মাথার মধ্যে চিন্তার পোকা ধারালো দাঁত দিয়ে কুটকুট করে কাটতে লাগল।

না, শর্মিকে এখন এসব কথা বলা যাবে না। বললেই ও ছোট্ট বাচ্চাটাকে জেরায়-জেরায় জেরবার করে দেবে।

সুতরাং সুতনয় টিভি দেখতে লাগল। আপাতত।

ব্যাপারটা সুতনয়ের মাথা থেকে মোটেই গেল না। অবশ্য যাওয়ার কথাও নয়। রাতে অন্ধকার ঘরে বিছানায় শুয়ে-শুয়ে ও সকালের দেখা ঘটনাটা খুব স্লো মোশনে ভাবছিল।

দিনকয়েক আগে ওরা তিনজনে মানি স্কোয়ার মলে গিয়েছিল। টুকটাক কেনাকাটার ব্যাপার তো ছিলই, তা ছাড়া রূপানকে সঙ্গে নিয়ে দুজনের নিত্যকার

একঘেয়েমিটা একটু কাটিয়ে আসার ইচ্ছেও ছিল। ওখানে রূপান অনেকটা খোলা জায়গা পায়, প্রাণ ভরে ছুটোছুটি করতে পারে, নিজে-নিজেই এসক্যালেটরে তড়বড় করে ওঠানামা করে। সব মিলিয়ে সময়টা ওর দারুণ কাটে।

সেখানে ঘুরে বেড়ানোর সময় শর্মি হঠাৎই বলেছিল, রূপানের সিনথিটিক ক্লে-র কৌটো প্রায় খালি হয়ে এসেছে। নতুন একবাক্স কিনে রাখা দরকার।

তখন ওরা তিনজনে 'স্টারমার্ক' নামের দোকানটায় গিয়েছিল। একবাক্স প্লাস্টিসিন কিনেছিল।

বাক্সটা স্বচ্ছ প্লাস্টিকের। ঢাকনার চেহারাটা পাপড়ি ছড়ানো ফুলের মতো। ভেতরে সেলোফেন কাগজে মোড়া প্লাস্টিসিনের এক-একটা রঙিন সিলিন্ডার। ঠিক যেন বড়সড় মাপের কয়েকটা লজেন্স। মোট বারোটা—গুনে দেখেছিল সুতনয়। বাক্সের গায়ে লেখা আছে 'কাপ ক্লে'। আর তার পাশাপাশি চাইনিজ হরফের স্টাইলে আঁকিবুকি দেখে সুতনয় বুঝতে পেরেছিল, অন্যান্য হরেক জিনিসের মতো এই ব্যাপারটাতেও চিন আমাদের দেশকে টেক্কা দিয়ে দিয়েছে।

কেনার সময় জিনিসটাকে যেটুকু পরখ করার সেটুকুই করেছিল। তার বেশি আর মনোযোগ-টনোযোগ দেয়নি। এখন, সকালের ব্যাপারটা চোখে পড়ার পর পুরোনো স্মৃতিটাকে সুতনয় একটু ঝালিয়ে দেখছে।

গোলাপি রঙের ওপরে কালো চাকা-চাকা দাগ। ঠিক এইরকম নকশার কোনও প্লাস্টিসিন সিলিন্ডার কি ছিল কৌটোটার ভেতরে? না, মনে তো পড়ছে না! তবে এটুকু মনে পড়ছে, সব ক'টা সিলিন্ডারই ছিল একরঙা। লাল, কমলা, কচি কলাপাতা, এমনকী কালো রঙেরও একটা ছিল। কিন্তু ডিজাইনওয়ালা তো একটাও ছিল না!

তা হলে এই তেরো নম্বর গোলাপি-কালো সিলিন্ডারটা উড়ে এসে জুড়ে বসল কোথা থেকে?

আজ সন্ধেবেলা রূপানের কাছ থেকে সিনথিটিক ক্লে-র বাক্সটা চেয়ে নিয়েছিল সুতনয়। তখন দেখেছে, ওর স্মৃতি একটুও ভুল করেনি। সব ক'টা সিলিন্ডারই একরঙা—এবং বারোটাই হাজির। তা হলে ওই গোলাপি-কালো সিলিন্ডারটা গেল কোথায়? বেশ অবাক হল ও।

রূপানকে জিজ্ঞাসাবাদ করতেই জানা গেল, ওটা ও খেলনার বাক্সের মধ্যে রেখে দিয়েছে। কারণ, ওটার সঙ্গে খেলা করতে ওর ভীষণ ভালো লাগে।

রূপানের খেলার বাক্স বলতে বেশ বড় মাপের একটা পলিথিন নেটের বিন। সেটা একসময় কেনা হয়েছিল ময়লা জামাকাপড় রাখার জন্য। পরে ধীরে-

ধীরে কীভাবে যেন ওটা রূপানের পাঁচমিশেলি খেলনার স্টোরেজ বিন হয়ে গেছে।

সেই বিন ঘাঁটতে শুরু করে দিল সুতনয়। ঝুঁকে পড়ে সব খেলনা একে-একে বের করে মেঝেতে রাখতে লাগল। কোথায় গেল সিনথিটিক ক্লে-র ডেলাটা? সুতনয় কী এক জেদে হাতড়াতে লাগল।

একসময় ওর মনে হল, ওই গোলাপি-কালো পিণ্ডটা খেলনার ভিড়ের খাঁজে-খোঁজে লুকিয়ে পড়ার চেষ্টা করছে না তো?

রূপান আর শর্মি বিছানায় বসে-বসে সুতনয়ের কাণ্ডকারখানা দেখছিল।

শর্মি একবার অধৈর্য হয়ে বলে ফেলল, 'ওটা অত খোঁজার কী দরকার? অন্য একটা প্লাস্টিসিন ব্লক নিয়ে নাও না!'

রূপান অবুঝ বালকের মতো অভিমানে ফোড়ন কাটল : 'বাপি ওটাই চাইছে। ওটার সঙ্গে আমি খেলি তো, তাই...।'

সুতনয় শর্মির দিকে তাকিয়ে বলল, 'ওটার ডিজাইনটা বেশ অন্যরকম। দেখতেও বেশ সুন্দর...।' এবং খেলনার ডাঁইয়ের মধ্যে ওটার খোঁজ করেই চলল।

শেষ পর্যন্ত ওটা পাওয়া গেল।

হাতের মুঠোয় ডেলাটা চেপে ধরে হাতটা বিনের বাইরে নিয়ে এল সুতনয়।

টের পেল প্লাস্টিসিনের ডেলাটা বেশ ঠান্ডা। যেন এতক্ষণ ওটা ফ্রিজের আইসবক্সে রাখা ছিল।

কী ভেবে বস্তুটাকে নাকের কাছে নিয়ে এল। গন্ধ শুঁকল। কেমন যেন রবার-রবার গন্ধ—অন্যান্য প্লাস্টিসিনের ব্লকের মতোই। তবে তার সঙ্গে কেমন একটা হালকা মিষ্টি গন্ধ মিশে আছে।

না, অনেকক্ষণ ধরে ডেলাটাকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেও অস্বাভাবিক আর কিছু খুঁজে পেল না।

তাই শেষমেশ তদন্তে ক্ষান্ত হল সুতনয়। রূপানের দিকে কয়েক পলক তাকিয়ে রইল। ওকে কোনওরকম প্রশ্ন-টশ্ন করল না। কারণ, সকালের অদ্ভুত ঘটনাটার কথা ও শর্মিকে এখনও জানায়নি। শুনলে শর্মি আপসেট হয়ে পড়বে। তারপর ছেলেকে লাগাতার প্রশ্ন করে চলবে। না, এখনও ওকে ব্যাপারটা জানানো ঠিক হবে না। বরং রূপানের দিকে একটু লক্ষ রাখা যাক। একইসঙ্গে লক্ষ রাখা যাক গোলাপির ওপর কালো ছিট-ছিট ডেলাটার দিকেও।

কারণ, আজ সকালে সুতনয় মোটেই ভুল দেখেনি। কিছুতেই না!

সার্কাসের জোকাররা যেমন নানারকমের অঙ্গভঙ্গি করে দর্শকদের হাসায়, খুশি করে, আনন্দ দেয়—সকালে প্লাস্টিসিনের ডেলাটা ঠিক যেন তাই করছিল। আর ওটার সামনে দর্শক বলতে ছিল রূপান একা। একা।

রাতে অন্ধকারে শুয়ে-শুয়ে সুতনয় এসব কথাই ভাবছিল। আর অদ্ভুত ভাবনাগুলো ওর মনে পাগল করা বোবা ঝড় তুলছিল।

এরপর কী করবে সুতনয়? কী করা উচিত ওর? ও কি ওই প্লাস্টিসিনের ডেলাটাকে ফেলে দেবে?

নাঃ—ওটাকে ফেলে দেওয়া যাবে না। কারণ, ফেলে দিলেই শর্মি ওকে সন্দেহ করবে, জবাবদিহি চাইবে। রূপানের খেলা নিয়ে ঝামেলা পাকিয়েছে বলে বাড়ি মাথায় করবে।

আর রূপানও কি কম যায়! ছোট্ট হলে কী হবে, বাচ্চাটা ভীষণ জেদি। তখন দেখা যাবে, ওই গোলাপি-কালো চায়না ক্লে-র ডেলাটাই ওর চাই। ওটা না পেলে পর সারাদিন ঘ্যানঘ্যান করবে, কান্নাকাটি করবে।

নাঃ, জিনিসটা মা আর ছেলেকে লুকিয়ে পাচার করে দেওয়া যাবে না।

অন্ধকারের দিকে চোখ মেলে তাকিয়ে নানান সমাধানের কথা ভাবতে-ভাবতে সুতনয় কখন যেন ঘুমিয়ে পড়েছিল।

এইরকম চিন্তায়-চিন্তায় তিনটে দিন কেটে গেল। এর মধ্যে দুবার সুতনয় রূপানকে ওই তেরো নম্বর প্লাস্টিসিনের ডেলাটার সঙ্গে খেলতে দেখেছে। সেই একই খেলা! বিছানার ওপরে গ্যাঁট হয়ে বসে ওটা বারবার চেহারা পালটাচ্ছে, আর রূপান তাই দেখে প্রাণপণে হাসছে, লুটোপুটি খাচ্ছে।

সুতনয়ের একসময় মনে হল, যদি এই অলৌকিক অথচ নিরীহ খেলা চলতে থাকে তা হলে ক্ষতি কী! ওই অদ্ভুত ডেলাটা যেমন হুট করে এ-বাড়িতে এসে হাজির হয়েছে, তেমনই হুট করে হয়তো একদিন ভ্যানিশ হয়ে যাবে।

কিন্তু যদি কোনওদিন খেলাটা শর্মির চোখে পড়ে যায় তখন কী হবে! শর্মি প্রথমে নিশ্চয়ই একটা ভয়ের চিৎকার করে উঠবে। তারপর...।

তারপর যে কী হবে সেটা সুতনয় আর ভাবতে চাইল না। তখন ওকে নিশ্চয়ই বলতে হবে, ব্যাপারটা ও কিছুই জানে না—এই প্রথম শর্মির কাছে শুনছে।

কিন্তু তারপর তো ওকে ওই গোলাপি-কালো প্লাস্টিসিনের ডেলাটাকে বিদেয়

করার ব্যবস্থা করতে হবে! সুতরাং, আগেভাগে সেই চেষ্টা শুরু করলে ক্ষতি কী!

একদিন রাতে, রূপান ঘুমিয়ে পড়ার পর, 'সেই চেষ্টা' শুরু করতে গিয়ে একটা ধাক্কা খেল ও। রূপানের খেলনার নানান ভাঁড়ার তন্নতন্ন করে খুঁজেও প্লাস্টিসিনের ডেলাটাকে পাওয়া গেল না। একবার নয়—পরপর তিনবার মহাতল্লাশি চালাল সুতনয়। কিন্তু কোনও লাভ হল না।

শর্মি জেগেই ছিল। কী একটা ম্যাগাজিন পড়ছিল। রাত সাড়ে এগারোটার সময় স্বামীর এই পাগলামির ঝটকা দেখে বেশ বিরক্ত হল।

'এই মাঝরাত্তিরে অমন করে কী খুঁজছ?'

আচমকা কোনও জুতসই মিথ্যে সুতনয়ের মাথায় জোগাল না। তাই ও সত্যি কথাটাই বলে ফেলল।

'ওই গোলাপির ওপরে কালো ছিট-ছিট দেওয়া প্লাস্টিসিনটা খুঁজছি—।'

এর পরের প্রশ্নটা কী হবে সুতনয়ের জানাই ছিল। ফলে সেটার জন্য একটা লাগসই জবাব ও চট করে ভেবে ফেলতে পারল।

'কেন? হঠাৎ ওটা খুঁজছ কেন? সেদিনও দেখলাম, তুমি ওটা গোরুখোঁজা করে খুঁজে বের করলে...!'

'ওটার কেমিক্যালটা ভালো নয়। মানে...' হোঁচট খেয়ে জবাবটাকে কোনওরকমে শেষ করতে পারল ও : 'ওটা মুখে-টুখে দিলে রূপানের প্রবলেম হতে পারে।'

'আর অন্য প্লাস্টিসিন ব্লকগুলো?'

'না, না—ওগুলো সেফ। এটাই শুধু অন্যরকম...আমি গন্ধ শুঁকে কমপেয়ার করে দেখেছি। তা ছাড়া...ওটা খুব নরম...'

শর্মি আর কথা বাড়াল না। সুতনয়ও খোঁজাখুঁজিতে ক্ষান্ত দিয়ে বিছানায় উঠে পড়ল।'

একটু পরে আলো নেভানোর সময় ওর হঠাৎই মনে হল, সুতনয়কে ফাঁকি দিতে ওই তেরো নম্বর প্লাস্টিসিনটা কোথাও লুকিয়ে পড়েনি তো?

এ-কথা ভাবতেই একটা ঠান্ডা ভয় ওর শিরদাঁড়া বেয়ে গড়িয়ে নামতে লাগল।

রাতে সুতনয় ঘুমোল বটে কিন্তু ওর ঘুম তেমন গভীর হল না। হয়তো সেইজন্যেই ও স্বপ্নে তেরো নম্বর প্লাস্টিসিন ব্লকটাকে দেখতে পেল। ব্লকটা ওকে আনন্দ দেওয়ার জন্য নানানভাবে নিজের আকার পালটাচ্ছে। নমনীয় জেলির মতো প্রতিটি সেকেন্ডে নিজেকে বাঁকিয়ে-চুরিয়ে নতুন-নতুন চেহারা

তৈরি করছে। হঠাৎই ব্লকটা থুতু ছেটানোর মতো করে কী একটা ছুড়ে দিল সুতনয়ের দিকে। সেটা সুতনয়ের চোখে এসে লাগতেই ওর চোখ জ্বালা করে উঠল।

সঙ্গে-সঙ্গে ওর ঘুম ভেঙে গেল।

অন্ধকারে চোখ মেলে তাকিয়ে সুতনয় স্বপ্নটার কথা ভাবছিল। চোখে একটা জ্বালাও যেন টের পাচ্ছিল। স্বপ্নে ও যা দেখেছে তা কি কখনও সত্যি হতে পারে? একটা জড় পদার্থ কি স্পিটিং কোবরার মতো বিষ ছুড়ে দিতে পারে? এই স্বপ্ন যদি সত্যি হয়, তা হলে? কোনদিন হয়তো ওই জিনিসটা রূপানের চোখে বিষ ছুড়ে দেবে!

নাঃ, যেমন করে হোক ওটার দফারফা করতে হবে।

ঠিক তখনই একটা শব্দ কানে এল। খুব চাপা, ছোট্ট শব্দ। কিন্তু শব্দটার চরিত্র এমন, যেন কেউ ছটফট করছে।

প্রথমেই সুতনয়ের মনে হল ইঁদুরের কথা। ওদের এই পুরোনো বাড়িতে ইঁদুরের যা উৎপাত! সবসময়েই এটা কাটছে, ওটা খাচ্ছে। পাড়ার দুটো অনাথ বেড়ালকে মাঝে-মাঝে খাবার-টাবার দিয়ে শর্মি ডেকে আনে। তারা সেই খাবার তো চেটেপুটে খায়ই, তার ওপর কয়েকটা ইঁদুর সাবাড় করে শর্মিকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে যায়। কিন্তু তাতে আর কী! দেখা গেছে, ইঁদুরের অকালমৃত্যুর হারের চেয়ে তাদের বংশবৃদ্ধির হার যথেষ্ট বেশি।

একটা মিষ্টি গন্ধও সুতনয়ের নাকে এল। এই গন্ধটা যেন চেনা, অথচ অচেনা। আগে কোথায় যেন পেয়েছে এই গন্ধটা। মনে আসছে, কিন্তু তারপরই পিছলে মিলিয়ে যাচ্ছে। যেন সুতনয়ের সঙ্গে লুকোচুরি খেলছে।

নাক আর কানের দু-দুটো সিগন্যাল সুতনয়কে বিছানা থেকে তুলে দিল। বালিশের পাশ থেকে ছোট একটা টর্চ তুলে নিয়ে ও বিছানা থেকে নেমে পড়ল।

শব্দটা আসছে পাশের ঘর থেকে।

পাশের ঘরটা ড্রয়িংরুম। তবে ওই নামেই। সবসময় জিনিসপত্রে বোঝাই হয়ে জবরজং অবস্থা। ওদের তিনটে ঘরই মাপে ছোট হওয়ায় বসবার ঘরের এই করুণ দশা। ঘরে আসবাবপত্র বলতে একটা বড়সড় ডিভান—একদিকের দেওয়াল ঘেঁষে রাখা। এ ছাড়া একটা শৌখিন বুককেস কাম শো-কেস। আর একটা টি-টেবিল এবং দুটো ফাইবারের বক্স ডিজাইনের টুল।

ডিভানের প্রায় অর্ধেকটা শর্মি আর রূপানের জামাকাপড়ে ভরতি। তারই

পাশে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড় করানো সুতনয়ের হাওয়াই গিটার—এককালে ও গিটার চর্চা করত।

ড্রয়িংরুমে ঢুকতেই শব্দ এবং গন্ধ দুটোই জোরালো হল। সুতনয়ের হাতের টর্চ জ্বলে উঠল। টর্চটা অনুমানে মেঝের দিকে তাক করেছিল ও। তাই আলোর বৃত্তটা মেঝেতে পড়ে উপবৃত্ত হয়ে গেল।

মাত্র কয়েক সেকেন্ড। তারপরই শব্দ আর গন্ধের কারণটা সুতনয়ের টর্চের আলোয় ধরা পড়ল।

সুতনয় একটা ধাক্কা খেল যেন। এ কী দেখছে ও!

দু-লাফে আলোর সুইচের কাছে পৌঁছে গেল। চট করে আলো জ্বেলে দিল।

উজ্জ্বল আলোয় একটা ইঁদুরকে দেখা গেল। আর দেখা গেল গোলাপি প্লাস্টিসিনের ডেলাটাকে। অদ্ভুত দৃশ্যটা স্পষ্টভাবে চোখে পড়ল।

ডিভানের কাছে, ঘরের বাঁ-দিকের দেওয়ালের পাশে, একটা মাঝারি মাপের ইঁদুর প্রবল লাফালাফি করছে। ইঁদুরটার চোখ ঢাকা, কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। কারণ, গোলাপির ওপরে কালো ফুটকি দেওয়া চাইনিজ ক্লে-র দলাটা ওর দু-চোখের ওপরে আঠার মতো সেঁটে বসে আছে। ইঁদুরটার শত লাফালাফিতেও ওটা খুলে পড়ে যাচ্ছে না।

প্লাস্টিসিনটা থেবড়ে এঁটে থাকায় ওটা অনেকটা ছড়িয়ে গেছে—দৈর্ঘ্যেও বেড়ে গেছে খানিকটা। এই বাড়তি দৈর্ঘ্য দিয়ে সেটা ইঁদুরটার গলার কাছটাও মাফলারের মতো পেঁচিয়ে ধরেছে।

ইঁদুরটা প্রাণপণে কিচকিচ করে আওয়াজ করছিল। যতটা পারছিল ওর ছোট ছোট পা দিয়ে অদৃশ্য শত্রুর সঙ্গে লড়াই করার চেষ্টা করছিল। কিন্তু দু-চোখ ঢাকা এবং গলায় ফাঁস—এই অবস্থায় কতটুকুই বা লড়াই করা যায়!

সুতনয় এক মুহূর্তে পরিস্থিতি আঁচ করে ফেলল এবং নিয়মিত ক্রিকেট খেলার অভ্যেস থাকায় রিঅ্যাক্টও করল খুব তাড়াতাড়ি।

ঘরের পরদার একটা বাতিল রড ডানদিকের দেওয়ালের কোণে দাঁড় করানো ছিল। ওটা পলকে শক্ত মুঠোয় আঁকড়ে ধরে ইঁদুর এবং তার গোলাপি শত্রুকে তাক করে সপাটে বসিয়ে দিল।

গোলাপি পিণ্ডটা যে নড়াচড়ায় বিদ্যুতের মতো ক্ষিপ্র সেটা বোঝা গেল তখনই। ইঁদুরটাকে ছেড়ে ওটা একলাফে ছিটকে গেল ডিভানের নীচে, অন্ধকারে।

ধাতুর রডের সঙ্গে পাথরের মেঝের সংঘর্ষে 'ঠং' শব্দ হল। কারণ রডের আঘাত কারও গায়েই লাগেনি।

ইঁদুরটা নেতিয়ে পড়ে কাঁপছিল। ওটার মুখ দিয়ে দু-ফোঁটা রক্ত বেরিয়ে এসেছে মেঝেতে। দেখেই বোঝা যাচ্ছিল, ওটা আর বাঁচবে না।

সুতনয়ের বুক টিপটিপ করছিল। বড়-বড় শ্বাস ফেলছিল ও।

এমন সময় একটা তীক্ষ্ণ চিৎকারে ও চমকে উঠল। ঠিক ওর পিছন থেকেই এসেছে চিৎকারটা। কিন্তু ও গলার স্বরটা ঠাহর করতে পারেনি। কারণ, ভীষণ ভয়ে চিৎকার করলে শর্মির গলা যে এমন পালটে যায় সেটা সুতনয় জানত না।

জানত না শর্মিও।

ও পিছন থেকে সুতনয়কে আঁকড়ে ধরেছিল। থরথর করে কাঁপছিল। ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদছিল।

হাতের রডটা ফেলে দিয়ে সুতনয় শর্মিকে জড়িয়ে ধরল। মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে-দিতে বলল, 'চুপ করো। চুপ করো। কেঁদো না। সব বলছি। কোনও ভয় নেই...কোনও ভয় নেই...।'

শর্মি কিছুটা শান্ত হল। তবে কান্না থামলেও ওর কাঁপুনি থামছিল না। মরা ইঁদুরটার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল, 'ব্যাপারটা কী। ওই জিনিসটা কী? ওটার কী হবে?'

'মানে? ইঁদুরটার?'

'না। ইঁদুরটা তো মরে গেছে।' দম নিয়ে বলল শর্মি, 'ওটার। যেটা ডিভানের নীচে লুকিয়ে পড়ল। আমার কেমন ভয় করছে...।'

কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থেকে সুতনয় জবাব দিল, 'এখন খুঁজলে ওটাকে আর পাওয়া যাবে না...।'

কিন্তু শর্মি হাল ছাড়ার পাত্রী নয়। ও একটু জেদি গলায় বলল, 'না—এখনই একবার খুঁজে দ্যাখো...নইলে আমার ভয় করবে...।' একটু থেমে তারপর বলল, 'তুমি সেদিন এটাকেই খুঁজছিলে?'

সুতনয় ডিভানের নীচের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে ছিল। আনমনাভাবে মাথা নেড়ে জানাল 'হ্যাঁ'। কিন্তু ও ঠিক তখনই প্লাস্টিসিনটাকে খুঁজতে চাইছিল না। এক, ও জানত ওটাকে পাওয়া যাবে না। আর দুই, ভয়ের বেশ কিছু ছোট-বড় কণা ওর মনের মধ্যে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল।

শেষ পর্যন্ত শর্মির জেদের কাছে কাবু হয়ে গেল। ওরা দুজনে মিলে মাঝরাতে যে-খানাতল্লাশ শুরু করল তার কাছে চিরুনিতল্লাশিও হার মেনে যাবে।

ঝাঁটা আর লাঠিসোটা নিয়ে শর্মি আর সুতনয় কাজ শুরু করল। ডিভানটা

যতটা পারা যায় কম শব্দ করে টেনে সরিয়ে নিয়ে এল ঘরের মাঝখানে। কারণ, পাশের ঘরে রূপান ঘুমোচ্ছে। তারপর উবু হয়ে বসে পড়ল সুতনয়। প্রাণপণে পাগলের মতো ঝাঁটা চালাতে লাগল। একসময় মেঝেতে গাল ঠেকিয়ে হামাগুড়ি দেওয়া শুরু করল। ঝাঁট দেওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে অন্ধকারে নজর চালাতেও চেষ্টা করল।

কিন্তু কোনও লাভ হল না। শুধু একরাশ ধুলো ঘরের মধ্যে উড়তে লাগল। শর্মি নাকে নাইটি চাপা দিয়ে ভয় আর কৌতূহল নিয়ে ডিভানের নীচে মেঝের দিকে তাকিয়ে রইল—যদি ঝাঁটার ঝাপটে গোলাপি প্লাস্টিসিনটা ছিটকে বেরিয়ে আসে।

কিন্তু এল না। তার বদলে টুকিটাকি কয়েকটা তুচ্ছ জিনিস বেরিয়ে এল। প্লাস্টিকের বোতলের দুটো নীল রঙের ছিপি। রূপানের পুরোনো ভাঙা খেলনার দুটো টুকরো। একটা পঞ্চাশ পয়সার কয়েন। আর একটা ছোট্ট জং ধরা চাবি।

সুতনয় হাঁপাচ্ছিল। ঘামছিল। হতাশ হয়ে এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়ল। তারপর মরা ইঁদুরটার দিকে তাকাল। মেঝেতে রক্তের ফোঁটা জমাট বাঁধছিল। হালকা একটা আঁশটে গন্ধও নাকে আসছিল।

সুতনয় উঠে দাঁড়াল। হাঁটু দুটো বেশ ব্যথা করছে। ও বিমূঢ় চোখে শর্মির দিকে তাকিয়ে রইল। যার অর্থ, এবার কী করব?

কয়েক সেকেন্ড ঠোঁট কামড়ে চুপ করে রইল শর্মি। কী যেন ভাবতে লাগল।

ক্লান্ত সুতনয় অবসাদের গলায় থেমে-থেমে শর্মিকে সব বলতে লাগল। কীভাবে রূপান বিছানায় বসে খেলছিল, আর গোলাপি চাইনিজ ক্লে-টা খুশিমতো চেহারা পালটাচ্ছিল। রূপানের সঙ্গে মজা করছিল।

শর্মি চোখ বড়-বড় করে শুনল শুধু—কোনও কথা বলতে পারল না।

কথা শেষ হওয়ার পর কিছুক্ষণ ওরা দুজনে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল।

একসময় শর্মি আলতো গলায় বলল, 'ইঁদুরটা ফেলে দাও। জায়গাটা নোংরা হয়ে আছে...।' ওর চোখে-মুখে ঘেন্না ফুটে উঠেছে।

সুতনয় কেমন আনমনা হয়ে পড়েছিল। শর্মির কথাগুলো কানে ঢুকতেই যেন ঘোর কাটিয়ে জেগে উঠল। হ্যাঁ, জায়গাটা পরিষ্কার করতে হবে।

এমন সময় পাশের ঘর থেকে রূপানের চাপা কান্নার শব্দ কানে এল।

'তুমি ও-ঘরে যাও। আমি এদিকটা দেখছি—।'

শর্মি তাড়াতাড়ি চলে গেল। দেখে মনে হল যেন পালিয়ে বাঁচল। তবে যাওয়ার আগে সুতনয়কে বলে গেল, 'বেগন স্প্রে-টা নিয়ে এ-ঘরটায় ভালো

করে স্প্রে করে দাও। তাতে যদি ওটার কিছু হয়...।'

সুতনয়ের মনে হল, ওই স্প্রে দিয়ে গোলাপি প্লাস্টিসিনের ডেলাটাকে কিছু করা যাবে না। কিন্তু তবুও ও ভেতরের একটা ছোট্ট ঘরের দিকে হেঁটে গেল, বেগন স্প্রে-র একটা ক্যান নিয়ে ফিরে এল ড্রয়িংরুমে।

তারপর কাজ শুরু করল।

মনের মধ্যে একটা ঘেন্না তো ছিলই, তার সঙ্গে ভয়ও ছিল খানিকটা। যতবারই মরা ইঁদুরটার দিকে ওর চোখ যাচ্ছিল ততবারই সেই দৃশ্যটা চোখের সামনে ভেসে উঠছিল : গোলাপি ঠান্ডা প্লাস্টিসিনটা ইঁদুরটার চোখের ওপরে লেপটে সেঁটে আছে, আর 'অন্ধ' ইঁদুরটা দিশেহারাভাবে পাগলের মতো লাফাচ্ছে।

ঘরটা মোটামুটি সাফ করার পর স্প্রে করার কাজ শুরু করল সুতনয়। এত স্প্রে করল যে, ওর চোখ জ্বলতে লাগল, শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল।

তারপর এক সময় বেগনের ক্যানটা ঘরের এক কোণে নামিয়ে রাখল। আলোটা অফ করে বলতে গেলে একরকম পালিয়েই চলে এল ঘর থেকে।

মনে তখনও ওর একটা প্রশ্ন ঘোরাফেরা করছিল : পুরোনো প্রশ্ন। শয়তান গোলাপি ক্লে-টা গেল কোথায়? ওটা কি লুকিয়ে পড়েছে? ওটার কি বুদ্ধি করে লুকিয়ে পড়ার ক্ষমতা আছে?

তারপরই সুতনয়ের হঠাৎ মনে হল, জিনিসটা কি গোলাপি প্লাস্টিসিনের ছদ্মবেশে কোনও প্রাণী? এমন প্রাণী, যে ভাবতে পারে, শিকার করতে পারে, আবার মানুষের সঙ্গে লুকোচুরি খেলতে পারে?

না, সে যা-ই হোক, কাল থেকে সুতনয়ের একটাই মিশন : ওটাকে খুঁজে বের করা এবং খতম করা এবং খতম করা।

বাকি রাতটা ওর একফোঁটাও ঘুম এল না।

সুতনয় আর শর্মি ভয়ে-ভয়ে থাকলেও পরপর ছ'টা দিন নিরাপদে কেটে গেল। ফলে যতই দিন যেতে লাগল ভয়টাও একটু-একটু করে ক্ষয়ে যেতে লাগল। শর্মির পরামর্শে রোজ রাতে প্রতিটি ঘরে বেগন স্প্রে-র ক্যান নিয়ে কষে স্প্রে করাটা সুতনয়ের স্ট্যান্ডার্ড ডিউটি হয়ে দাঁড়িয়েছে। শর্মির ধারণা, বেগন স্প্রে-র তেজেই ওই অদ্ভুত জিনিসটা ওদের বাড়ি ছেড়ে পালিয়েছে। সে কথা বেশ কয়েকবার বলেছেও সুতনয়কে। সুতনয় মাথা নেড়ে ওর কথায়

সায় দিলেও ঠোঁটের কোণ কামড়ে থেকেছে। কারণ, ওর মন সেটা মেনে নিতে চাইছিল না।

গোলাপি প্লাস্টিসিনটা উধাও হয়ে যাওয়ায় রূপান রোজই ঘ্যানঘ্যান করছে। সুতনয়কে রোজ বলছে, 'বাপি, আমার পিংক ফ্রেন্ড কোথায় গেল? ওকে ডেকে নিয়ে এসো—আমি ওর সঙ্গে খেলব। প্লিজ, বাপি—।'

সুতনয় আর শর্মি যতই বলে, পিংক ফ্রেন্ড হারিয়ে গেছে, বাচ্চাটা ততই মাথা নেড়ে বলে, 'আমি জানি না! যেখান থেকে পারো আমার ফ্রেন্ডকে খুঁজে নিয়ে এসো...।'

গোলাপি 'শত্রু' টাকে খোঁজার জন্য সুতনয় যে ছেলের বায়নার জন্য অপেক্ষা করছিল এমন নয়। ও নিজের তাগিদেই একটা ভয় আর জেদ নিয়ে ওটাকে রোজ খুঁজছিল। মনে-মনে ঠিক করেছিল, ওটাকে খুঁজে পেলে ওটার গায়ে কেরোসিন তেল ঢেলে পুড়িয়ে শেষ করবে। কিন্তু খুঁজে পেলে তারপর তো!

ওরা দুজনেই সবসময় সজাগ থাকার চেষ্টা করে। দিনে-রাতে যখনই হোক কোথাও সামান্য 'খড়মড়' শব্দ পেলেই সেখানে ছুটে যায়। জিনিসপত্রের আড়াল সরিয়ে দ্যাখে আওয়াজটা কীসের। কিন্তু বারবারই ওরা হতাশ হয়েছে। শত্রুর দেখা পায়নি। তার বদলে ইঁদুরের দেখা পেয়েছে বহুবার, আর বেড়ালের দেখা পাওয়া গেছে দুবার।

তাই, শেষ পর্যন্ত, হতাশ হলেও ওরা স্বস্তি পেয়েছে। ওদের মনে হয়েছে, আপদ বিদেয় হয়েছে। কিন্তু...।

কিন্তু সাতদিনের দিন একটা মরা ইঁদুর পাওয়া গেল রান্নাঘরে। ইঁদুরের জ্বালায় উত্যক্ত হয়ে শর্মি যখন এদিক ওদিক ইঁদুর মারার বিষ ছড়িয়ে রাখে তখন দু-একটা এরকম ডেডবডি পাওয়াটা অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু এই মরা ইঁদুরটাকে দেখে শর্মি আর সুতনয় দুজনেই বুঝতে পারল ওটা বিষ খেয়ে মরেনি। প্রথমত, শর্মি এর মধ্যে ইঁদুর মারার বিষ ছড়ায়নি। আর দ্বিতীয়ত, ইঁদুরটার মুখের কাছে মেঝেতে দু-ফোঁটা রক্ত জমে আছে।

ওদের দুজনের চোখাচোখি হল! শর্মির মুখটা পলকে ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। সুতনয়ের মনে কালো ভয়ের ছায়াটা আবার ফিরে এল একলাফে।

এখন ও কী করবে?

ব্যাপরাটা এমন অদ্ভুত আর উদ্ভট যে, কাউকে খুলে বলা যাবে না, পরামর্শও করা যাবে না। কারণ, এই ব্যাপারটা শোনামাত্রই যে-কেউ হেসে উঠবে, সুতনয়

আর শর্মিকে পাগল ঠাওরাবে। এর একটি বর্ণও কেউ বিশ্বাস করবে না।

সুতনয় শর্মির পিঠে হাত বুলিয়ে ভরসা দিল। বলল, কোনও ভয় নেই। গোলাপি প্লাস্টিসিনের ডেলাটাকে ও একেবারে মরিয়া হয়ে খুঁজবে। খুঁজে বের করে ওটার পিণ্ডি চটকাবে। দেখবে, কেমন করে ওটা সুতনয়ের নজর এড়িয়ে বাঁচে!

কিন্তু কথাগুলো বলার সময় সুতনয় নিজেই বুঝতে পারছিল, শব্দগুলো কেমন ফাঁপা শোনাচ্ছে।

ওটার সঙ্গে মোকাবিলা করার জন্য সুতনয় বেশ কয়েকটা হাতিয়ার তৈরি রেখেছে। একটা ক্রিকেট ব্যাট, একটা ফুট তিনেক লম্বা জি. আই. পাইপের টুকরো। আর একটা পুরোনো হকি স্টিক। স্কুলে পড়ার সময় ও হকি খেলত, পরে ক্রিকেটের দিকে ঝোঁক এসে যায়। কিন্তু হকি স্টিকটা ও হারায়নি।

ও মনে-মনে গোলাপি প্লাস্টিসিনের ডেলাটার মুখোমুখি হতে চাইল। ওর চোয়াল শক্ত হল। দাঁতে দাঁত চেপে বিড়বিড় করে বলল, 'কোথায় রে তুই?...'

এই প্রশ্নটার উত্তর সুতনয় পেল মাঝরাতে।

এমনিতেই ইদানীং ওর ঘুম পাতলা হয়ে গেছে। চিন্তায়-চিন্তায় চোখের কোলে কালচে ছোপ পড়েছে। চেহারাও রোগা হয়েছে খানিকটা।

একটা বিচিত্র শব্দে ওর তন্দ্রা-ঘুম ছুটে গেল।

অন্ধকারে একটা মিহি শব্দ ভেসে আসছে। যেন খুব আস্তে কেউ শিস দিচ্ছে। কিন্তু শব্দটা এলোমেলো, কাটা-কাটা।

বিছানা ছেড়ে আলগোছে উঠে পড়ল। অন্ধকারে হাতড়ে ছোট টর্চটা মুঠোয় নিয়ে নিল। তারপর খাট থেকে নেমে দেওয়ালের কাছে। হাত বাড়াতেই হকি স্টিক ডানহাতে চলে এল।

এইবার!

শোওয়ার ঘরের বাইরে এসে দাঁড়াল। দারজাটা আবার টেনে ভেজিয়ে দিল।

সামনে ছোট মাপের ডাইনিং স্পেস। সেখান থেকেই আসছে শিসের শব্দটা। তার সঙ্গে হালকা ছুটোপাটির শব্দ।

না, টর্চ জ্বালবে না সুতনয়। পা টিপে-টিপে পৌঁছে যাবে সুইচবোর্ডের কাছে। তারপর আলোর সুইচটা অন করে দেবে।

'গোলাপি' মনে হয় আবার একটা ইঁদুর শিকার করেছে।

আলো জ্বালার ঠিক আগের মুহূর্তে দুটো সবুজ চোখ দেখতে পেল। আর আলো জ্বালতেই তার মালিককে দেখা গেল।

ইঁদুর নয়—বেড়াল।

কিন্তু চোখের সামনে এ কী অদ্ভুত দৃশ্য!

ওর শরীরের ভেতরে শিরায়-শিরায় একটা ঠান্ডা স্রোত বয়ে গেল।

একটা সাদা-কালো বেড়ালের চোখের ওপরে গোলাপি চ্যাপটা হয়ে সেলোটেপের মতো সেঁটে আছে, আর বেড়ালটা ছটফট করে বারবার শূন্যে লাফাচ্ছে, সামনের দু-পায়ের থাবা দিয়ে প্রাণপণে গোলাপিকে চোখের ওপর থেকে সরিয়ে ফেলতে চেষ্টা করছে।

কিন্তু পারলে তো!

বেড়ালটা এবার মুখ দিয়ে 'ওঁয়াও' শব্দ বের করে ফেলল। মাথা ঝাঁকিয়ে, থাবা ঘষে ও চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু সেটা এখনও শুধু চেষ্টাই।

সুতনয়ের চোখের সামনে গোলাপি নিজেকে আরও ছড়িয়ে দিল। যেমন করে ময়দার লেচি বেলতে-বেলতে মাপে বড় হয়।

চোখের সঙ্গে এবার বেড়ালটার নাক আর মুখও ঢেকে গেল গোলাপি চাদরে। তার ওপরে কালো ছিটছিট ব্যাপারটা বেড়ালটার মুখটাকে কেমন অদ্ভুত করে তুলল। মনে হচ্ছিল, ওটা যেন এক অজানা দেশের চিতাবাঘ।

বেড়ালটা আর কোনও শব্দ করতে পারছিল না। নাক-মুখ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় ওটা পাগলের মতো উথালপাতাল করছিল। মেঝেতে গড়াচ্ছিল, ঘুরপাক খাচ্ছিল। মুখের ওপরে হিংস্রভাবে থাবা ঘষছিল।

শরীরের ভেতরে ঠান্ডা স্রোতের সঙ্গে একটা চিনচিনে অস্বস্তি টের পেল সুতনয়। হকি স্টিক আর টর্চ হাতে নিয়ে ও সিনেমার একটা ফ্রিজ শট হয়ে গেছে যেন। ওর চোখের সামনে বেড়ালটার ছটফটানি কমতে শুরু করল। চাপা শিসের শব্দ এখন আবার স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে। ওটা মাঝে-মাঝে ছিটকে আসছে গোলাপির দিক থেকেই। সেইসঙ্গে আরও কিছু খুচরো শব্দ।

'কী হল? তুমি কোথায়?'

শর্মি!

বিছানায় ওকে দেখতে না পেয়ে জেগে গেছে।

শর্মির ডাকে সুতনয়ের ঘোর কেটে গেল। ও হাতের টর্চটা গোলাপিকে লক্ষ্য করে ছুড়ে মারল। একটা শো-কেসের কালো শেডের কাচ ঝনঝন করে ভেঙে গেল। সুতনয় এক সেকেন্ডও সময় নষ্ট না করে সামনে এক পা লাফিয়ে বেড়ালটার মুখ তাক করে হকি স্টিক বসিয়ে দিল।

বেড়ালটার এমনিতেই বাঁচার আশা ছিল না। নইলে সুতনয় কখনওই ওভাবে

হকি স্টিক চালাত না। তা ছাড়া বেড়ালটা চেনা বেড়াল। মাঝে-মাঝে ইঁদুর ধরতে ওদের ঘরে ঢোকে, আর মাছের মুড়ো কিংবা কাঁটার খোঁজে শর্মির কাছে আসে। শর্মির আন্তরিক পরিষেবা পায়।

টর্চটা গোলাপি অথবা বেড়ালের গায়ে লাগেনি। কিন্তু হকি স্টিকটা সোজা বেড়ালটার মুখের ওপরে গিয়ে লাগল।

সুতনয় ভুল দেখল কি না কে জানে! কিন্তু মনে হল, হকি স্টিকের বাড়ি খেয়ে গোলাপি কিলবিল করে উঠল। তারপরই নিজেকে গুটিয়ে ছোট করে নিল। এবং বন্দুকের গুলির মতো ছিটকে চলে গেল একটা আলমারির নীচে।

সুতনয় রাগে আর হতাশায় চিৎকার করে উঠল। একইসঙ্গে ওর পিছনে শোওয়ার ঘরের দরজা খুলে গেল আর শর্মি চেঁচিয়ে 'কী হয়েছে? কী হয়েছে?' বলতে-বলতে ওর কাছে এসে দাঁড়াল। আচমকা কাচ ভাঙার শব্দে ওর বুক ঢিপঢিপ করছে।

সুতনয় কোনও কথা বলল না। শুধু আঙুল দিয়ে মরা বেড়ালটার দিকে দেখাল। ওর ঘাড়ে, কপালে, ঘামের ফোঁটা।

শর্মি আতঙ্কে মুখের ওপরে হাত চাপা দিল। কোনওরকমে জিগ্যেস করল, 'কী করে হল?'

সুতনয় প্রায় ফিসফিস করে উচ্চারণ করল, 'গোলাপি—।'

'ওটাকে মারতে পারোনি?' শর্মির গলাও কেন যেন নীচু পরদায় নেমে এল।

'না—' মাথা নাড়ল : 'ওই আলমারিটার নীচে পালিয়ে গেছে। এখন আর ওটাকে খুঁজে পাওয়া যাবে না। ওটার বুদ্ধি আছে...।'

'তার মানে!' শর্মির চোখ বড়-বড় হল : 'আমরা এখন তা হলে কী করব?'

সুতনয় চুপ করে রইল। এই প্রশ্নের উত্তর ওর জানা নেই। ওর এও জানা নেই, ওই গোলাপি প্লাস্টিসিনটা আসলে কী। ওটা কি কোনও অপদেবতা? নাকি ভিনগ্রহের কোনও মারাত্মক প্রাণী?

সুতনয়ের বুক ঠেলে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল। এরপর ও কী করবে? কপালের কোনও বিপদ হবে না তো?

না, সেটা বোধহয় হবে না। হলে আরও আগেই হতে পারত।

কিন্তু গোলাপিকে ও খুঁজে পাবে কেমন করে? আর ওই শয়তানটাকে খতমই বা করবে কেমন করে?

শর্মিও তখন ওই গোলাপি প্লাস্টিসিনের ডেলাটার কথাই ভাবছিল।

ভাবতে-ভাবতে চারদিন কেটে গেল। কিন্তু সবকিছু একইরকম রয়ে গেল। শর্মি আর সুতনয়ের দুশ্চিন্তা। সুতনয়ের প্রশ্নমালা। গোলাপির উধাও অবস্থা।

সুতনয়ের মনে হচ্ছিল, ও চিন্তায়-চিন্তায় যেন পাগল হয়ে যাবে। ওর চোখের কোল বসে গেছে। মুখে কয়েকটা বাড়তি ভাঁজ দেখা দিয়েছে। ও অফিস কামাই করতেও শুরু করেছে। চোখের নজর সতর্ক, চঞ্চল। সবসময় রূপানকে আগলে রাখছে।

সুতনয়ের চেয়ে বেশি আতঙ্কে রয়েছে শর্মি। ও এর মধ্যেই সুতনয়কে বাড়ি পালটানোর কথা বলেছে। ছেলেকে ছেড়ে এদিক-ওদিক কোথাও যেতে চাইছে না। এই ক'দিনে শর্মিও বেশ রোগা হয়ে গেছে।

শর্মি একবার ওঝা ডেকে ঝাড়ফুঁক যাগযজ্ঞ এসব করার কথা তুলেছিল, কিন্তু সুতনয় সঙ্গে-সঙ্গে তেড়ে উঠে সেসব প্রস্তাব খারিজ করে দিয়েছে। ওর মধ্যে এক অদ্ভুত ধরনের ক্ষিপ্ত আক্রোশ টগবগ করে ফুটছিল। কোনওদিনই রাতে ও ঘুমোতে পারছিল না। ছোটখাটো যে-কোনও আওয়াজেই তড়াক করে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ছিল। অন্ধকারের মধ্যেই অলৌকিক ক্ষিপ্রতায় হকি স্টিক কিংবা ক্রিকেট ব্যাটটা খামচে ধরছিল।

সেদিন রাতে অন্ধকারে চুপচাপ শুয়ে ছিল ও। ঘুম আসছিল না যথারীতি। কখনও ক্লান্তিতে চোখ বুজে আসছিল, আবার একটু পরেই তন্দ্রা ভেঙে চমকে জেগে উঠছিল।

রাত তখন কত হবে কে জানে! একটা বাজে স্বপ্ন দেখছিল সুতনয়। গোলাপি রঙের তুলতুলে আঠালো একটা জিনিস ওদের ফ্ল্যাটের সব জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছে। তারপর সেটা শুঁয়োপোকার মতো ঘরের প্রতিটি দেওয়াল বেয়ে উঠছে। একইসঙ্গে মেঝেতে ওটা জমে উঠছে—ঠিক বৃষ্টির জলের মতো। প্রথমে সুতনয়ের গোড়ালি, তারপর হাঁটু, উরু, কোমর, ধীরে-ধীরে সেই গোলাপি আঠালো জিনিসটায় ডুবে যেতে লাগল। সুতনয় শুনতে পেল, একটা বাচ্চা ছেলে চিৎকার করে কেঁদে উঠল।

রূপান কি কাঁদছে?

'রূপান! রূপান!' করে চেঁচিয়ে উঠল ও।

সঙ্গে-সঙ্গে তন্দ্রা ছুটে গেল। স্বপ্নও গেল ভেঙে।

ও জেগে উঠল।

গলা শুকিয়ে কাঠ। ও মনে করতে পারছিল না, ঘুমের মধ্যে ও সত্যি-সত্যি রূপানের নাম ধরে চেঁচিয়ে উঠেছিল, নাকি চেঁচায়নি।

বিছানায় উঠে বসল। জানলা দিয়ে একফালি আলো এসে পড়েছে। ল্যাম্পপোস্টের আলো।

শর্মি আর রূপানকে আবছা দেখা যাচ্ছে। ওরা অসাড়ে ঘুমোচ্ছে। শর্মির হালকা নাক ডাকার শব্দ শোনা যাচ্ছে।

হাত বাড়িয়ে জলের বোতল নিল সুতনয়। ঢকঢক করে জল খেল। তারপর ঘাড়ে সামান্য জলের ছিটে দিয়ে আবার শুয়ে পড়ল।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই ওকে অবাক করে দিয়ে ওর চোখে ঘুম জড়িয়ে গেল।

একটু পরেই আবার ও স্বপ্ন দেখতে শুরু করল।

একটা কালো রঙের চাদর ওর মুখের ওপরে নেমে আসছে। ওকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরছে। ওর দম বন্ধ হয়ে আসছে। ও শর্মির নাম ধরে চিৎকার করতে চাইছে, কিন্তু পারছে না। বারবার চেষ্টা করছে...চেষ্টা করছে...।

ঘুম ভেঙে গেল। দরদর করে ঘামছে। চারদিক ঘুটঘুটে অন্ধকার। রাস্তা থেকে ছিটকে আসা আলো রাতে যে-নকশা তৈরি করে সেটা চোখে পড়ছে না।

সুতনয়ের অবাক লাগল। ওর চোখ কি বন্ধ?

চোখ মেলে তাকাতে গিয়ে মনে হল, হ্যাঁ, চোখ বন্ধ। এবং চোখের ওপরে একটা হালকা কোমল চাপ যেন নড়েচড়ে বেড়াচ্ছে।

সুতনয় পলকে পাগল হয়ে গেল। ও কি এখনও স্বপ্ন দেখছে? মোটেও না! আর-একবার চোখ খুলতে চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না। কানামাছি খেলার মতো কে যেন একটা নরম পটি সেঁটে দিয়েছে ওর চোখের ওপরে।

চোখে হাত চলে গেল ওর। কিন্তু ও নিজের চোখ ছুঁতে পারল না। তার বদলে নরম এবং ঠান্ডা কোনও জিনিসে হাত পড়ল। জিনিসটা যেন ফ্রিজ থেকে বের করে আনা ময়দার লেচি।

সেটাকে টেনে সরাতে গিয়ে বুঝল কাজটা সহজ নয়। জিনিসটা চুইংগামের আঠালো ছিবড়ের মতো নাছোড়বান্দা হয়ে দু-চোখের ওপরে আটকে রয়েছে।

সিনেমার ফ্ল্যাশব্যাকের মতো ওর ইঁদুর আর বেড়ালটার অসহায় অবস্থার কথা মনে পড়ল।

একটা ঠান্ডা আতঙ্ক সুতনয়কে অসাড় করে দিতে চাইল। ও বিকৃত গলায়

এক মরণ চিৎকার করে উঠল। অন্ধ অবস্থাতেই ভয়ংকর এক লাফ দিয়ে মেঝেতে ছিটকে পড়ল।

শর্মির ঘুম ভেঙে গেল পলকে। ও এক ঝটকায় উঠে বসল। ওর বুক ধড়ফড় করছিল।

কোথায় গেল সুতনয়? বিছানায় তো নেই!

তাড়াহুড়ো করে বিছানা থেকে নামতে গেল শর্মি। সুতনয়ের পায়ে পা লেগে উলটে পড়ল। একইসঙ্গে ভয় পাওয়া ভাঙা গলায় চিৎকার করতে লাগল, 'কী হয়েছে? কোথায় তুমি? কোথায়?' অন্ধকারেই চারিদিকে নজর চালিয়ে সুতনয়কে দেখতে চেষ্টা করল।

সুতনয় ততক্ষণে কয়েকবার টাল খেয়ে সোজা হয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। চোখের ওপরে এঁটে বসে থাকা নরম পটিটাকে টানাহেঁচড়া করে ছাড়ানোর চেষ্টা করতে-করতে বলল, 'শিগগির আলোটা জ্বালাও! আমি কিচ্ছু দেখতে পাচ্ছি না...কিচ্ছু না। জলদি জ্বালাও...।'

সুতনয় হাঁপাচ্ছিল। ওর দম বন্ধ হয়ে আসছিল। কথাগুলো কেটে-কেটে যাচ্ছিল।

আলো জ্বালতেই শর্মি একটা মারাত্মক ধাক্কা খেল। বিশাল কালো অন্ধকার গর্তের মতো হাঁ করে এক বুক-কাঁপানো চিৎকার করে উঠল। তারপর ছুটে গিয়ে সুতনয়কে জাপটে ধরল।

গোলাপি প্লাস্টিসিনটা থেবড়ে বসে আছে সুতনয়ের দু-চোখের ওপরে। আর ও পাগলের মতো সেটাকে টেনে আঁচড়ে চোখের ওপর থেকে ছাড়াতে চেষ্টা করছে, কিন্তু পারছে না।

মা-বাবার চেঁচামেচিতে রূপানের ঘুম ভেঙে গেছে একটু আগেই। ব্যাপারস্যাপার কিছু বুঝতে না পেরে ও কয়েক লহমা হতভম্ব হয়ে মা আর বাপিকে পালা করে দেখল। তারপরই তারস্বরে কাঁদতে শুরু করে দিল।

সুতনয় চেঁচিয়ে বলল, 'এই শয়তানটাকে শিগগিরই আমার চোখ থেকে ছাড়াও! জোরে হ্যাঁচকা টান মারো!'

শর্মি ঠিক কী করবে ভেবে পাচ্ছিল না। সুতনয়ের কথায় ও যেন দিশা খুঁজে পেল। দু-হাতে গোলাপিকে আঁকড়ে ধরে খ্যাপার মতো টানতে লাগল।

কিন্তু তাতে এক কণাও কাজ হল না। বরং গোলাপি ধীরে-ধীরে সুতনয়ের নাক বেয়ে নীচে নামতে লাগল।

এরপর সুতনয়ের নাকের ফুটো, ঠোঁট, মুখ, সব গোলাপি প্লাস্টিসিনের

আড়ালে চাপা পড়ে যাবে। ওই বেড়ালটার মতো।

এই কথা ভেবে সুতনয়ের হৃৎপিণ্ড পাগলা ঘোড়ার মতো দৌড়তে শুরু করল। কী করা যায়? কী করা যায় এখন?

শর্মি তখন কাঁদতে-কাঁদতে চিৎকার করছে, 'পারছি না! পারছি না! কিছুতেই এটা ছাড়ানো যাচ্ছে না!'

সুতনয় শর্মিকে ঝটকা দিয়ে সরিয়ে দিল। হাতড়ে-হাতড়ে চলে গেল ঘরের একটা দেওয়ালের কাছে। তারপর সিমেন্টের দেওয়ালে চোখের পটিটাকে চেপে ধরল। মাথাটা জোরে-জোরে এপাশ-ওপাশ ঘষতে লাগল। যদি গোলাপিকে এভাবে ছাড়ানো যায়।

কাটা-কাটা শিসের শব্দ সুতনয়ের কানে এল। কিন্তু ও সেদিকে কান না দিয়ে দেওয়ালে মুখ ঘষতেই থাকল।

ওর কপাল আর নাকের ডগা ছড়ে যেতে লাগল। কিন্তু একইসঙ্গে ওর মনে হল, গোলাপির নাক বেয়ে নেমে আসার গতিটা যেন থমকে গেছে।

তাতে সুতনয়ের মুখ ঘষার উৎসাহ আরও জোরালো হল। কপাল আর নাকের ডগা থেকে রক্ত বেরোচ্ছে। দেওয়ালে আড়াআড়ি লাল-লাল দাগ পড়ছে। নাক আর কপাল অসহ্যরকম জ্বালা করছে। কিন্তু সুতনয় থামছিল না। গোলাপিকে ঘায়েল করতে পারছে ভেবে একটা হিংস্র উল্লাস ওর মনে দানা বাঁধছিল। ও পাগলের মতো দেওয়ালে মুখ ঘষেই চলল।

'এ কী করছ? এ কী করছ?' শর্মি আবার ছুটে এল ওর কাছে। ওর পাগলামো থামাতে পিছন থেকে জাপটে ধরল ওকে।

রূপান এদিকে খাট থেকে নেমে পড়েছে। ভয় পেয়ে কাঁদতে-কাঁদতে ছুটে চলে এসেছে মায়ের কাছে। মায়ের নাইটি খামচে ধরে মায়ের গায়ের সঙ্গে লেপটে থাকতে চাইছে।

সুতনয় একসময় বুঝতে পারল, এভাবে কিছু হবে না। খানিকটা ক্লান্তও হয়ে পড়েছিল ও।

গোলাপির সঙ্গে ধস্তাধস্তি করতে-করতে দরজার দিকে ছিটকে গেল। দরজায় মাথা ঠুকে গেল ওর। তা সত্ত্বেও একটানে দরজা খুলে ও ডাইনিং স্পেসে ঢুকে পড়ল।

শর্মি ভয়ে রূপানকে জড়িয়ে ধরেছিল। একইসঙ্গে ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদছিল। সুতনয়কে ডাইনিং স্পেসে ঢুকতে দেখে রূপানকে ছেড়ে সেদিকে ছুটে গেল। যাওয়ার আগে ছেলেকে ধমকে চিৎকার করে বলল শিগগির বিছানায় উঠে

পড়তে।

রূপান কথা শুনল কি না সেটা আর দেখার সময় ছিল না। কারণ, সুতনয় তখন অন্ধকার ডাইনিং স্পেসে মরিয়া হয়ে ছুটোছুটি করছে। আর নানান জিনিসপত্র ছিটকে পড়ছে, ভেঙে ছত্রখান হচ্ছে। নানান ধরনের আওয়াজে সবকিছু যেন তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে।

শর্মি কোনওরকমে আলোটা জ্বালতে পারল। ঘরের অবস্থা তখন একেবারে শোচনীয়। যেন সেখানে সুনামির মহাতাণ্ডব চলেছে। আর সুতনয় যেন সেই অন্ধ বেড়াল। পাগলের মতো এদিক-ওদিক ছুটে বেড়াচ্ছে, চোখ থেকে গোলাপিকে টেনে ছাড়াতে চেষ্টা করছে। ওর মুখ দিয়ে গোঙানির মতো শব্দ বেরোচ্ছে। সাদা পাজামায় রক্তের দাগ।

এভাবে কতক্ষণ ও যুঝতে পারবে কে জানে!

শর্মি আশপাশের বাড়ি থেকে লোকজন ডেকে আনবে কিনা ভাবছিল। কিন্তু সুতনয়কে এই অবস্থায় ফেলে ও কেমন করে যাবে!

এমন সময় সুতনয়ের ধাক্কা লাগল টিভির সঙ্গে। টিভিটা শৌখিন ক্যাবিনেটের ওপর থেকে টাল খেয়ে পড়ে গেল মেঝেতে। ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। মেইন্‌স কর্ডটা টান লেগে খুলে গেল সকেট থেকে।

শর্মি চিৎকার করে উঠল আবার। সুতনয়কে জড়িয়ে ধরে সামলাতে চাইল।

সুতনয় চোখের ওপরে এবার বাড়তি চাপ টের পাচ্ছিল। আর সেই চাপ কখনও বাড়ছিল, কখনও কমছিল। গোলাপি যেন হয়ে নড়ছে।

ও পাগলের মতো কপালে, গালে, মুখে হাত বোলাতে লাগল। ওর হাতে রক্ত লেগে গেল।

কী করা যায় এখন? কী করা যায়?

'শর্মি! শর্মি!'

'বলো। এই তো আমি...।'

'হাতে আর বেশি সময় নেই।' চোখ থেকে গোলাপি পটিটা ছাড়ানোর চেষ্টা করছিল। হাঁপাতে-হাঁপাতে বলল, 'যা বলছি চটপট সেটা করো—।'

'কী?'

'টিভির প্লাগটা সুইচবোর্ডের সকেটে গুঁজে দাও।'

শর্মি তাড়াতাড়ি ঝুঁকে পড়ল মেঝেতে। প্লাগটা সকেটে লাগাতে গিয়ে দৈর্ঘ্যে টান পড়ল। টিভিটা মেঝেতে পড়ে যাওয়ায় এই বিপত্তি।

সুতনয়কে সেটা বলতেই ও অধৈর্যভাবে হাত নেড়ে বলল, 'ঠিক আছে।

ঠিক আছে। তুমি টিভির কর্ডটা টান মেরে টিভি থেকে ছিঁড়ে নাও। জলদি! তারপর প্লাগটা সকেটে লাগাও...।'

শর্মি তাই করল। এক হ্যাঁচকায় মেইন্‌স কর্ডটা টিভি থেকে ছিঁড়ে নিল। তারপর প্লাগটা সকেটে গুঁজে দিল।

কান্না ভাঙা গলায় বলল, 'হয়ে গেছে। লাগিয়েছি।'

'শিগগির তারটা আমার হাতে দাও! দেখো, যেন খোলা দিকটা তোমার গায়ে না টাচ করে!'

তারটা হাতে পেল সুতনয়। আন্দাজে ভর করে তারের খোলা দিকটা চেপে ধরল নিজের চোখের ওপরে। গোলাপি পটির ওপরে।

'শর্মি, এবারে টিভির সুইচটা অন করে দাও, কুইক!'

শর্মি বাধ্য মেয়ের মতো কথা শুনল। ওর বুক ধুকধুক করছিল।

সুতনয় ভেবেছিল, ইলেকট্রিক শকে হয়তো কাজ হবে—কিন্তু হল না। গোলাপি প্লাস্টিসিনটা বোধহয় ইনসুলেটর।

শুধু একটা চিনচিনে অনুভূতি টের পেল ও। সেইসঙ্গে ছোট-ছোট কয়েকটা শব্দ...তার সঙ্গে মিহি শিসের টুকরো। এও টের পেল, গোলাপি নিজেকে আরও ছড়িয়ে দিচ্ছে ওর মুখের ওপরে। নাক আর নাকের পাশ দিয়ে ওই ভয়ংকর প্লাস্টিসিনটা যেন ঝুলে পড়ছে নীচে। সুতনয়ের নাকে সুড়সুড়ি লাগছিল।

তারটা ছুড়ে ফেলে দিল। রাগে ক্ষোভে চেঁচিয়ে কীসব যে বলল বোঝা গেল না।

শর্মি চিৎকার করে উঠল।

সুতনয়ের চোখজোড়া এর মধ্যেই গরম হয়ে উঠেছে। মনে হচ্ছে যেন জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে। সেইসঙ্গে শুরু হয়েছে এক অদ্ভুত জ্বালা।

এখন কী করবে ও? কী করবে? আর কতক্ষণ সময় আছে হাতে? মরিয়া হয়ে ভাবতে লাগল সুতনয়। ভাবতে-ভাবতেই একটা চিন্তা ওর মাথায় ঝিলিক মেরে গেল।

আগুন! আগুন!

সুতনয় জানে, এতে বিরাট ঝুঁকি আছে, কিন্তু এখন ঝুঁকি নেওয়া ছাড়া আরও কোনও পথ খোলা নেই।

'শর্মি, শিগগির গ্যাস আভেনটা জ্বেলে দাও!' চেঁচিয়ে বলল।

'কেন? গ্যাস জ্বালাব কেন?'

'তর্ক কোরো না! জলদি! আমার হাতে আর বেশি টাইম নেই—।'

সুতনয় তখনও গোলাপিকে হাত দিয়ে টেনেহিঁচড়ে ছাড়াতে চেষ্টা করছে। যন্ত্রণায় শূন্যে ছিটকে উঠছে বার-বার। ঘরময় ছড়িয়ে থাকা ভাঙাচোরা জিনিসের মধ্যে লাফালাফি করলে যা হয় তাই হচ্ছে : ধারালো নানান টুকরো পায়ের নীচে পড়ছে, কখনও বা ধাক্কা খাচ্ছে ভাঙা টিভিটার সঙ্গে। জিনিসপত্রে ছত্রখান মেঝেতে দু-দুবার উলটে পড়ল। যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠল।

কিন্তু ওর যন্ত্রণার চিৎকার এখন বলতে গেলে একঘেয়ে শোনাচ্ছে।

ডাইনিং স্পেসের লাগোয়া রান্নাঘর। রান্নাঘরের কোনও দরজা নেই।

সেখানে ছুটে ঢুকে গেল শর্মি। সুইচ টিপে টিউবলাইট জ্বালাল। তারপর ফোঁপাতে-ফোঁপাতে কাঁপা হাতে গ্যাস লাইটার দিয়ে আভেন ধরাতে চেষ্টা করল। তিন-চারবার মিসফায়ারের পর একটা বার্নারে আগুন ধরল।

এদিকে দেওয়াল, আলমারি, ফ্রিজ ইত্যাদি হাতড়ে-হাতড়ে রান্নাঘরে ঢুকে পড়ল সুতনয়। ওর দিকে তাকিয়ে বুক কেঁপে উঠল শর্মির। কী বীভৎস দেখাচ্ছে সুতনয়কে।

ঘামে ভেজা মুখ। মুখের এখানে-সেখানে রক্ত। চোখ আর নাকের ওপরে লেপটে বসে আছে গোলাপি পটি। তার ওপরে কয়েকটা পোড়া দাগ। মাথার চুল উশকো-খুশকো। পাজামায় কালো-কালো ময়লা দাগের ছোপ। তার সঙ্গে রক্তের দাগ। তার ওপর সেই 'অন্ধ' মানুষটা পাগলের মতো কীসব হিজিবিজি বকছে—তার একটি বর্ণও বোঝা যাচ্ছে না।

'সরে যাও! সরে যাও!' বলে শর্মিকে ঠেলে একপাশে সরিয়ে দিল। তারপর আন্দাজে ভর করে এগিয়ে গেল গ্যাস আভেনের দিকে। চেনা ভূগোল বলে দু-চার সেকেন্ডেই গ্যাস আভেনটাকে হাতের ছোঁয়ায় পেয়ে গেল। তারপর...।

তারপর গুঙিয়ে-গুঙিয়ে কীসব চিৎকার করতে-করতে পাগল মানুষটা ওর মুখ ঝুঁকিয়ে দিল গ্যাসের আগুনের ওপরে।

শর্মি গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠল। শুনতে পেল বাইরের সদর দরজায় কারা যেন ধাক্কা দিচ্ছে। শোওয়ার ঘর থেকে রূপানের কান্না ভেসে এল।

কিন্তু শর্মির সেসব দিকে কান নেই। ও চিৎকার করে সুতনয়কে বলে উঠল, 'কী করছ? কী করছ তুমি? তুমি কি পাগল হয়ে গেছ?'

ততক্ষণে সুতনয়ের চোখের ওপরে আগুনের তাপ। আগুনের শিখা গোলাপি প্লাস্টিসিন ছুঁয়ে ফেলেছে। সুতনয়ের কয়েক গাছা চুল আগুনে পুড়ে কুঁকড়ে গেল। কপালে, গালে অসহ্য তাত।

শেষ মুহূর্ত কি খুব কাছে এগিয়ে আসছে?

পরপর অনেকগুলো ছবি ওর মনের মধ্যে ফ্ল্যাশ করে গেল। মায়ের মুখ। বাবার-হাত ধরে স্কুলে যাচ্ছে। ক্লাব ক্রিকেটে একবার সেঞ্চুরি করেছিল। ব্যাট তুলেছিল আকাশে। মাঠের চারপাশে ছিল বড়জোর পঞ্চাশ-ষাট জন দর্শক। সেঞ্চুরি করার পর সেটাকেই পঞ্চাশ-ষাট হাজার বলে মনে হয়েছিল। সেই দৃশ্যটা চট করে চলে এল চোখের সামনে। তারপর এল শর্মি। আর সবশেষে ছোট্ট প্রিয় বদমাইস দুষ্টু হনুমানটা—রূপান। রূপান। রূপান। ওকে ঘিরে কত স্বপ্ন ছিল! সেগুলো সব সত্যি হতে বাকি। নাকি সব শেষ?

সুতনয়ের মনে হচ্ছিল, আগুনের তাতে ওর মাথা দাউদাউ করে জ্বলছে, ঝলসে যাচ্ছে। ও যেন শেষের খুব কাছে পৌঁছে গেছে।

তারই মধ্যে এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটল।

চাপা যন্ত্রণার গোঙানি বেরিয়ে এল গোলাপির ভেতর থেকে। যেন যন্ত্রণায় কেউ কাতরাচ্ছে আর শিস দিচ্ছে। তার সঙ্গে একটা টক-টক গন্ধ। প্রায় একইসঙ্গে গোলাপি পটিটা সুতনয়ের চোখের ওপর থেকে খসে পড়ে গেল মেঝেতে।

তারপর লকলকে শিখায় জ্বলতে লাগল। কালীপুজোয় দেখা সাপ বাজির মতো। মোটা ছাইয়ের শুঁড় বেরিয়ে আসতে লাগল সেই আগুন থেকে। একটা, দুটো তিনটে, চারটে, পাঁচটা—-মোট পাঁচটা শুঁড়।

ধোঁয়ায়-ধোঁয়ায় রান্নাঘরটা ভরে গেল। ধোঁয়ার গন্ধে আর ঝাঁজে শর্মি আর সুতনয় কাশতে লাগল। কোনওরকমে টলতে-টলতে ছুটে বেরিয়ে এল রান্নাঘর থেকে।

ঠিক তখনই বাইরের সদর দরজাটা মড়মড় করে ভেঙে পড়ার শব্দ শোনা গেল। শোনা গেল অনেক মানুষের গলার আওয়াজ।

গোলাপি তখনও নিজের মতো একমনে দাউদাউ আগুনে পুড়ে চলেছে। শোনা যাচ্ছে ওর কাতরানির করুণ স্বর। সেইসঙ্গে ছোট-ছোট শিস।

ছাইয়ের শুঁড়গুলো লম্বায় ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। নিজেদের খুশিমতো বাঁকিয়েচুরিয়ে পেঁচিয়ে ওরা সুতনয়দের ছুঁয়ে ফেলতে চেষ্টা করছিল।

রূপানের ভয় পাওয়া কান্না এতক্ষণে সুতনয় আর শর্মির কানে গেল। ওরা দুজনে 'রূপান! রূপান!' বলে চিৎকার করে পড়িমরি করে শোওয়ার ঘরের দিকে ছুটে গেল।



ভালোবাসি অন্ধকার

এক

'অন্ধকার যারা ভালোবাসে তারা আসলে অন্ধকারকে শ্রদ্ধা করে, সম্মান করে। যদি প্রশ্ন করেন, কেন? তা হলে তার উত্তর হল, অন্ধকার আমাদের আত্মার মতো—দুর্জ্ঞেয়। আত্মার বলা যেমন গীতায় বলেছে, কোনও শস্ত্র আত্মাকে ছেদন করতে পারে না, আগুন পোড়াতে পারে না, জল ভেজাতে পারে না, বাতাস আত্মাকে শুষ্ক করতে পারে না—ঠিক তেমনই অন্ধকার। আপনারা একটু ভেবে দেখুন, কোনও শস্ত্র অন্ধকারকে ছেদন করতে পারে না। আগুন, জল কিংবা বাতাস অন্ধকারকে কিছুই করতে পারে না। তাই অন্ধকারের মর্যাদা, সম্মান আমার কাছে আত্মার সমান।'

কথাগুলো বলার সময় আমি যথেষ্ট বিশ্বাস এবং আবেগ মিশিয়ে দিয়েছিলাম। তার সঙ্গে নাটকীয় ঢঙে হাতের নানান ভঙ্গি এবং মুদ্রা।

হাততালিতে ঘর ভেসে গেল। আমি মোলায়েম হেসে 'বাও' করে সেই তারিফ গ্রহণ করলাম।

রোগা মতন ফরসা মেয়েটিকে আমি প্রথম থেকেই লক্ষ করছিলাম। কালো আর ছাই রং মেশানো একটা চুড়িদার পরেছে। গলায় একটা সাদা স্কার্ফ।

মাথার চুল বয়কাট, ভেড়ার লোমের মতো কোঁকড়ানো। সকলের হাততালি থেমে যাওয়ার পরেও ওর হাততালি থামেনি। আর কেন জানি না, ব্যাপারটা আমার ভালো লাগছিল।

মেয়েটি আমার সেমিনারে আজ প্রথম এসেছে। কারণ, আগে কখনও ওকে দেখলে আমি অবশ্যই মনে রাখতাম।

আজ আমার লেকচারের বিষয় 'ভ্যাম্পায়ার : অন্ধকারের সন্তান'। আমার সামনের পরদায় একটি ফটোগ্রাফের স্লাইড। কাঠের কফিন থেকে একটি মৃতদেহ বাইরে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করছে। স্লাইডের নীচে ক্যাপশান : দ্য রিস্যাসিটেটেড কর্প্স—মানে, আবার-বেঁচে-ওঠা মৃতদেহ। ফটোগ্রাফটা আমি মন্টেগু সামার্স-এর 'ভ্যাম্পায়ার্স অ্যান্ড ভ্যাম্পায়ারিজ্ম' বই থেকে নিয়েছি।

সিটি সেন্টার-থ্রি-র ছোট এই হলঘরটায় জনা তিরিশেক মতো লোক ধরে। কিন্তু ছোট হলে হবে কী, হলটা এসি, এবং বেশ সাজানো-গোছানো। এখানে পোডিয়াম, প্রোজেকশান স্ক্রিন, পাওয়ার পয়েন্ট প্রোজেক্টার, ল্যাপটপ, লেসার পয়েন্টার সবকিছুরই ব্যবস্থা রয়েছে।

আমি আবার বলতে শুরু করলাম।

'অন্ধকারকে বাদ দিয়ে আমাদের জীবন ভাবা যায় না। আলো থাকলেই সেখানে জন্ম নেয় ছায়া—অর্থাৎ, অন্ধকার। আবার আলো যদি ত্রিসীমানায় না থাকে, তা হলে সেখানেও অন্ধকারের রাজ।

'ভ্যাম্পায়ার হচ্ছে সেই অন্ধকারের সন্তান। আমরা আগেই বলেছি, ভ্যাম্পায়ার মানে "লিভিং ডেড" কিংবা "আন-ডেড"। অর্থাৎ, কফিনেব ভেতর থেকে, কবরের অন্ধকার থেকে উঠে আসা জীবন্ত মৃতদেহ। এই মৃতদেহ রক্তের তেষ্টায় রাতের পৃথিবীতে শিকার খোঁজে। শিকারের নরম গলায় নিজের ছুঁচলো শ্বদন্ত বিঁধিয়ে তার পিপাসা মেটায়।

'কিন্তু ভ্যাম্পায়ারের রকমফের আছে। নানারকম টাইপের হয়। এমন বহু ভ্যাম্পায়ারের সন্ধান পাওয়া গেছে যারা আমার আপনার মতো স্বাভাবিকভাবে দিনে অথবা রাতে ঘুরে বেড়ায়। তারপর, পিপাসা যখন পায়, তখন পাগলের মতো শিকারের খোঁজ করতে থাকে।

'এই ধরনের ভ্যাম্পায়াররা বেশি বিপজ্জনক—কারণ, এরা মানুষের ছদ্মবেশে থাকে। আমি এদের নাম দিয়েছি "হিউম্যান ভ্যাম্পায়ার" বা শর্টে "এইচ ভ্যাম্পায়ার"। এ ছাড়া রয়েছে ড্রাকুলা ভ্যাম্পায়ার, শেপ শিফ্টার—মানে, বহুরূপী ভ্যাম্পায়ার, আরও কত। এদের নিয়েই আমি গবেষণা করছি।

এদের চেনা বেশ কঠিন। আজকের ইলেকট্রনিক যুগেও ভ্যাম্পায়ারদের প্রবল অস্তিত্ব রয়েছে—।'

একজন বয়স্ক শ্রোতা তৃতীয় সারি থেকে হাত তুললেন : 'এক্সকিউজ মি, স্যার...।'

আমি বক্তৃতা থামিয়ে জিগ্যেস করলাম, 'বলুন?'

চশমা পরা প্রবীণ মানুষটি উঠে দাঁড়ালেন। ডান হাত নেড়ে জিগ্যেস করলেন, 'এইচ ভ্যাম্পায়ারদের কি কোনওভাবেই চেনা যায় না?'

আমি হাসলাম। বললাম, 'যায়—অবশ্যই যায়। এই ভ্যাম্পায়ারদের কতকগুলো সাইন আর সিম্পটম আছে—।'

'সেগুলো কী?'

'সরি, আমি হেল্‌পলেস। সবার সামনে ওই সাইন আর সিম্পটমগুলোর কথা বলা যাবে না। ভ্যাম্পায়ার নিয়ে লাস্ট আট বছর ধরে আমি রিসার্চ করে চলেছি। এখনও আমার রিসার্চ আর এক্সপ্লোরেশান চলছে। এ পর্যন্ত এই টপিকের ওপরে আমি তিনটে বই লিখেছি। লেকচারের শেষে বইগুলো আপনারা কিনতে পারবেন—হলের বাইরের লাউঞ্জে বইগুলো ডিসপ্লে করা থাকবে। থ্যাংক য়ু—।'

আপনমনে মাথা নেড়ে প্রবীণ অতৃপ্ত মানুষটি বসে পড়লেন।

আমি ওঁকে লক্ষ করে আরও বললাম, 'আপনি নিশ্চয়ই মানবেন, সব বিষয়েরই কিছু-কিছু সিক্রেট থাকা ভালো—।'

ভদ্রলোক সায় দিয়ে মাথা নাড়লেন আবার। তার প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই রোগা ফরসা মেয়েটি হাততালি দিতে শুরু করল। দু-চার সেকেন্ড তফাতে আরও কয়েকজন ওর সঙ্গে হাততালিতে তালি মেলাল।

আমার বক্তৃতা আবার শুরু হল। ভ্যাম্পায়ারদের স্লাভোনিক আর গ্রিক ওরিজিন নিয়ে কথা বলতে লাগলাম। ব্যাবিলোনিয়া, অ্যাসিরিয়া, গ্রিস ছুঁয়ে হাঙ্গেরি, বাভেরিয়া, সাইলেসিয়া, রাশিয়ায় ভ্যাম্পায়ার চর্চার আলোচনা করলাম। সবশেষে চলে এলাম এশিয়াতে। সংক্ষেপে কোরিয়া, চিন, জাপান আর ফিলিপাইনস-এর ভ্যাম্পায়ার সংক্রান্ত উপকথা আর কিংবদন্তীর উল্লেখ করে পৌঁছে গেলাম ভারতে। বললাম যে, ভারতে রক্তপিশাচ, ভ্যাম্পায়ার, নেকড়ে-মানুষ, বহুরূপী ভ্যাম্পায়ার, সরীসৃপ রক্তচোষা, লৌকিক অপদেবতা ইত্যাদি মিলেমিশে এক অদ্ভুত ইন্টারেস্টিং কম্বিনেশান তৈরি হয়েছে। এসব বিষয় নিয়ে কখনও তেমন জোরালো এবং গভীর গবেষণা হয়নি। ব্যাপারটা যেহেতু

আমার কাছে নেশার মতো, বলতে গেলে একটা অবসেশান, তাই আমি একটানা আট বছর ধরে এই গবেষণায় পাগলের মতো মেতে আছি।

আমার দু-ঘণ্টার বক্তৃতা শেষ হল। শেষ স্লাইডে দর্শকদের 'ধন্যবাদ' জানালাম। আরও জানালাম, এরপর কবে কোথায় আমার এরকম বক্তৃতার অনুষ্ঠান আছে, আর তার বিষয়টাই বা কী।

আমি ডায়াস থেকে নেমে এলাম। সঙ্গে-সঙ্গে আমার বন্ধু কাম স্কলার রত্নাকর মাইকে অ্যানাউন্স করল যে, সকলের জন্যে বাইরের লাউঞ্জে চায়ের ব্যবস্থা আছে। আর আমার লেখা তিনটে বই সেখানে থার্টি পারসেন্ট ডিসকাউন্টে পাওয়া যাচ্ছে। ধন্যবাদ।

দর্শকরা চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল। অনেকে হলের দরজার দিকে হাঁটা দিল। কেউ-কেউ আমার সঙ্গে কথা বলার জন্যে কাছে এগিয়ে এল।

কিন্তু সবার আগে আমার কাছে চলে এসেছে রত্নাকর। হ্যান্ডশেক করে আমাকে ছোট্ট একটা 'হাগ' করে বলল, 'একসিলেন্ট প্রেজেন্টেশান। তোর এত লেকচার শুনেছি—তার মধ্যে এটা ম্যাগনিফিসেন্ট, ওয়ান্ডারফুল। আমি একেবারে অন্য জগতে চলে গিয়েছিলাম...।'

রত্নাকর বছরখানেক ধরে আমার সঙ্গে ভ্যাম্পায়ার রিসার্চে মেতে আছে। ও আমার কাছে গবেষণা করে—কিন্তু আমার সহকারীও বটে। এমনিতে বেশ স্মার্ট। বয়েস আমারই মতো। তবে মাথার পেছনটায় গোল হয়ে অকালে টাক পড়েছে। কোমরের ওপরে মাঝারি ভুঁড়ি। কিন্তু ওর পরিশ্রম আর উৎসাহে কোনও কমতি নেই—অন্তত ভ্যাম্পায়ার ইত্যাদির ব্যাপারে। ওর রিসার্চের টপিক ভ্যাম্পায়ারদের সোশ্যাল লাইফ। এই টপিকটা ওর খুব ইন্টারেস্টিং বলে মনে হয়। তা ছাড়া ও শখের কবিতা লেখে। ওর একটাই প্রবলেম ঃ বড্ড সিগারেটের নেশা। অবশ্য আর-একটা ছোট প্রবলেমও আছে।

আমার সব সেমিনারের ব্যবস্থাপনায় রত্নাকর। ওর ওপরে আমি ভীষণ নির্ভর করি। গবেষণার ব্যাপারেও। ও সবদিকে এত খেয়াল রাখে যে, আমি মাঝে-মাঝে ভাবি, কী করে ও এত পারে! কোনও মানুষের পক্ষে এই দক্ষতা অসম্ভব। প্রথম-প্রথম আমরা একে অপরকে 'তুমি-তুমি' বলে কথা বলতাম। কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যেই ব্যাপারটা 'তুই-তুই' হয়ে গেছে।

রত্নাকর মাইক, ল্যাপটপ, লেসার পয়েন্টার—সব গুছিয়ে রাখছিল। ততক্ষণে বেশ কয়েকজন আমার কাছে এসে আমাকে প্রায় ঘিরে ধরেছে। ভ্যাম্পায়ার নিয়ে নানান প্রশ্ন করছে—কোনও প্রশ্ন ইন্টারেস্টিং তো কোনওটা

উদ্ভট। আবার কেউ-কেউ অটোগ্রাফের খাতা এগিয়ে দিচ্ছে।

আমি রোগা মতন মেয়েটিকে লক্ষ করছিলাম। আমাকে ঘিরে ধরা দর্শক-বৃত্তের বাইরে দাঁড়িয়ে ও অপেক্ষা করছে। মনে হয়, কিছু বলতে চায়—কিংবা ওর কোনও প্রশ্ন আছে। কিন্তু ওর কোনও তাড়া নেই।

হঠাৎই আমার খেয়াল হল, আমার বক্তৃতার শেষ আধঘণ্টা কি চল্লিশ মিনিট আমি শুধু এই মেয়েটিকে লক্ষ্য করেই কথা বলে গেছি। ওর মধ্যে নিশ্চয়ই স্পেশাল টাইপের কোনও ম্যাগনেট আছে। কারণ, এখনও মেয়েটার কালো চোখ আমাকে টানছিল।

কয়েক মিনিট পরেই অদৃশ্য ম্যাগনেটের ব্যাপারটা বুঝতে পারলাম। ওর চোখ, নাক, ঠোঁট আমার লাজবন্তীর মতো। ভীষণ মিল।

ওঃ লাজবন্তী!

এক বছরের পুরোনো বুকফাটা যন্ত্রণাটা এক ঝটকায় ফিরে এল। বুকের ভেতরটা জ্বালা করে উঠল।

কিন্তু আমি মেয়েটির দিকে মুগ্ধ হয়ে তাকিয়েই রইলাম। লাজবন্তীকে দেখতে লাগলাম। আমার জ্বালাটা কমতে লাগল।

আমার সেমিনার শুনতে যারা আসে তাদের বেশিরভাগই ডিরেক্টলি বা ইনডিরেক্টলি ভ্যাম্পায়ারের সংস্পর্শে এসেছে। কারও রিলেটিভ হয়তো ভ্যাম্পায়ারের কামড়ে মারা গেছে। কেউ বা ভ্যাম্পায়ারের অ্যাটাক থেকে কপালজোরে বেঁচে গেছে। আবার কেউ হয়তো নিজের চোখে ভ্যাম্পায়ার দেখেছে।

কিন্তু এই মেয়েটির কেসটা কী?

হরেকরকম প্রশ্ন উড়ে আসছিল আমার দিকে।

'প্রফেসর মিত্র, এই ভ্যাম্পায়ারদের সঙ্গে মানুষের চেহারার কোনও তফাত নেই?'

'না, নেই। অন্তত এখনও সেরকম কোনও তফাত আমি খুঁজে পাইনি—।'

'ভ্যাম্পায়াররা কি দিনের বেলায় ঘুমোয়?'

'না, ওরা কখনওই ঘুমোয় না—কারণ, ওদের ঘুম পায় না। তবে যদি ওরা মানুষের ছদ্মবেশে থাকে তা হলে মানুষের চোখে ধুলো দেওয়ার জন্যে ওরা ঘুমোনোর ভান করে।'

'ভ্যাম্পায়ারদের কি বিয়ে হয়? ছেলেমেয়ে হয়?'

'এখনও জানি না। ওদের রিপ্রোডাক্টিভ মেথডোলজি নিয়ে আমার রিসার্চ

চলছে। এ পর্যন্ত যতটুকু জেনেছি, তাতে ব্যাপারটা বেশ ইন্টারেস্টিং।'

'আপনার আগামী কোনও সেমিনারে একজন ভ্যাম্পায়ারকে এনে আমাদের দেখান না—।'

এ-বায়নার কোনও উত্তর হয় না। তাই 'এক্সকিউজ মি—এক্সকিউজ মি' বলতে-বলতে জটলা ছাড়িয়ে বাইরে বেরিয়ে এলাম।

রত্নাকর কখন যেন আমার পাশে চলে এসেছে। এতক্ষণ এসি রুমে থাকা সত্ত্বেও ওর গা থেকে ঘামের গন্ধ বেরোচ্ছিল। চাপা গলায় ও বলল, 'চল, একটু চা-টা খেয়ে নিই...।'

'হ্যাঁ, একটু চা খাওয়া দরকার। তারপর তোর সিগারেট। নিশ্চয়ই তোর গলা শুকিয়ে এসেছে।'

রত্নাকর অল্প অপরাধী চোখে হাসল।

বাইরের লাউঞ্জে লোকজন ছড়িয়ে-ছিটিয়ে দাঁড়িয়ে। কোণের দিকে একটা টেবিলে আমার বইয়ের থাক সাজানো। বিক্রিবাটা চলছে। অনেকেরই হাতে চায়ের পেপার কাপ। দু-চারজন চোখ ফিরিয়ে আমাকে দেখছিল।

হঠাৎই পেছন থেকে কেউ বলে উঠল, 'প্রফেসর আলোকিরণ মিত্র, আপনার নামটা দারুণ সুন্দর...।'

চমকে ঘুরে তাকালাম। পুরো নাম ধরে এভাবে কেউ ডাকে নাকি?

সেই রোগামতন মেয়েটি। মাথায় কোঁকড়া চুল। হঠাৎ করে দেখলে মনে হয় ভেড়ার লোমের টুপি পরেছে। ওর কাঁধে একটা সফ্‌ট ব্রাউন চামড়ার সাইড ব্যাগ।

আমার নামটা একটু অদ্ভুত বলে ছোটবেলা থেকেই প্রশংসা, ঠাট্টা, 'কে নাম রেখেছে?' ইত্যাদি শুনে আসছি। তাই চুপ করে রইলাম।

আমি আর রত্নাকর দাঁড়িয়ে পড়লাম।

'লেকচার কেমন লাগল?' মেয়েটিকে জিগ্যেস করললাম।

'দারুণ। ইট ওয়জ আ গ্রেট শো। আমার নাম নিলি।'

'নিলি?'

'হ্যাঁ। কেন, আপনি ছাড়া আর কারও আন্‌কমন নাম হতে নেই?'

আমি হেসে ফেললাম ঃ 'ঠিক বলেছেন। আসুন, দুটো আন্‌কমন নামের মালিকের প্রথম পরিচয়কে আমরা হ্যান্ডশেক করে সেলিব্রেট করি...।'

আমরা হ্যান্ডশেক করলাম। রত্নাকরের সঙ্গে নিলির আলাপ করিয়ে দিলাম। লক্ষ করলাম, রত্নাকর আমাকে আর নিলিকে বেশ কৌতূহল নিয়ে দেখছে।

আসলে আমার আগ্রহটা হয়তো রত্নাকরের চোখে লাগছিল।

গড়ে মাসে একবার আমি পাবলিক লেকচার দিই। বিষয় ভ্যাম্পায়ার, ওয়্যারউল্‌ফ, প্যারানরম্যাল ফেনোমেনা, অকাল্ট, ব্ল্যাক ম্যাজিক, ভৌতিক, অলৌকিক এইসব। তবে এর মধ্যে 'ভ্যাম্পায়ার' ব্যাপারটা আমার সবচেয়ে বেশি পছন্দের। শুধু পছন্দের কেন, আমি বলতে গেলে অবসেস্‌ড। আট বছর ধরে আমি একগুঁয়েভাবে এই বিষয় নিয়ে রিসার্চ করে চলেছি। আমার জেদ একটুও কমেনি।

কারণ, ছোটবেলায় আমরা যখন কোচবিহারের নন্দপুর গ্রামে থাকতাম তখন আমার মা ভ্যাম্পায়ারের কামড়ে মারা গিয়েছিল। মায়ের গলায় দাঁতের দাগ ছিল, রক্ত জমাট বেঁধে ছিল। আর মায়ের গোটা শরীরটা সাদা ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছিল। আমার বয়েস তখন ষোলো কি সতেরো।

এ ছাড়া আরও একটা কারণ আছে।

আমি বড় হয়ে বাবার সঙ্গে কলকাতায় চলে এসেছিলাম। এখানে এসে আরও পড়াশোনা করে অল্পবিস্তর দাঁড়িয়েছি। অনেক চেষ্টায় শেষ পর্যন্ত একটা হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলে মাস্টারির চাকরি পেয়েছিলাম। তারপর...।

কিন্তু তার পরে আরও একটা সাংঘাতিক ঘটনা ঘটেছে। আমার গবেষণা থামাতে ক্ষিপ্ত ভ্যাম্পায়াররা বদলা নিয়েছে। সে-কথা ভাবতে গেলে এখনও চোখে জল এসে যায়। মনে আছে, কয়েকটা মাস আমি উদভ্রান্তের মতো কাটিয়েছি। তারপর চোখের জল মুছে এই 'অপারেশান ভ্যাম্পায়ার' মিশনে নতুন উদ্যমে নেমেছি। সেই মর্মান্তিক ঘটনার সাত বছর আগেই আমি ব্ল্যাক ম্যাজিকের একটা সোসাইটি তৈরি করেছিলাম। তারপর থেকে সেই ব্যানার সামনে রেখে ভ্যাম্পায়ারদের খোঁজ করে চলেছি।

এসব কারণের কথা রত্নাকরকেও কখনও বলিনি। কিন্তু ও আমার সঙ্গে জড়িয়ে পড়ার পর ভ্যাম্পায়ার নিয়ে আমার রিসার্চের ভয়ংকর জেদটা ও খুব সহজেই টের পেয়ে গিয়েছিল। গবেষণার নেশা যে এরকম একরোখা হতে পারে সেটা ও কখনও ভাবেনি। আমাকে কয়েকবার ও বারণও করেছিল। বলেছিল, 'কিরণ, এই সাবজেক্টটা নিয়ে এরকম জেদ ধরে এত প্রোবিং রিসার্চ করা ঠিক নয়। ব্যাপারটা খুব বিপজ্জনক, রিস্কি। কখন কী হয়ে যায় কে বলতে পারে—।'

তখন আমি বলেছি, 'তা হলে তুই যে ভ্যাম্পায়ার নিয়ে আমার কাছে রিসার্চ করছিস?'

হেসেছে রত্নাকর ঃ 'আমি রিসার্চ করছি ওদের সোশ্যাল লাইফ নিয়ে। সেটা বোধহয় একটু নিরাপদ, তাই না? তা ছাড়া...তুই বললে আমি এক্ষুনি রিসার্চের টপিক পালটাতে পারি। তুই আমার গাইড।'

আমি আর কথা বাড়াইনি। তবে টের পাচ্ছিলাম, রত্নাকর কিছু-কিছু ব্যাপার আঁচ করতে পেরেছে।

ভ্যাম্পায়ারের খোঁজে আমি নানান জায়গায় ঘুরে বেড়াই। যখনই ভ্যাম্পায়ার বা পিশাচ নিয়ে কোনও কিংবদন্তী অথবা ঘটনার কথা কানে আসে, তখনই সে জায়গায় ছুটে যাই। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই রত্নাকর আমার সঙ্গে থাকে। এইসব ফিল্ড ট্রিপের সমস্ত ডেটা রত্নাকর ল্যাপটপে স্টোর করে রাখে। পরে দরকার মতো সেগুলোর প্রসেসিং আর স্ট্যাটিস্‌টিক্যাল অ্যানালিসিস করে।

আমি আর নিলি লাউঞ্জের এককোণে দাঁড়িয়ে কথা বলছিলাম। রত্নাকর 'চা নিয়ে আসছি—' বলে চলে গিয়েছিল।

'নিলি, আপনাকে অডিয়েন্সে দেখে আমার খুব অবাক লেগেছে।'

'কেন? আপনার এত নাম-ডাক। আপনার ভ্যাম্পায়ার আর ব্ল্যাক ম্যাজিক রিলেটেড লেকচার তো কলকাতায় সবার মুখে-মুখে। আসলে আপনার পপুলারিটির লেভেলটা আপনি জানেন না। আপনি এককথায় সেলিব্রিটি—।'

আমি হাসলাম ঃ 'এত প্রশংসা করার জন্যে আপনাকে আমার খাওয়ানো উচিত, কিন্তু এই মুহূর্তে চায়ের বেশি কিছু খাওয়াতে পারছি না—।'

'সে-সুযোগ প্রচুর পাবেন। আমি সহজে আপনাকে ছাড়ছি না।' চোখে হাসল নিলি।

রত্নাকর দুটো চা নিয়ে এল। আমাকে আর নিলিকে দিল। আমি ওকে জিগ্যেস করলাম, 'তুই চা নিলি না?'

নিলি মজা করে মন্তব্য করল, 'আমাকে ডাকলেন?'

আমরা তিনজনেই হেসে উঠলাম।

রত্নাকর বলল, 'আমি চা খেয়ে নিয়েছি—।' তারপর একটা সিগারেট ধরাল। ও জানে আমি সিগারেট খাই না—তাই আমাকে অফার করল না।

একজন মাঝবয়েসি পুরুষ আর তিনজন ইয়াং ছেলে-মেয়ে আমাদের কাছে চলে এল। প্রত্যেকের হাতে আমার লেখা বই। সেগুলোয় সই করে দেওয়ার জন্যে অনুরোধ জানাল।

সই করার মাঝখানে আমার পকেটের মোবাইল বাজতে শুরু করল। আমি ফোনটাকে বাজতে দিলাম। এক্ষুনি ফোন ধরতে ইচ্ছে করছিল না।

ফ্যানের দল চলে গেলে আমি নিলিকে লাখ টাকার প্রশ্নটা করলাম : 'নিলি, আপনি হঠাৎ আমার প্রোগ্রামে কেন? আপনি কি রিয়েলি ভ্যাম্পায়ারের ব্যাপারে ইন্টারেস্টেড? নাকি ভ্যাম্পায়ার আপনার জীবনে কোনও ডিস্টারব্যান্স তৈরি করেছে?'

'হ্যাঁ, ইন্টারেস্টেড। কারণ, আমি একটা ছোট উইকলি কাগজে লেখালেখি করি। তা ছাড়া ভ্যাম্পায়ার নিয়ে মোর অর লেস ডিস্টার্বড্‌ও বটে।' হাসল নিলি : 'আপনার তিনটে বই-ই আমার আছে, ওগুলো আমি অনেকবার পড়েছি। কিন্তু আমার জানতে ইচ্ছে করে, সত্যি কি আপনি ভ্যাম্পয়ারদের সম্পর্কে এমন অনেক কিছু জানেন যেগুলোর কথা আপনি কোনও বইয়ে লেখেননি?'

আমি মাথা নেড়ে সায় দিলাম। বললাম, 'হ্যাঁ, জানি। সেগুলো এখনও সিক্রেট। এমনকী আমার বন্ধু এবং কো-রিসার্চার—' রত্নাকরের দিকে হাতের ইশারা করে : 'রত্নাকর চৌধুরীও জানে না...।'

রত্নাকর হাসল। সিগারেটে টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়ল।

আমি চায়ের কাপে চুমুক দিলাম। লক্ষ করলাম, লাউঞ্জে ভিড় ক্রমশ কমছে।

আমার কথা শুনে নিলি চোখ কপালে তুলল : 'এগুলো তো, স্যার, ডেঞ্জারাস সিক্রেট!'

'কিছুটা ডেঞ্জারাস তো বটেই।' হেসে ওকে বললাম, 'তবে এগুলো পাবলিক নলেজ হয়ে গেলে প্রবলেম হতে পারে...।'

নিলি চায়ের কাপে চুমুক দিচ্ছিল। আমি ওর ঠোঁট লক্ষ করছিলাম। চওড়ায় ছোট, কিন্তু বেশ পুরু। এরকম ঠোঁটকে ভালোবাসতে ইচ্ছে করে।

রত্নাকরের দিকে চোখের ইশারা করে বললাম, 'ওকে আমাদের সোসাইটির কথা বল...।'

রত্নাকর হাসল অকারণেই। হাতের সিগারেটটা কোণে রাখা একটা লিটার বিনে ফেলে দিয়ে এল। তারপর গালে দুবার হাত বুলিয়ে গলা পরিষ্কার করল। নিলির দিকে তাকিয়ে সেল্‌সম্যানের ঢঙে শুরু করল, 'ম্যাডাম...।'

'ম্যাডাম নয়, নিলি—' মাথা ঝাঁকিয়ে মেয়েটা বলল, 'আমরা টোয়েন্টি ফার্স্ট সেঞ্চুরিতে দাঁড়িয়ে কথা বলছি। ও. কে.? এবার বলুন, সোসাইটির ব্যাপারটা আমাকে বলুন—আমি ইন্টারেস্টেড।'

রত্নাকর এবার সহজ হল। ওকে বলতে শুরু করল।

'ব্ল্যাক ম্যাজিক রিসার্চ সোসাইটি' নামে ডক্টর আলোকিরণ মিত্র একটা সোসাইটি তৈরি করেছেন। এ বিষয়ে ইন্টারেস্টেড যে-কেউ এর মেম্বার হতে পারে। বার্ষিক চাঁদা মাত্র পাঁচশো টাকা। এর বিনিময়ে প্রফেসর মিত্রের সমস্ত লেকচারে নেমন্তন্ন পাওয়া যাবে। সোসাইটির লাইব্রেরিতে বসে এসব বিষয়ে পড়াশোনা করা যাবে। বছরে সোসাইটি চারটে বুলেটিন পাবলিশ করে—সেগুলো ফ্রি পাওয়া যাবে। এ ছাড়া কোনও মেম্বার সেমিনারে লেকচার দিতে চাইলে তার অ্যারেঞ্জমেন্ট করা হয়। আর মাঝে-মাঝে মেম্বারদের নিয়ে আমরা পশ্চিমবঙ্গের নানান জায়গায় ফিল্ড ট্রিপে যাই। তার জন্যে মেম্বারদের কাছ থেকে আলাদা চাঁদা নেওয়া হয়।

নিলি উৎসাহ নিয়ে রত্নাকরের কথা শুনল। তারপর বলল যে, ও রত্নাকরকে ফোন করে সোসাইটির অফিসে আসবে। তারপর গল্প করবে, চা খাবে, মেম্বার হবে।

সোসাইটির অফিস বলতে আমার বাড়ির একতলাটা। দোতলায় আমি থাকি। নিলি আসবে শুনে বেশ খুশি হলাম। নিলির সঙ্গে আমরা ফোন-নাম্বার বিনিময় করলাম।

আমি নিলিকে বললাম, 'আপনি কোনদিকে যাবেন? আমার সঙ্গে গাড়ি আছে। আপনাকে নামিয়ে দিতে পারি...।'

খেয়াল করলাম, রত্নাকর আমার দিকে ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে আছে। সেই মুহূর্তে ওকে আমার লোকাল গার্জেন বলে মনে হচ্ছিল। ও কি চাইছে না নিলির সঙ্গে আমার আলাপ আরও গাঢ় হোক?

নিলি ইতস্তত করছিল।

ঠিক তখনই আমার মোবাইল ফোন আবার বেজে উঠল।

নিলিকে 'এক্সকিউজ মি' বলে ফোনটা ধরলাম।

'হ্যালো—' বলার সঙ্গে-সঙ্গেই বুকের ভেতরে একটা অচেনা ঠান্ডা স্রোত বয়ে গেল। কারণ, ও-প্রান্ত থেকে কোরাস শোনা গেল : 'ডক্টর মিত্র, আমরা বলছি...।'

গত তিন-চার বছর ধরে এই ফোনটা মাঝে-মাঝে আসে। প্রত্যেকবারই নতুন-নতুন নম্বর থেকে। প্রথম-প্রথম একজন পুরুষ কিংবা মহিলা কথা বলত। কিন্তু গত একবছর ধরে ব্যাপারটা পালটে গেছে।

লাস্ট একবছরে ফোনটা তিনবার এসেছে। এবং তিনবারই কোরাস কণ্ঠস্বর। একসঙ্গে যেন অনেক পুরুষ-মহিলা কথা বলছে। ফোন ধরলেই তারা বলে,

'আমরা বলছি।' তারপর...।

আমি এই কোরাস গলার রহস্য ভেদ করতে পারিনি। অন্তত এখনও।

'বলুন—' আমি পায়ে-পায়ে নিলি আর রত্নাকরের কাছ থেকে একটু দূরে সরে গেলাম।

'আগেও আপনাকে অনেকবার বলেছি।' ও-প্রান্ত কিছুক্ষণ চুপচাপ। শুধু শ্বাসপ্রশ্বাসের শব্দ শোনা গেল। তারপর : 'আপনি আমাদের নিয়ে গবেষণা বন্ধ করুন।'

আমার বুকের ভেতরে ঠান্ডা স্রোতটা তখনও বয়ে যাচ্ছিল। আমি চেষ্টা করে মুখের ভাব স্বাভাবিক রাখতে চাইলাম। যাতে নিলি বা রত্নাকর কিছু বুঝতে না পারে।

'আমি আমি তো কারও ক্ষতি করিনি...।'

'প্রত্যেকবার আপনি একই কথা বলেন। অথচ আপনি ভালো করেই জানেন যে, আপনি ক্ষতি করছেন। আমাদের ক্ষতি করেছেন। সবাইকে আমাদের সম্পর্কে যত বেশি ইনফরমেশান দিচ্ছেন তত আমাদের ক্ষতি হচ্ছে। আমরা এক্সপোজড্‌ হচ্ছি।'

'তা বলে কি কেউ রিসার্চ করবে না?'

'করুন না। ভ্যাম্পায়ার ছাড়া অন্য যে-কোনও হাবিজাবি বিষয় নিয়ে রিসার্চ করুন না! যেমন ধরুন, হ্যারিকেন, উটপাখি, কচুরিপানা—এইসব।' কোরাস কণ্ঠস্বর বেশ বিরক্ত বলে মনে হল : 'এই যে আজ আপনি একঘর লোকের সামনে ভ্যাম্পায়ার চেনার সাইন আর সিম্পটমের কথা বললেন—সেটা কি খুব ভালো হল?'

ওরা জানল কী করে যে, আজ লেকচারের সময় বা তার পরে ইন্টারঅ্যাকশনের সময় আমি ভ্যাম্পায়ারদের চেনার ব্যাপারে এসব কথা বলেছি? এরা কি আমার পেছনে ফেউ লাগিয়ে রেখেছে?

এরা কি সত্যিই ভ্যাম্পায়ার? নাকি কেউ আমাকে হেনস্থা করার জন্যে এইরকম ভূতুড়ে কল করে চলেছে?

শুরুর দিকে আমি এরকমটাই ভেবেছিলাম। কিন্তু যত দিন গেছে টেলিফোনের ওই কোরাস গলা আর কথা বলার ঠান্ডা ভঙ্গি আমাকে ভয় পাইয়ে দিয়েছে।

কোরাস কণ্ঠস্বর বলল, 'মনে আছে, একবছর আগে আপনাকে আমরা শাস্তি দিয়েছিলাম? কিন্তু আপনি বড্ড একগুঁয়ে আর অবাধ্য। কিছুতেই সাবধান

হতে চান না। নিজের লাইফটা কি আপনার কাছে এতই মামুলি, এতই ফেলনা!'

'আমি তো উত্তরে বলেছি, ওইসব সাইন আর সিম্পটমের ব্যাপারটা সিক্রেট—পাবলিক্‌লি বলা যাবে না...।'

না, আমি মোটেই ভয় পাইনি। কিন্তু আমি ওদের অভিসন্ধিটা বুঝতে চাই।

'হ্যাঁ, বলেছেন। কিন্তু আপনি রিসার্চ না থামালে ওই সিক্রেট একদিন-না-একদিন জানাজানি হবে। তারপর আমাদের ওপরে চাপ আসবে। আমাদের অস্তিত্ব বিপন্ন হবে। আমাদের সংখ্যা কমবে। সেইজন্যেই আপনাকে সাবধান করছি। আর এটাই আমাদের লাস্ট ওয়ার্নিং...।'

ও-প্রান্ত ফোন কেটে দিল।

ওরা যেসব নম্বর থেকে ফোন করে সেগুলোতে আমি পালটা ফোন করে দেখেছি—শুধু রিং হয়ে যায়, কেউ ফোন ধরে না।

আমি পকেটে হাত ঢোকালাম। চার ইঞ্চি ফলার ছুরিটা মুঠো করে চেপে ধরলাম। রুপোর তৈরি মোটা ব্লেডের স্টিলেটো। এইচ ভ্যাম্পায়ার খতম করার মোক্ষম অস্ত্র। এটা সবসময় আমার সঙ্গে থাকে। এটা ঠিকঠাক লুকিয়ে রাখার জন্যে আমার সব প্যান্টের পকেটই বেশ গভীর।

ছুরিটা মুঠো করে ধরার পর আমার বুকের ভেতরে বয়ে যাওয়া স্রোতের উষ্ণতা বাড়তে লাগল।

নিলি আর রত্নাকর নিজেদের মধ্যে কীসব কথা বলছিল। আমি কাছে এগিয়ে আসতেই থেমে গেল।

দুজন মাঝবয়েসি মহিলা অটোগ্রাফ চাইতে এসেছিলেন। তাঁদের দাবি মিটিয়ে নিলিকে বললাম, 'চলুন, এবার রওনা দিই। নইলে রাত হয়ে যাবে—।'

'চলুন—।'

আমরা তিনজনে বিল্ডিং-এর সদর দরজার দিকে হাঁটা দিলাম। লক্ষ করলাম, রত্নাকর আড়চোখে আমার কপালের দিকে তাকিয়ে আছে।

অস্বস্তির খোঁচায় কপালে হাত দিয়ে ঘামের ফোঁটা টের পেলাম। চট করে হাত বুলিয়ে ঘাম মুছে নিলাম। মনে মনে ভাবলাম, যত যা-ই হোক, এই রিসার্চ আমি কিছুতেই ছাড়তে পারব না। কারণ, আমার জেদ। জেদ আর প্রতিশোধের জ্বালা।

যদি না ছাড়ি তা হলে ওরা কী করবে?

সেটাই আমি দেখতে চাই।

দুই

বৃষ্টি আমার দারুণ লাগে। বর্ষাকাল আমার মায়ের খুব প্রিয় ছিল। আকাশ থেকে বৃষ্টি পড়লে মা গুনগুন করে গান গেয়ে উঠত। দু-চার লাইন হলেও গাইত। সে-গান কার লেখা, কার সুর কিছুই আমি জানি না।

যে-গানটা মা বেশি গাইত তার দু-চারটে লাইন ছিল এইরকম :

'আমার কপালে দিয়ে যাও মেঘ
বৃষ্টির ফোঁটা।
বৃষ্টি আমার জীবনকে দিক নতুন নতুন জীবন..।'

বৃষ্টি হলেই আমার মায়ের কথা মনে পড়ে। মা কোনও নতুন জীবন পেয়েছে কি না সে-কথা ভাবতে থাকি।

দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে বৃষ্টি দেখছিলাম। সামনে অন্ধকার রাত। দূরে কয়েকটা বাড়ির আলো জ্বলছে। বিজ্ঞাপনের দুটো হোর্ডিং দেখা যাচ্ছে। সেটা পেরিয়ে দুটো আকাশছোঁয়া কমিউনিকেশান টাওয়ার। তাদের শরীরে, মাথায়, লালবাতির নিষেধ।

আমার বাড়িটা ইস্টার্ন মেট্রোপলিটন বাইপাসের ধারে। যখন এখানে বাড়ি করাটা মোটেই ফ্যাশান ছিল না তখন বাবা এখানে বিশাল একটা জমি কিনেছিল। পরে তার খানিকটায় একটা একতলা বাড়ি তৈরি করেছিল। আর বাকিটায় চাষবাস চলত। বাবা মাটি খুব ভালোবাসত। বাবার গা থেকে মাটির গন্ধ বেরোত।

একদিন সন্ধের মুখে বাগানে চাষবাসের কাজ তদারকির সময় বাবার পা কেটে গেল। বাদামি রঙের বোতলের ভাঙা কাচ বাগানে পড়েছিল। সেগুলো কে ফেলেছিল কে জানে! বাবা দেখতে না পেয়ে তার ওপরে পা ফেলেছিল। তাতে বাঁ-পায়ের হাওয়াই চপ্পলের রবার কেটে বাবার পায়ে কাচ ঢুকে গিয়েছিল।

তখন আমার বয়েস ছাব্বিশ পুরো হয়নি। ইতিহাস নিয়ে এম. এ. পাশ করে একটা হাইস্কুলে পার্ট-টাইম পড়াচ্ছি আর রিসার্চ করছি। রিসার্চের টপিক

ছিল 'ভ্যাম্পায়ার্স ইন ইন্ডিয়া : মিথ অ্যান্ড রিয়্যালিটি'।

মেডিকেল ট্রিটমেন্টের ব্যাপারে আমার তেমন অভিজ্ঞতা বা জ্ঞান ছিল না। মা বেঁচে থাকলে বাবার চিকিৎসা হয়তো অন্যরকমভাবে হত। কিন্তু আমার আনকোরা তদারকিতে বাবা মোটেই সেরে উঠল না। তার বদলে কাটা জায়গাটায় সাংঘাতিকরকম ইনফেকশান হয়ে গেল। বাবার বাঁ-পাটা থামের মতো ফুলে উঠেছিল। বাড়ি থেকে নার্সিংহোমে ট্রান্সফার করার আগেই বাবা মারা গেল।

আমি একেবারে একা হয়ে গেলাম।

সেই শোকের সময়ে বারবারই আমার মনে হচ্ছিল, মা যদি বেঁচে থাকত তা হলে বাবাকে এভাবে অকালে চলে যেতে হত না।

কিন্তু মা বেঁচে নেই কেন?

ভ্যাম্পায়ার। সবকিছুর মূলে রয়েছে এই জঘন্য জীবটা—যে মানুষ হয়েও অমানুষ।

দশ বছর আগে বাবার টর্চের আলোয় দেখা মায়ের মৃতদেহটা তখন ভেসে উঠেছিল চোখের সামনে। বাঁ-কানের নীচে একজোড়া দাঁতের দাগ। গোটা শরীর রক্তহীন, ফ্যাকাশে। চোখ দুটো খোলা, দৃষ্টিহীন—যেন পাথরের চোখ।

বাবা খুব তাড়াহুড়ো করে গাঁয়ের লোকজন ডেকে মায়ের সৎকার করে ফেলেছিল। তাই বোধহয় মায়ের শরীরটা অন্যরকম কিছুতে পালটে যেতে পারেনি। মা বলতে গেলে 'মুক্তি' পেয়েছিল।

কিন্তু লাজবন্তী মুক্তি পায়নি।

লাজবন্তী একটা গোটা বছর আমার জীবনে ছেয়ে ছিল। তারপর...।

বৃষ্টির মিহি গুঁড়ো আমার চোখে-মুখে উড়ে আসছিল। মনে হচ্ছিল, ওগুলো স্মৃতির রেণু। উড়ে এসে আমাকে ঘিরে ধরছে, পুরোনো কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে।

বাবা মারা যাওয়ার পর একবছর ধরে আমি শুধু আমার দুর্ভাগ্য নিয়ে চিন্তা করেছিলাম। রাতের অন্ধকারে এ-ঘরে ও-ঘরে ঘুরে বেড়াতাম। কখনও আবার খোলা উঠোনে কিংবা বাগানে বসে থাকতাম। বারবার মায়ের মৃত্যুর কথা, বাবার মৃত্যুর কথা, ভেসে বেড়াত মনে। একা-একা জীবনটাকে একটা বোঝা মনে হত, অসহ্য লাগত।

এইরকম একটা মন নিয়ে অন্ধকারে যখন ঘুরে বেড়াতাম তখন নিজেকেই একটা রক্তচোষা নিশাচর বলে মনে হত। মনে হত, আমি যদি ভ্যাম্পায়ার

হতাম তা হলে খুব সহজে অন্য ভ্যাম্পায়ারদের খোঁজ পেতাম। তাদের মধ্যেই লুকিয়ে আছে আমার মায়ের হত্যাকারী। সেই খুনি ভ্যাম্পায়ারটাকেও আমি খুঁজে বের করতাম। তারপর...তারপর...।

এই চিন্তাটা আমাকে কুরে-কুরে খেতে লাগল।

তারপর একদিন রাতে মা-কে স্বপ্নে দেখলাম।

মা আমার দিকে তাকিয়ে অল্প হেসে বলছে, 'কী রে, আলো, তুই এখনও ভাবছিস! তোর তো কিছু একটা করার সময় পেরিয়ে যাচ্ছে।'

এর বেশি মা আর কিছু বলেনি। কিন্তু আমি যেন মায়ের মনের কথা বুঝতে পারলাম।

পরদিন থেকে আমি কাজে নেমে পড়লাম।

আমার বাবার কাঠের ব্যাবসা ছিল। সেই ব্যাবসা থেকে সৎপথে বাবা কম রোজগার করেনি। আমার আর কোনও ভাই-বোন নেই। আত্মীয়স্বজন বলতে যারা আছে তারা সবাই কোচবিহারে আর শিলিগুড়িতে। কখনও-কখনও ফোনে যোগাযোগ করা ছাড়া আর কোনও লেনদেন নেই। তাই এক জীবনে যত টাকার দরকার তার অন্তত কয়েকশো গুণ আমার ছিল।

সুতরাং আমি একা আমার কাজ শুরু করলাম। রিসার্চের কাজে ভ্যাম্পায়ার নিয়ে পড়াশোনা তো করছিলামই, সেটাতে পাঁচগুণ উৎসাহে মেতে উঠলাম। মাঠে-ঘাটে, জঙ্গলে, কিংবা গ্রামে-গ্রামে ঘুরে নানান মানুষজনের ভ্যাম্পায়ারের অভিজ্ঞতার খোঁজখবর করতে লাগলাম।

কয়েকমাস উত্তেজিতভাবে কাজ করার পর আমি বুঝতে পারলাম আমার কাজটা অনেকটা ছন্নছাড়া এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। তখন আমি ঠান্ডা মাথায় প্ল্যান করতে শুরু করলাম। ঠিক করলাম, ভ্যাম্পায়ার খুঁজে বের করা, তাদের খতম করা, ধীরে-ধীরে ওদের নিশ্চিহ্ন করা—এই ব্যাপারটাকে আমি একটা আন্দোলনের চেহারা দিতে চাই। এটাই আমার জীবন। তবে এর জন্যে লোকজন দরকার, প্রচার দরকার, ভ্যাম্পায়ারের খোঁজে নিয়মিত অভিযান চালানো দরকার।

কাগজ-কলম নিয়ে প্রজেক্টের ধাঁচে একটা 'প্ল্যান অফ ওয়ার্ক' তৈরি করলাম। তারপর তার 'টাইম চার্ট'। বারবার খতিয়ে দেখে প্রজেক্টের খসড়াটা আমার পছন্দ হল। তখন আমি বাড়ি তৈরির কাজ শুরু করলাম। পুরোনো বাড়িটা ভেঙে সেই জায়গায় তার চেয়ে অনেক বড় মাপের একটা দোতলা বাড়ি তৈরি করলাম।

বাড়ির একতলায় বড় ড্রয়িংরুম। তার সঙ্গে লাগোয়া অফিস-ঘর, আমার চেম্বার, লাইব্রেরি রুম, আর ছোট মাপের এয়ারকন্ডিশন্‌ড লেকচার হল। একেবারে পেছনে, বাগানের একটা অংশ নিয়ে, তৈরি করলাম একটা বড়সড় রিসার্চ ল্যাব।

বাড়ির দোতলাটা তৈরি করলাম আমার থাকার জন্যে। ছোট-বড় মিলিয়ে দুটো বেডরুম, একটা ড্রয়িংরুম, একটা ডাইনিং হল, দুটো টয়লেট আর একটা কিচেন। দোতলার সামনের দিকে একটা বিশাল চওড়া বারান্দা। আর পেছনে বাগানমুখী একটা ছোট বারান্দা। সেখানে দাঁড়ালে বাগানের প্রায় সবটাই দেখা যায়।

সবমিলিয়ে একেবারে শাহি ব্যবস্থা।

একতলার অফিসে ইন্টারনেট ফ্যাসিলিটি সমেত ডেস্কটপ কম্পিউটার বসালাম। আমার পারসোনাল ইউজের জন্য কিনলাম ছোট হালকা ল্যাপটপ, আর তার সঙ্গে ইউ-এস-বি মোডেম।

একবছরের মধ্যে আমার ইনফ্রাস্ট্রাকচার তৈরি হয়ে গেল। বাড়ির বাইরে 'ব্ল্যাক ম্যাজিক রিসার্চ সোসাইটি' লেখা সাইনবোর্ড লাগিয়ে দিলাম।

কম্পিউটারের কাজ জানা দুটি ছেলেকে আমার অফিসে চাকরি দিলাম। ওদের নাম অভিরূপ আর সুমিতেশ।

অভিরূপের কাজ হল ইন্টারনেট ঘেঁটে অকাল্ট, ব্ল্যাক ম্যাজিক, ওয়্যারউল্‌ফ, ভ্যাম্পায়ার, প্যারানরমাল ফেনোমেনা, ভৌতিক-অলৌকিক এসব বিষয়ে যা কিছু মেটিরিয়াল পাওয়া যায় সেগুলো ডাউনলোড করে, প্রিন্ট করে, ক্লাসিফাই করে বিভিন্ন ফাইল তৈরি করা।

সুমিতেশ আমারই মতো ইতিহাসে এম. এ. পাশ ছেলে। ও আমার পরামর্শ নিয়ে বইপত্র কিনে-কিনে লাইব্রেরিটা গড়ে তুলতে লাগল।

আরও একবছরের চেষ্টায় আমার সোসাইটির চেহারা দিব্যি দাঁড়িয়ে গেল। যদিও তখন সোসাইটির মেম্বারের সংখ্যা মাত্র একজন : একা আমি।

মা-কে, বাবাকে আমার সবসময় মনে পড়ত। ওদের ফটো বড় করে ফ্রেমে বাঁধিয়ে আমি একতলার ড্রয়িংরুমে রেখেছি। পাশাপাশি। মায়ের কপালে সিঁদুরের টিপ, সিঁথিতে উজ্জ্বল সিঁদুর।

দোতলায় আমার বেডরুমেও সেই একই ফটো। পাশাপাশি। তার পাশে এখন লাজবন্তী যোগ দিয়েছে।

ওদের তিনজনের ফটোর দিকে তাকালে আমি 'অপারেশান ভ্যাম্পায়ার'

মিশনে এগিয়ে যাওয়ার শক্তি পাই, প্রেরণা পাই।

বারান্দায় চুপচাপ দাঁড়িয়ে বৃষ্টিকণার আদর খাচ্ছিলাম আর পুরোনো কথা ভাবছিলাম।

মা যখন চলে যায় তখন আমার বুকে একটা মারাত্মক ক্ষতচিহ্ন তৈরি হয়েছিল। আগুনে ঝলসে যাওয়া একটা দগদগে ঘা। সেটাকে কে যেন মোমবাতির শিখা দিয়ে আরও পোড়াচ্ছে—সর্বক্ষণ পোড়াচ্ছে।

সময়ের হিসেবে দশটা বছর সেই ঘায়ের ওপরে ধীরে-ধীরে শান্তির প্রলেপ জড়িয়ে দিয়েছিল। কিন্তু ঠিক তখনই বাবা চলে গেল।

আমি আক্ষরিক অর্থে একা হয়ে গেলাম।

পাগলের মতো জেদ নিয়ে ভ্যাম্পায়ারদের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছিলাম বটে, কিন্তু মাঝে-মাঝে নিজেকে ভীষণ একা মনে হত।

এইভাবে সুদীর্ঘ সাতটা বছর মরুভূমির শূন্যতার মধ্যে কাটানোর পর আচমকা লাজবন্তীর দেখা পেলাম। আমার জীবনটা আবার জীবন বলে মনে হতে লাগল।

কিন্তু মাত্র একবছর। তারপরই জীবনটার ডাকনাম 'মরণ' হয়ে গেল। কারণ, লাজবন্তী চলে গেল। ভ্যাম্পায়াররা ওকে খেল।

ঠিক তখনই আমি ভ্যাম্পায়ারের গন্ধ পেলাম।

ভ্যাম্পায়ারের খোঁজে গত আট বছর ধরে আমি পশ্চিমবঙ্গের নানান গ্রামেগঞ্জে ঘুরে বেড়িয়েছি। কুখ্যাত কাউন্ট ড্রাকুলার আদি নিবাস ট্রানসিলভ্যানিয়াতেও ঘুরে এসেছি। সেখান থেকে নানারকম সূত্র ধরে ঘুরেছি রোমানিয়া, হাঙ্গেরি, অস্ট্রিয়া, পোল্যান্ড।

এইসব অভিযানের সময় আমি বেশ কয়েকবার ভ্যাম্পায়ারদের কাছাকাছি আসতে পেরেছি। তখন খেয়াল করে দেখেছি, কখনও-কখনও একটা অদ্ভুত গন্ধ আমার নাকে এসেছে।

গন্ধটা অনেকটা দামি বিদেশি পারফিউমের মতো। হালকা, অথচ নিজের বৈশিষ্ট্য জানান দেয়।

প্রায় বছরপাঁচেক আগে হঠাৎই এক গ্রামে ফিল্ড করতে গিয়ে একটা পাণ্ডুলিপি আমার হাতে আসে। রুলটানা কাগজে লেখা জরাজীর্ণ সেই পাণ্ডুলিপি যেন কোনও প্রাচীন পুথি। সেই 'পুথি' পড়তে গিয়ে বুঝতে পারি সেটা একজন ভ্যাম্পায়ারের ডায়েরি। তার পাতায়-পাতায় ভারী অদ্ভুত সব কথা লিখে গেছে সে। আমার জানা সিক্রেটগুলোর হদিস আমি সেই

ম্যানাস্ক্রিপ্ট থেকেই পেয়েছি। তাতে সে লিখেছে, কোনও কারণে এক্সাইটেড হলে তার রোমকূপ থেকে একধরনের রস বেরোয়। তার গন্ধটা অনেকটা ফুলের গন্ধের মতো। এই গন্ধটা অন্যান্য ভ্যাম্পায়ার চিনতে পারে। মিলনের মরসুমেও ওদের শরীর থেকে এই গন্ধ বেরোয়। তবে অনেক ভ্যাম্পায়ারের এই সিম্পটম থাকলেও সব ভ্যাম্পায়ারের বেলায় এটা হয় না। তা ছাড়া গন্ধের তীব্রতারও কম-বেশি হয়।

ভ্যাম্পায়ারদের লাইফে পূর্ণিমার চাঁদের একটা বড় ভূমিকা রয়েছে। পূর্ণিমার চাঁদ দেখে ভ্যাম্পায়াররা এক্সাইটেড হয়ে পড়ে। তখন ওরা রক্তের তেষ্টায় পাগলের মতো হয়ে যায়। ছটফট করে শিকার খুঁজে বেড়ায়। সেসময়ে কোনও নিরীহ মানুষকে ধরে যদি গলায় দাঁত বসানো যায় ভালো, তা না হলে ওরা পশু কিংবা পাখি দিয়ে কাজ চালায়।

শিকারের সন্ধান পেলেও ভ্যাম্পায়াররা উত্তেজিত হয়ে পড়ে। তখন কোনও-কোনও ভ্যাম্পায়ারের শরীর থেকে খুব হালকাভাবে গন্ধটা ভেসে আসে।

আমার শেষ বইটাতে আমি লিখেছি যে, পূর্ণিমার চাঁদ দেখে ভ্যাম্পায়াররা উত্তেজিত হয়। নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে না। কিন্তু এ-কথা লিখিনি যে, তখনও ওদের শরীর থেকে অনেক সময় এই বিশেষ ধরনের গন্ধটা বেরোয়।

এটা আমার সিক্রেটগুলোর একটা।

গন্ধটা নাকে আসামাত্রই আমি বারান্দা থেকে সরে এলাম। ঘরে ঢুকে অটোমেটিক সুইচ টিপে দিলাম। বুলেটপ্রুফ প্লাস্টিকের পাত দু-দেওয়াল থেকে সড়সড় করে বেরিয়ে এল। ঘর আর বারান্দার মাঝে একটা স্বচ্ছ পাঁচিল তৈরি হয়ে গেল। কিন্তু বাইরের রাত, বিজ্ঞাপনের আলো, বৃষ্টির চকচকে ফোঁটা—সব আগের মতোই দেখা যাচ্ছিল।

আমি কোনও ঘরে আলো জ্বালিনি। শুধু একটা হাই-পাওয়ার টর্চ হাতের মুঠোয় তুলে নিলাম, চটপটে পায়ে বাড়ির পেছনদিকে হেঁটে যাওয়ার সময় আমার বেডরুমে ঢুকলাম। রুপোর ছুরিটা বালিশের নীচে ছিল। ওটা তুলে নিয়ে পাজামার পকেটে ঢোকালাম।

গন্ধটা মনে হয় পেছনের বাগানের দিক থেকে আসছে।

দোতলার পেছনদিকে ইংরেজি 'ইউ' চেহারার ছোট বারান্দাটার দরজাও এখন স্বচ্ছ প্লাস্টিকের দেওয়ালে ঢাকা। কারণ, একই বোতামে দুটো বারান্দার

সেফটি ওয়াল অ্যাক্টিভেটেড হয়। মেশিনগানের গুলিবৃষ্টি বা কামানের গোলা ছাড়া এই দেওয়ালে চিড় ধরানো শক্ত।

দেওয়ালের খুব কাছে দাঁড়িয়ে বাগানের অন্ধকারের দিকে চোখ মেলে দিলাম।

একটু পরেই চোখে অন্ধকার খানিকটা সয়ে এল। বাগানের গাছের ছোট-বড় পাতার ফাঁক দিয়ে আমার জমির বাউন্ডারি ওয়ালটা দেখা যাচ্ছিল। কখনও-কখনও ওটা পাতার আড়ালে চলে গেছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও অনেকটাই চোখে পড়ছে।

পাঁচিলের ওপরে কয়েকটা সিলুয়েট ছায়া দেখতে পেলাম। ওদের বৃষ্টি-ভেজা শরীরে দূরের রাস্তার আলো ছিটকে এসে পড়েছে, চকচকে হাইলাইট তৈরি করেছে।

ছায়াগুলো পাঁচিলের ওপরে পিংপং বলের মতো এলোমেলো আর অস্থিরভাবে ছুটোছুটি করছে। ওরা এত ক্ষিপ্রভাবে ছুটছে যে, ওদের গুনতে গিয়ে আমার গুলিয়ে যাচ্ছিল। তা ছাড়া বেশ অবাক লাগছিল যে, অত সরু পাঁচিলের ওপরে কেমন করে ওই ছায়াগুলো দৌড়চ্ছিল, আর কেমন করেই বা ওরা একে অপরকে দিব্যি ছুটে পাশ কাটিয়ে যাচ্ছিল।

রাতের অন্ধকারে ভ্যাম্পায়াররা অনেকবার আমার বাগানে ঢুকেছে। কিন্তু বাড়ির ভেতরে ঢুকতে পারেনি। ঢুকলেও আমি বোধহয় ওদের রুখে দিতাম। রুপোর ছুরি ছাড়াও ওদের আরও কয়েকটা দাওয়াই আছে। সেগুলো আমি জানি।

আমার মনে হল, বাগানের পাঁচিলের ওপরে ছুটোছুটি করে এরা আমাকে ভয় দেখাচ্ছে। হয়তো বদলা নেওয়ার চেষ্টায় খেপে উঠেছে।

আমি জানলার কাছ থেকে সরে এলাম। ওরা কোনও ফাঁকফোকর দিয়ে বাড়ির ভেতরে ঢুকে পড়বে না তো!

এ ব্যাপারে আমি সবসময় খুব কেয়ারফুল থাকি। কিন্তু তা সত্ত্বেও পাগলের মতো ছুটোছুটি করে টর্চের আলোয় সবক'টা জানলা, দরজা, বারান্দা পরীক্ষা করতে লাগলাম। বাড়িতে ঢোকার যতরকম পথ সব বন্ধ আছে তো!

দোতলাটা পুরোপুরি চেক করা হয়ে গেলে আমি একতলায় ছুটলাম। এক-এক করে সব পরীক্ষা করে দেখলাম।

নাঃ, আমার বাড়িটা একেবারে লখিন্দরের লোহার বাসর। তাতে কালনাগিনী ঢোকার সূক্ষ্ম ছিদ্রটুকু পর্যন্ত নেই। আমার বাড়ির ইলেকট্রনিক সেফটি সিস্টেম

তৈরি করতেই খরচ পড়েছিল প্রায় ন' লক্ষ টাকা। সন্ধের পর আমার বাড়িতে ঢুকতে হলে ভ্যাম্পায়ারদের ফোর্থ ডায়মেনশনের কথা ভাবতে হবে। এ-কথা মনে হতেই আমার ঠোঁটের কোণ হাসিতে বেঁকে গেল।

দৌড়ে-দৌড়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠলাম। হাঁপাতে-হাঁপাতে দোতলার বেডরুমে ফিরে এলাম। না, আমার নিশ্ছিদ্র দুর্গে ওরা একটি আঁচড়ও কাটতে পারবে না।

বৃষ্টির শব্দ বেড়েছে। রিমঝিম-রিমঝিম থেকে ঝমঝম হয়ে গেছে। মাঝে-মাঝে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। সাদা আলোর চাবুক মেঘকে শাসন করছে। আমি বড়-বড় শ্বাস ফেলছিলাম, জানলার প্লাস্টিকের স্বচ্ছ নিরাপত্তার দিকে তাকিয়ে ছিলাম। বৃষ্টি আর মেঘের খেলা দেখছিলাম। একইসঙ্গে বুকের ভেতরে গুমগুম শব্দ শুনতে পাচ্ছিলাম।

হঠাৎই একটা খড়খড় শব্দ পেলাম। সামনের বারান্দার দিক থেকে আসছে।

বেডরুমের দরজা দিয়ে ছুটে বেরোলাম। খুব সাবধানে এগিয়ে গেলাম বারান্দার দিকে। ওরা কি কোনওভাবে বাড়িতে ঢুকে পড়ল নাকি?

বারান্দার লাগায়ো হলঘরে ঢুকতেই বিচিত্র দৃশ্যটা আমার চোখে পড়ল।

আমি অন্ধকার ঘরে দাঁড়িয়ে থাকলেও বারান্দার বুলেটপ্রুফ স্বচ্ছ দেওয়ালে বাইরের খাপছাড়া আলো এসে পড়েছে। সেই আলোর মাঝে চোখে পড়ল একটা গাঢ় কালো ছায়া। ছায়াটা টিকটিকির মতো সেই দেওয়ালে লেপটে আছে। মাথাটা নীচের দিকে, হাত পা দুপাশে ছড়ানো। খুব ধীরে ধীরে বুকে হেঁটে এদিক-ওদিক চলে-ফিরে বেড়াচ্ছে।

ভ্যাম্পায়ারদের কেউ-কেউ সরীসৃপের মতো দেওয়ালে, সিলিং-এ চলে বেড়াতে পারে। এই ভ্যাম্পায়ারটা কি এইভাবে প্লাস্টিকের দেওয়ালটা জরিপ করে বাড়ির ভেতরে ঢোকার ছিদ্র খুঁজে বেড়াচ্ছে?

আমি ওটাকে লক্ষ্য করে টর্চের আলো ফেললাম।

সাদা ফ্যাকাশে মুখ। চোখ দুটো গভীর, কালো—যেন কাজল পরানো রয়েছে। ঠোঁট লালচে।

মুখটা ওলটানো থাকায় খুব অদ্ভুত আর বীভৎস লাগছে।

জোরালো আলো মুখে পড়তেই শয়তানটা কুঁকড়ে গেল। কারণ, আলো ওরা পছন্দ করে না। সূর্যের আলো তো নয়ই! সূর্যের আলো, কিংবা বলা ভালো দিনের আলো, ওরা অপছন্দ করে—কারণ, সেই আলোয় ওরা শিকার

করতে পারে না। ওরা অন্ধকার ভালোবাসে। ওরা অন্ধকারের সন্তান। ওদের যত দাপট আঁধারে।

টর্চের আলো মুখে পড়ামাত্রই ভ্যাম্পায়ারটা একেবারে ফ্রিজ শট হয়ে গেল। টানা-টানা চোখ মেলে টর্চের আলোর দিকে তাকিয়ে রইল।

আমি ওটার কাছে এগিয়ে গেলাম। খুব কাছে।

এখন আমাদের মাঝখানে শুধু একটা প্লাস্টিকের দেওয়াল।

আমি মাথা নীচু করে ওর মুখের কাছে মুখ নিয়ে এলাম। বাঁ-হাতে ধরে রাখা টর্চের আলো আমাদের মুখে। পকেট থেকে রুপোর ছুরিটা বের করে ওর মুখের ওপরে আচমকা চেপে ধরলাম।

আমাদের মাঝে যে প্লাস্টিকের পার্টিশান আছে সেটার কথা ভুলে গেল প্রাণীটা। আঁতকে উঠে মাথাটা এক ঝটকায় পিছিয়ে নিল।

আমি শব্দ না করে হাসলাম। ছুরিটা দেখলেই ওরা রুপোর ছুরি বলে চিনতে পারে। এ ব্যাপারটা আগেও দেখেছি। একটা ভ্যাম্পায়ারকে আমি প্রায় চার বছর আগে খতম করেছিলাম। আমার বাড়ির বাগানে। ওটা বাগানে লুকিয়ে ছিল।

হাত আর পায়ের চেটো দিয়ে প্লাস্টিকের ওপরে তরতর করে ছুটে চলে গেল প্রাণীটা। ঠিক যেন একটা দানব টিকটিকি।

আমি সোজা হয়ে দাঁড়ালাম। বুকের ভেতর থেকে একটা স্বস্তির নিশ্বাস ভেসে উঠল। এতক্ষণ ধরে আমি কীরকম উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলাম সেটা এখন বুঝতে পারছি। বুকের ভেতরে ঢিপঢিপ শব্দ হচ্ছে, কপালের পাশে একটা শিরা দপদপ করছে।

ছুরিটা পকেটে ঢুকিয়ে রাখলাম। তারপর বাগানের দিকের ছোট বারান্দা লক্ষ্য করে হাঁটা দিলাম। দেখি, এখনও ভ্যাম্পায়ারগুলো পাঁচিলের ওপরে ছুটোছুটি করছে কি না।

টের পেলাম, বৃষ্টির শব্দ আরও বেড়েছে। বিদ্যুৎ ঝলসে উঠছে ঘন-ঘন, তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে বাজ পড়ার শব্দ হচ্ছে।

ছোট বারান্দার প্লাস্টিক পার্টিশানের কাছে এসে দাঁড়ালাম। অন্ধকারে তীক্ষ্ণ নজর চালিয়ে দেখলাম। না, কেউ নেই। অন্তত আমি দেখতে পাচ্ছি না। যদি বা থাকে, ওরা ওখানে যেমন খুশি, যেমন প্রাণ চায়, দাপাদাপি করুক। আমি যে আমার বাড়ির ভেতরে হান্ড্রেড পারসেন্ট সুরক্ষিত সেটা আমি ভালো করে জানি।

আর এও জানি, এইভাবে একা-একা সুরক্ষিত থাকাটা কত কষ্টের। তখন লাজবন্তী মনে-মনে আমার কাছে আসে। মনে-মনে আমার সঙ্গে থাকে। কিন্তু আমাকে ফোন করে যে কথা বলে সেটা সত্যি-সত্যি।

আমাকে লাজবন্তী বলতে গেলে একদিন পর-পর ফোন করে। ওর ফোনের জন্যে আমি অপেক্ষা করি।

শোওয়ার ঘরে গিয়ে আলো জ্বেলে দিলাম। টর্চ আর ছুরি বালিশের নীচে রেখে দিলাম। একপলক দেওয়াল-ঘড়ির দিকে তাকালাম। রাত সাড়ে দশটা।

পাশের দেওয়ালে মাঝারি মাপের তিনটে বাঁধানো ফটো। পাশাপাশি। মা, বাবা, আর লাজবন্তী। ওরা তিনজন আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছে। নয়তো একা-একা আমার আর বাঁচতে ইচ্ছে করে না।

খাওয়ার ঘরে গেলাম। আলো জ্বেলে কাজ শুরু করলাম।

ফ্রিজে ঠান্ডা খাবার আছে। সামনে মাইক্রোওয়েভ আভেন। আর কী চাই! আপনা হাত জগন্নাথ।

একটু পরেই টিভি চালিয়ে খেতে বসলাম। বাঁ-হাতে রিমোটের বোতাম টিপে-টিপে নানান চ্যানেল সার্ফ করতে লাগলাম। বুঝতে পারছিলাম, আমার ভেতরে কেমন একটা অস্থিরতা কাজ করছে।

কিন্তু আমার তো অস্থির হলে চলবে না! আমি ভ্যাম্পায়ারের বংশ নির্বংশ করার শপথ নিয়ে আট বছর আগে কাজে নেমেছি। এ-কাজ করতে-করতে কখনওই দুর্বল হলে চলবে না।

ডাইনিং টেবিলে মোবাইল ফোনটা রাখা ছিল। হঠাৎই ওটা বেজে উঠল। রিমোট ছেড়ে ওটা কাছে টেনে নিলাম। দেখলাম, নিলি।

মনটা একটু খুশি হয়ে উঠল। ফোন ধরে ওকে বললাম, 'হ্যালো, খেতে বসেছি—।'

'ও, তাই? আমি তা হলে একটু পরে ফোন করছি...।'

'উঁহু, তার কোনও দরকার নেই। খাওয়া শেষ হলেই আমি রিং ব্যাক করছি।'

'ও. কে....' বলে ফোন ছেড়ে দিল ও।

দু-মিনিট পার হতে-না-হতেই আমি ওকে রিং ব্যাক করলাম। মোবাইল কানে চেপে ধরে ডাইনিং রুমের আলো-টালো নিভিয়ে বেডরুমে চলে এলাম। সটান বিছানায় শুয়ে পড়লাম। ও-প্রান্তে নিলি ফোনটা ধরতেই বললাম, 'হ্যালো, কী খবর?'

'আপনার খবর কী সেটা আগে বলুন...।' নিলির কথাবার্তায় উচ্ছল প্রগলভতা। এটা আমার ভালো লাগে।

গত পরশু ওর সঙ্গে ফোনে কথা হয়েছিল। তারপর এই এখন।

নিলিকে যে প্রথম দেখাতেই আমার একটু-একটু ভালো লেগে গেছে তার কারণ হয়তো লাজবন্তীর সঙ্গে ওর চেহারার মিল। তবে নিলি স্বভাবে চঞ্চল, ছটফটে, অনেক কথা বলতে ভালোবাসে। সেদিক থেকে লাজবন্তী ছিল ঠিক উলটো ঃ শান্ত, গভীর। মুখের বদলে চোখ দিয়ে বেশি কথা বলত। খানিকক্ষণ এ-কথা সে-কথার পর নিলি মজার সুরে প্রশ্ন করল, 'ভ্যাম্পায়ারদের আপনি ভয় পান না?'

'না, পাই না।' পুরোপুরি সত্যি কথাটা ওকে বলতে পারলাম না। ভ্যাম্পায়ারদের আমি ভয় পাই বলেই আত্মরক্ষার অস্ত্রগুলো সবসময় আমার সঙ্গে রাখি। প্রতিদিন সন্ধের পর প্রতিটি মুহূর্ত সাবধান থাকি। কোনও অচেনা লোকজনের সঙ্গে কোথাও যাই না। নিজের গাড়ি নিজে চালাই। সন্ধের পর বাড়িতে এলে সুরক্ষা ব্যবস্থা নিই। সেটা না নিলে আজ একটু আগে যে-আক্রমণ হল, তারপর আমি আর মানুষ থাকতাম না।

নিলি বলল, কাল সেকেন্ড হাফে ও আমাদের অফিস আসবে—লাইব্রেরিতে বসে পড়াশোনা করবে। ও একটা উইক্‌লি ম্যাগাজিনের ফ্রিল্যান্স জার্নালিস্ট। মাঝে-মাঝেই সেখানে আর্টিক্‌ল লেখে। আমাদের সোসাইটির পরের বুলেটিনটার জন্যে ওকে আমি একটা লেখা দিতে বলেছি। তার থিম ঃ 'ভ্যাম্পায়ার ঃ সাধারণ মানুষের চোখে'।

ও কাল আসবে শুনে আমি বললাম, 'কাল আপনার লাইব্রেরির কাজ হয়ে গেলে আপনার সঙ্গে একটু কথা বলব—কফি খেতে-খেতে।'

'কী কথা?' হেসে জিগ্যেস করল ও।

'অনেক কথা। ভ্যাম্পায়ার নিয়ে, ভ্যাম্পায়ার না নিয়ে...।'

'অনেক কথা? এই যে বললেন, একটু কথা?' ফাজিল গলায় বলল।

'ভ্যাম্পায়াররা ওরকম বলে।'

'তার মানে! আপনি কি ভ্যাম্পায়ার নাকি?'

'কে জানে! হতেও তো পারি...।'

আরও কিছুক্ষণ কথা বলার পর ফোন ছেড়ে দিলাম।

আজ রাতে যে-ঘটনা ঘটেছে সেটা নিলিকে আমার বলতে ইচ্ছে করছিল। তা ছাড়া, কেন জানি না, আমার কাজে ও পাশে-পাশে থাকলে ভালো হয়,

এ-কথাও মনে হচ্ছিল। ভাবছি, কাল ওকে বলব আমার কাছে পার্ট-টাইম রিসার্চে জয়েন করার জন্যে।

রত্নাকর খুব ভালো রিসার্চার—ভালো বন্ধুও বটে। আমার খুব খেয়াল রাখে। কিন্তু কখনও-কখনও মনে হয়, ও আমার বড্ড বেশি খেয়াল রাখে। আমাকে সবসময় আগলে রাখতে চায়।

আমি এইসব কথা ভাবছিলাম আর বিছানায় এপাশ-ওপাশ করছিলাম। তখনই আমার চোখ গেল লাজবন্তীর ফটোর দিকে।

টানা-টানা চোখ—যেন ঘুমের নরম ছোঁয়া লেগে আছে। নাক চোখা, ঠোঁট পুরু। মুখটা সামান্য লম্বাটে।

আমার মনে পড়ে গেল, যে-ভ্যাম্পায়ারটা লাজবন্তীর সর্বনাশ করেছিল সেটা খুব লম্বা ছিল। লাজবন্তীকে গলায় কামড়ে ধরে ভ্যাম্পায়ারটা সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছিল; লাজবন্তী তখন ওটার হিংস্র দাঁতের পাটি থেকে ঝুলছিল। ওর পা দুটো পাগলের মতো শূন্যে লাথি ছুড়ছিল। ওর গলার কাছ থেকে রক্ত চুঁইয়ে পড়ছিল।

এক মুহূর্তের জন্যে অসাবধান হয়েছিলাম। আর সেই মুহূর্তেই ঘটে গিয়েছিল আমার সর্বনাশ।

লাজবন্তীকে আর আমি ফিরে পাইনি। ফিরে পাবও না কখনও। কারণ, ও মানুষের এলাকা ডিঙিয়ে চলে গেছে অমানুষের এলাকায়। কিন্তু তা সত্ত্বেও ও মাঝে-মাঝে আমাকে ফোন করে। সেই আগের মতোই মিষ্টি গলা। আমাদের দুজনের অনেক কথা ওর এখনও মনে আছে।

লাজবন্তী রাতে ফোন করে আমাকে। অনেক রাতে। ওর ফোন আসবে এই আশায় রাতে আমি ঠিকঠাক ঘুমোতে পারি না। চারদিন আগে রাত সাড়ে চারটে নাগাদ ওর ফোন এসেছিল। তারপর...তার পর থেকে আমি ওর ফোনের জন্যে অপেক্ষা করছি। কারণ, আমার তো ওকে ফোন করার কোনও উপায় নেই! ও এক-একসময় এক-একটা অচেনা নম্বর থেকে ফোন করে। ওই কোরাস ভয়েসের মতো।

আমার মনে হয়, অন্য ভ্যাম্পায়ারদের লুকিয়ে লাজবন্তী আমাকে ফোন করে। কে জানে!

আলো নিভিয়ে দিলাম।

লাজবন্তী আর নিলির কথা ভেবে চললাম। তারই মাঝে মনে হল নিজের কথা। আমার এই জীবনটা কত স্বাভাবিক আর সুন্দরভাবে শুরু হয়েছিল!

তারপর নানান বাঁক নিয়ে আজ সেটা কী অস্বাভাবিক চেহারাই না নিয়েছে!

মনে-মনে ঘুমকে ডাকতে লাগলাম।

তিন

সোসাইটির অফিসে ঢোকার সময় নিলি আমাকে ফোন করল। সময় তখন ঠিক দুটো। আমি লাঞ্চ সারতে দোতলায় এসেছি। খাওয়া শেষ করেই আবার নীচে অফিসে নামব।

যে-ভদ্রমহিলা রোজ সকালে আমার বাড়িতে কাজে আসে ওর নাম শান্তা। রোগা, কালো, শুকনো চেহারা। ভীষণ চুপচাপ। কিন্তু কাজে খুব পরিপাটি। শান্তার স্বামী সাইকেল ভ্যান চালাত, রোজ নেশা করত, তবে তার মনটা সাদা ছিল। সাত-আট বছর আগে নেশার ঘোরে রাস্তা পার হতে গিয়ে লরির ধাক্কায় মারা যায়।

শান্তামাসি আমার রান্না করে, জামাকাপড় কেচে দেয়, ঘরদোর পরিষ্কার রাখে। দু-বেলা এসে বলতে গেলে সব কাজই করে দেয়। তবে বিকেলের কাজ মাসিকে বিকেলের মধ্যেই শেষ করতে হয়। কারণ, সন্ধের পর কাউকে আমি দোতলায় থাকতে দিই না। তার কারণ, সূর্য ডুবে গেলে আমি নিজেকে ছাড়া আর কাউকে বিশ্বাস করি না।

শান্তামাসির রান্নার হাত দারুণ। মায়ের রান্নার কথা মনে করিয়ে দেয়। এই যে এখন চিংড়ি মাছ দিয়ে কচুর শাকের ঘণ্ট খাচ্ছি, সেটা শান্তামাসির কৃপায়। শান্তামাসি জানে, আমি কী-কী খেতে ভালোবাসি। এ ছাড়া আমার আর-সব কথা কিছু জানে না।

নিলিকে বললাম যে, একটু পরেই আমি অফিসে নামছি। নেমে কথা হবে।

দোতলা লক করে নীচে এলাম।

ড্রয়িংরুমে ঢোকার সময় দেখি রত্নাকর বাইরের খোলা জায়গায় দাঁড়িয়ে সিগারেট খাচ্ছে। আমার অফিসটা স্ট্রিক্টলি 'নো স্মোকিং' অফিস। তাই রত্নাকরকে মাঝে-মাঝে অফিসের বাইরে গিয়ে এই নেশার কাজটা সারতে হয়।

আমাকে দেখেই রত্নাকর সিগারেটটা ফেলে দিয়ে আমার কাছে চলে এল।

ড্রয়িংরুমে একজন অচেনা ভদ্রলোক আর ভদ্রমহিলা বসেছিলেন। ভদ্রলোক আমাদের সোসাইটির একটা বুলেটিন পড়ছিলেন। ওঁদের সামনে একটা সেন্টার টেবিলে অনেক পত্রপত্রিকা রাখা আছে। তার মধ্যে আমাদের কয়েকটা বুলেটিনও আছে।

আমি আমার চেম্বারের দিকে হাঁটা দিলাম। রত্নাকর আমার পেছনে সমান তালে হেঁটে আসতে লাগল।

রত্নাকর সবসময়ে এমনটাই করে। আমার কাছাকাছি, প্রায় ছায়াসঙ্গী হয়ে থাকে। ব্যাপারটা আমার মাঝে-মাঝে যথেষ্ট বিরক্তিকর লাগে। কিন্তু ওর বন্ধুত্বের কথা ভেবে কিছু বলি না। তা ছাড়া, বললে ও আহত হবে।

আমার চেম্বারে ঢোকার পর রত্নাকর বলল, 'ওই মেয়েটা এসেছে—।'

রত্নাকরকে ঘিরে সিগারেটের গন্ধ। আমার দম বন্ধ হয়ে আসতে লাগল। ওর কী যে এক বিটকেল অভ্যেস!

ভুরু কুঁচকে ওর দিকে তাকালাম ঃ 'ওই মেয়েটা মানে?'

আমি জানি, ও নিলির কথা বলছে। কিন্তু ওর 'ওই মেয়েটা'-র মধ্যে কোথায় যেন একটা অপছন্দ আর অশ্রদ্ধার ছায়া রয়েছে।

রত্নাকর আমার বিরক্তিটা ভালোই বুঝতে পারল। চোখ সামান্য নীচু করে বলল, 'নিলি। ওই যে, সেদিন আমাদের সোসাইটির নতুন মেম্বার হল।'

'জানি। তুই লাইব্রেরিতে গিয়ে তোর কাজে বোস...।'

লাইব্রেরির এক কোণে, সুমিতেশের বসার জায়গার কাছাকাছি, রত্নাকরের বসার চেয়ার, টেবিল, আর কম্পিউটার। তার পাশে একটা ছোট বইয়ের র‍্যাক।

ও রওনা হতে গিয়েও থমকে দাঁড়াল। আমার দিকে ফিরে তাকাল ঃ 'দুপুরে খাওয়া ঠিকমতো খেয়েছিস তো?'

না, প্রশ্নটায় কোনও ঠাট্টা কিংবা ব্যঙ্গ ছিল না। ও এইরকমই। আমার ভালো-মন্দ নিয়ে ওর সর্বক্ষণ চিন্তা। আমি ঠিকমতো খেলাম কি না, ঠিকমতো আমার ঘুম হল কি না, আমার শরীর ঠিক আছে কি না—সবসময় ও এসবের খোঁজ নেয়।

কখনও-কখনও ব্যাপারটা আমার বাড়াবাড়ি বলে মনে হয়। একটা বাজে সন্দেহও মাঝে-মাঝে উঁকি মারে। ও তো এমনিতে পুরুষ। কিন্তু ওর কেমিক্যালে গণ্ডগোল নেই তো!

রত্নাকরকে নজর করে দেখলাম।

নিরীহ মুখ। একটা ফুলহাতা চেক শার্ট ইন করে পরেছে। কোমরে বেল্ট। তাতে ভুঁড়িটা আরও বেশি বেমানান লাগছে। তার ওপর মাথায় টাক।

এইরকম একটা চেহারার মানুষকে কবি বলে ভাবতেও কষ্ট হয়, হোমোসেক্সুয়াল বলে ভাবতেও কষ্ট হয়।

হাসি চেপে রত্নাকরকে জানালাম যে, হ্যাঁ, আমি ঠিকমতো খেয়েছি।

ও চলে যাওয়ার পর দমবন্ধ ভাবটা কেটে গেল। ব্যস্তভাবে অফিসের কাজ নিয়ে বসলাম। গত ছ'-সাত বছরে আমার কাজ যেমন বেড়েছে তেমনই অফিসে স্টাফের সংখ্যা বেড়েছে। অভিরূপ আর সুমিতেশকে নিয়ে এখন লোকের সংখ্যা সাতজন। এছাড়া রত্নাকর তো আছেই!

ওকে অনেকবার আমি ফেলোশিপের একটা সামান্য টাকা অফার করেছি, কিন্তু ও নেয়নি। বলেছে, ওর টাকার কোনও দরকার নেই।

নিশ্চয়ই রত্নাকর বেশ বড়লোকের ছেলে। ওর আপনজন বলতে মা, বাবা, এক ভাই, আর এক বোন। ওর বাড়ি গড়িয়ার দিকে কোথায় একটা যেন। আমি কখনও ওর বাড়ি যাইনি।

রত্নাকর চলে যাওয়ার পর আমি ইন্টারকমে ফোন করে ফ্রন্ট অফিস থেকে অভিরূপকে ডেকে পাঠালাম। ও এখন আমাদের সোসাইটির অফিসের সুপারিন্টেন্ডেন্ট। রত্নাকর আর আমার কাছ থেকে ইনস্ট্রাকশন নেয়।

অভিরূপ আমার চেম্বারে এল। প্রথমে নতুন মেম্বারদের ফাইলগুলো আমাকে দেখাল। তারপর বলল যে, গুয়াহাটির 'প্যারানরমাল অ্যান্ড হাইপারনরমাল ফেনোমেনা স্টাডি গ্রুপ'-এর কাছ থেকে একটা লেকচারের ইনভিটেশান এসেছে। ইনভিটেশানটা অ্যাকসেপ্ট করব কি না সেটা তিনদিনের মধ্যে ই-মেল করে জানাতে বলেছে। এ ছাড়া আজ একটু আগে একজন ভদ্রলোক আর ভদ্রমহিলা আমাদের সোসাইটির মেম্বার হয়েছেন।

অভিরূপের সঙ্গে কাজ সেরে আমি চেম্বার থেকে বেরোলাম।

বাঁ-দিকে, আমার চেম্বারের লাগোয়া, এসি লেকচার হল। হলের ক্যাপাসিটি প্রায় পঞ্চাশ জন। অনেক সময় এই লেকচার হলেই আমি মেম্বারদের জন্যে সেমিনারের আয়োজন করি।

হল পেরোলেই লাইব্রেরি। আর লাইব্রেরির পরেই রিসার্চ ল্যাবরেটরি।

আমি লাইব্রেরিতে ঢুকে পড়লাম।

সব চুপচাপ। গোটা ঘরে এসি-র ঠান্ডা ছেয়ে আছে। সুমিতেশ নিজের জায়গায় বসে কম্পিউটারে লাইব্রেরির বইপত্রের ডেটা এন্ট্রি নিয়ে ব্যস্ত।

আমাকে ঢুকতে দেখে চোখ তুলে একবার তাকাল শুধু—তারপর আবার কাজে মন দিল।

নিলিকে দেখতে পেলাম।

ওর পায়ে নীল জিন্‌স্‌। গায়ে হালকা বাদামি রঙের টপ। তার ওপরে ছোট-ছোট কালো ফুলের প্রিন্ট। গলায় একটা রঙিন সিল্কের স্কার্ফ। ওর সামনে টেবিলে একটা খোলা বই।

আমাকে দেখে হাসল ও। তারপরই উঠে দাঁড়াল।

আমি ওর কাছে এগিয়ে গেলাম। লক্ষ করলাম, রত্নাকর ঘাড় ঘুরিয়ে আমার দিকে দেখছে। কিন্তু ওর নজরকে আমি পাত্তা দিলাম না।

'কী পড়াশোনা করছেন?' ওর টেবিলে পাতা বইটা দেখিয়ে জিগ্যেস করলাম।

'ভ্যাম্পায়ারদের মরফোলজি। কিন্তু খুব খটমট লাগছে। আসলে আমি তো জুওলজি নিয়ে পড়িনি, তাই...।'

'পড়া হয়ে গেলে আমার চেম্বারে একটু আসবেন?'

'একটু আসব, না অনেক আসব?'

আমি ওর কথায় হাসলাম। বুঝলাম, কাল রাতে যে 'একটু কথা' বলেছিলাম, এটা তার চাটনি। কিন্তু ওর প্রগলভতা আমার ভালো লাগল। চারপাশে চোখ বুলিয়ে একবার দেখে নিলাম, আমাদের কথাবার্তা শোনার মতো কাছাকাছি কেউ আছে কি না। না, সেরকম কাছে কেউ নেই।

'কী হল, বলুন—একটু আসব, না অনেক আসব?'

নাঃ, মেয়েটার সাহস আছে! আমি একজন প্রফেসর বলে কথা! তার ওপর ওর সঙ্গে মাত্র দশ-বারো দিন আগে আলাপ।

কিন্তু নিলির কথাগুলো আমাকে টানছিল। হেসে ওকে বললাম, 'আপনি যদি অনেক আসেন তা হলে এখন চেম্বারে ফিরে গিয়ে আমি অনেক-অনেক অপেক্ষা করব...।'

এ-কথা বলে আমি লাইব্রেরির দরজার দিকে এগোলাম।

দরজার কাছাকাছি একটা টেবিলে এক প্রৌঢ় দম্পতি বসে পড়াশোনা করছিলেন। আমি ওঁদের ভালো করে চিনি। বীরেন্দ্রনাথ নাগ, আর ওঁর স্ত্রী অমিতা। আমাদের সোসাইটির বেশ পুরোনো মেম্বার। প্রায় পাঁচ বছর আগে ওঁদের একমাত্র সন্তান রাজন অপঘাতে মারা যায়। মানি স্কোয়ারের কাছাকাছি মেট্রো রেলের নীচে দুটো বড়-বড় পাথরের আড়ালে রাজনের ডেডবডি

পাওয়া যায়। ছেলেটার গলায় পাশাপাশি দুটো বাইট মার্ক ছিল। সেটা দেখেই সবাই ধরে নিয়েছিল, রাজন সাপের কামড়ে মারা গেছে। ওর শরীরটা যে রক্তশূন্য ফ্যাকাশে সেটাকে কেউ আর গুরুত্ব দেয়নি।

কিন্তু পোস্টমর্টেম রিপোর্টে রাজনের শরীরে কোনও বিষ পাওয়া যায়নি। তা ছাড়া সাপ একটা মানুষের শরীর বেয়ে উঠে তার গলায় ছোবল মারবে, এই ব্যাপারটা বেশ অস্বাভাবিক।

পুলিশ এটা নিয়ে আর ঘাঁটাঘাঁটি করেনি। 'কজ অফ ডেথ : স্নেক বাইট' লিখেই ফাইল ক্লোজ করে দিয়েছে।

বীরেনবাবু এতে খুশি হননি। অমিতাও। শোক-দুঃখ নিয়ে কয়েক বছর কেটে যাওয়ার পর আমার লেখা প্রথম বইটা বীরেন নাগের হাতে পড়ে। সেটা পড়ে শেষ করার পর তিনি ওঁর স্ত্রীকে বইটা পড়তে দেন।

আমার বইটা পড়ার পর ওঁরা স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছন যে, রাজন ভ্যাম্পায়ারের কামড়ে মারা গেছে। ওর গলায় কামড়ের দাগ আর রক্তহীন সাদাটে শরীর—এই দুটো ঘটনার আর কোনও লাগসই ব্যাখ্যা হতে পারে না।

আমার বইটা নাগদম্পতি আমাদের সোসাইটির ফোন নাম্বার আর ই-মেল আই-ডি পেয়েছিলেন। তারপর ওঁরা অফিসে এসে অভিরূপের সঙ্গে যোগাযোগ করেন, মেম্বার হন।

আমার সঙ্গে চোখাচোখি হতেই মিস্টার নাগ উঠে দাঁড়িয়েছেন। হেসে জিগ্যেস করলেন, 'ভালো আছেন, ডক্টর মিত্র?'

'হ্যাঁ, আপনারা কেমন আছেন?'

স্ত্রীর দিকে একবার তাকালেন বীরেন নাগ। তারপর : 'ওই আছি আর কী!'

বীরেনবাবুর হৃষ্টপুষ্ট বেঁটে চেহারা। গালে খোঁচা-খোঁচা দাড়ি। মাথার সামনের দিকটা টাক পড়ে গেছে বলে কাঁচা-পাকা চুল সামনের দিকে আঁচড়ে সেটা কিছুটা ঢাকার চেষ্টা করেছেন। ভদ্রলোকের চোখে সরু ফ্রেমের চশমা। গাল সামান্য বসা।

মিস্টার নাগ আবার বললেন, 'একটা ফিল্ড ট্রিপের বন্দোবস্ত করুন না। অনেকদিন ফিল্ড হয় না—।'

অমিতা নাগ স্বামীর হাত ধরে টান মারলেন : 'কেন, এই তো বেশ আছি। ভ্যাম্পায়ার নিয়ে পড়াশোনা করছি। অনেক কিছু জানতে পারছি।

ফিল্ডে ছুটোছুটি করার কী দরকার? সুস্থ শরীরকে ব্যস্ত করা।'

বীরেন নাগ স্ত্রীর দিকে তাকালেন। ব্যথা মেশানো এক অদ্ভুত গলায় বললেন, 'রাজনকে তুমি ভুলে গেছ?'

টেবিলের দিকে চোখ নামালেন অমিতা। ধরা গলায় বললেন, 'না। ভুলিনি। কী করে ভুলব! কিন্তু পাশাপাশি আবার ভয়ও যে করে!' আমার দিকে তাকালেন। বললেন, 'আপনার বইতে যা পড়েছি, যেসব ছবি দেখেছি—তাতে ভয় করবে না, বলুন!'

ভদ্রমহিলার রোগা চেহারা। মুখে কেমন একটা অসহায় ভাব।

আমি হেসে বললাম, 'কোনও ভয় নেই আপনার, মিসেস নাগ। ফিল্ডে গেলে আমি থাকব, রত্নাকর থাকবে। কোনও ভ্যাম্পায়ার অ্যাটাক করতে এলে আমরা রুখে দেব। সেদিন রাজনের পাশে যদি আমি থাকতাম তা হলে আজ রাজন আপনাদের সঙ্গে থাকত—।'

অমিতা কেঁদে ফেললেন। হঠাৎই উঠে দাঁড়িয়ে আমার হাত চেপে ধরলেন। প্রাণপণে কান্না চাপতে চেষ্টা করছিলেন কিন্তু পারছিলেন না।

বীরেন নাগ স্ত্রীর পিঠে হাত বুলিয়ে ওঁকে শান্ত করার চেষ্টা করতে লাগলেন।

আমি আলতো করে অমিতার হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে বললাম, 'মনে রাখবেন, আপনারা যা করছেন রাজনের জন্যে করছেন। আমরা কিছুতেই ভ্যাম্পায়ার নিয়ে রিসার্চ থামাব না। ফিল্ড ট্রিপে আমরা অবশ্যই যাব। ওতে ভয় পাওয়ার কিচ্ছু নেই ।'

আমি লাইব্রেরি থেকে বেরিয়ে এলাম। এখন চেম্বারে গিয়ে আমি নিলির জন্যে অপেক্ষা করব।

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। পাঁচ-সাত মিনিটের মধ্যেই নিলি কাচের দরজা ঠেলে চেম্বারে ঢুকল। ওর দিকে তাকিয়ে লাজবন্তীকে খুঁজলাম। লক্ষ করলাম, নিলির নাকের ডগাটা ওপরদিকে সামান্য বাঁকানো। তার জন্যে একটা হালকা জেদি ভাব ফুটে বেরোচ্ছে। এই ভাবটা লাজবন্তীর মধ্যেও ছিল।

নিলিকে বসতে বললাম। ওর শরীর থেকে পারফিউমের গন্ধ ভেসে আসছে।

ও বসামাত্রই বলল, 'কী কথা বলবেন বলছিলেন—বলুন!'

'বলছি।' ফোন করে অভিরূপকে বললাম আমাদের জন্যে দু-কাপ কফির ব্যবস্থা করতে। তারপর নিলির দিকে তাকিয়ে বললাম, 'আপনার মধ্যে একটা

ম্যাগনেটিক পাওয়ার আছে। ব্যাপারটা খুব পাওয়ারফুল...।'

নিলি অপলকে তাকিয়ে রইল আমার দিকে। আমার ভেতরটা পড়ে নিতে চাইল যেন। তারপর হেসে বলল, 'ভ্যাম্পায়ারদের এরকম ম্যাগনেটিক পাওয়ার থাকে।'

'আপনি কি ভ্যাম্পায়ার নাকি?'

'কে জানে! হতেও তো পারি...।' হাসল।

'ইয়ার্কি হচ্ছে?'

'হ্যাঁ। ভ্যাম্পায়াররা এরকম ইয়ার্কি করে...।'

এবার আমার হেসে ওঠার পালা।

বেয়ারা কফি দিয়ে গেল। কফি খেতে-খেতে আমরা কথা বলতে লাগলাম।

প্রথমদিন আলাপ হওয়ার পর নিলিকে আমি বাড়ি পৌঁছে দিয়েছিলাম। ওর বাড়ি মানিকতলার কাছাকাছি, গড়পাড়ে। মোটেও আমার বাড়ি ফেরার পথে নয়। তাই গাড়ি অন্যপথে ঘুরিয়ে অনেকটা সময় খরচ করে তারপর নিলিকে নামাতে হয়েছে।

রত্নাকর যে এতে বেশ বিরক্ত হয়েছে সেটা বোঝা গেল নিলি নেমে যাওয়ার পর। একটা সিগারেট ধরিয়ে ও বলেছিল, 'কিরণ, এত সহজে ফাঁদে পা দিস না—সাবধান হ।'

'কীসের ফাঁদ?'

'এখনও জানি না...তবে আমি কিন্তু ফাঁদের গন্ধ পাচ্ছি।'

আমি ওর কথা হেসে উড়িয়ে দিয়ে বলেছি, 'কোনও মেয়ে আমার সঙ্গে আলাপ করলেই তুই ফাঁদের গন্ধ পাস...।'

রত্নাকর আর কোনও কথা বলেনি। শুধু একমনে সিগারেটে টান দিয়ে যাচ্ছিল। খানিকটা যেন গুম হয়ে রইল। কিন্তু আমি ওকে বিশেষ পাত্তা দিলাম না।

এর দু-দিন পরেই নিলি রত্নাকরের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করে মেম্বার হওয়ার জন্যে আমাদের সোসাইটির অফিসে এসেছে। ফর্ম ফিল আপ করে টাকা জমা দিয়ে সমস্ত ফরমালিটি কমপ্লিট করেছে।

তারপর থেকে নিলি মাঝে-মাঝেই আমাকে ফোন করে। নানারকম হালকা কথা বলে, আর তারই ফাঁকে-ফাঁকে বিভিন্ন টাইপের ভ্যাম্পায়ার সম্পর্কে নানা কথা জানতে চায়।

'নিলি, আপনাকে একটা কথা বলব?'

'কী কথা?'

'আপনি আমার এই সোসাইটিতে এসে...মানে, এখানে এসে পার্ট টাইম রিসার্চ করুন। আপনি আমার কাছে রিসার্চ করলে আমার খুব ভালো লাগবে। রিসার্চটা আমরা দুজনেই এনজয় করব—তাই না?'

চোখে দুষ্টু হাসল নিলি। একটু চুপ করে থেকে বলল, 'এটাই আপনার সেই "অনেক কথা"?'

'যদি বলি, হ্যাঁ...।'

'তা হলে আমার উত্তরও "হ্যাঁ"।'

এ-কথার পর দুজনে অনেকটা হাসাহাসি হল।

হঠাৎই নিলি জিগ্যেস করল, 'একতলাটা তো অফিস—দোতলায় কী আছে?'

'দোতলায় আমি থাকি—।'

'একা থাকেন? আর কেউ নেই?'

'নাঃ, একাই থাকি।'

'একা-একা লাগে না?'

কী অদ্ভুত প্রশ্ন!

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললাম, 'একা থাকলে তো একা-একা লাগবেই!'

নিলিকে দোতলায় নিয়ে গিয়ে আমার আস্তানাটা ঘুরিয়ে দেখাতে ইচ্ছে করছিল। কিন্তু এত অল্প আলাপে সে-কথা বলাটা মানানসই হবে কি না ভাবছিলাম। কিছুক্ষণ দোনামনা করার পর কথাটা বলেই ফেললাম।

রাজি হতে নিলি কোনও সময় নিল না। সুতরাং ওকে নিয়ে দোতলায় উঠলাম।

দোতলার সুরক্ষা ব্যবস্থা দেখে নিলি অবাক হয়ে গেল। সবক'টা ঘর আর বারান্দা ঘুরে-ঘুরে দেখল। শোওয়ার ঘরের তিনটে ফটো দেখে খুব স্বাভাবিকভাবেই ও প্রশ্ন করল। আমি খুব সংক্ষেপে বাবা, মা আর লাজবন্তীর পরিচয় দিলাম। ও আরও অনেক প্রশ্ন করছিল, কিন্তু আমি সেগুলো পাশ কাটিয়ে গেলাম। মা আর লাজবন্তীকে কীভাবে হারিয়েছি সে কথা বললাম না।

নিলি লাজবন্তীর ফটোর দিকে অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে রইল। কেন কে জানে! হয়তো ফটোর সঙ্গে নিজের চেহারার কিছু-কিছু মিল ও খুঁজে পেয়েছে।

হঠাৎই দেখি, রত্নাকর দোতলায় উঠে এসেছে।

'তুই ওপরে? এদিকে আমি তোকে নীচে খুঁজছি।'

আমার কপালে বিরক্তির ভাঁজ পড়ল। গলাটাও রুক্ষ হয়ে গেল ঃ 'কেন? খুঁজছিস কেন?'

'আমার...আমার রিসার্চের কয়েকটা পয়েন্ট নিয়ে আলোচনা ছিল। ভ্যাম্পায়ারদের ফ্যামিলি স্ট্রাকচার নিয়ে...।'

লক্ষ করলাম, কথাগুলো বলার সময় রত্নাকর নিলির দিকে দু-তিন পলক তাকাল।

'কাল কথা বলব। এখন দেখছিস তো আমি ব্যস্ত আছি—।' আমি রত্নাকরের চোখে অপলকে তাকিয়ে রইলাম।

ও ধীরে-ধীরে হেঁটে সিঁড়ির দিকে রওনা হল।

নিলি দোতলার ছোট্ট বারান্দাটার সামনে দাঁড়িয়ে ছিল। ওর সামনে স্বচ্ছ প্লাস্টিকের পাঁচিল। সেটা ভেদ করে বাগানের সবুজের উৎসব চোখে পড়ছে। বাতাসে গাছের পাতা নড়ছে।

আকাশে মেঘ থাকলেও সকাল থেকে বৃষ্টি হয়নি। এখন বিকেলের আলো পড়ন্তির দিকে।

আমি নিলির পেছনে একটা পাশ ঘেঁষে দাঁড়িয়েছিলাম। ওর নাক, চোখ, ঠোঁট দেখছিলাম। আর ওর পারফিউমের ঘ্রাণ নিচ্ছিলাম।

আমার লাজবন্তী!

'বাগানটা খুব দারুণ। আমি বাগানটা দেখতে যাব। নিয়ে যাবেন আমাকে?'

আমি হাসলাম ঃ 'তুমি এমনভাবে বলছ যেন আমেরিকা নিয়ে যাওয়ার কথা বলছ!'

'তা হলে চলুন!' গাছের পাতার ঝাঁকের দিকে আঙুল তুলে দেখাল নিলি ঃ 'ওই দেখুন, একটা দোয়েল! দেখতে পাচ্ছেন? চলুন না, চলুন না—।'

'হ্যাঁ—চলো। এমনিতেই আমাদের দোতলা ছেড়ে নেমে যাওয়ার সময় হয়েছে...।'

'তার মানে?' নিলি আমার দিকে ঘুরে তাকাল।

'যখন বিকেল গড়িয়ে সন্ধে হয়ে আসে তখন দোতলায় কাউকে আমি অ্যালাউ করি না—তা সে চেনা-অচেনা যে-ই হোক না কেন।'

'কেন?'

আমি বেশ কিছুক্ষণ ওর দিকে তাকিয়ে রইলাম। মেঘলা বিকেলের নরম আলো ওর বাঁ-গালে এসে পড়েছে। ওর ফরসা গাল সেই আলোর মতোই

নরম লাগছে। ওর মুখে-চোখে কেমন একটা সরল বাচ্চা-বাচ্চা ভাব।

আমি এখন যে-উত্তর দেব তাতে ও কষ্ট পাবে। কিন্তু কোনও উপায় নেই।

'নিলি, সন্ধে হয়ে এলে আমি কাউকে আর বিশ্বাস করতে পারি না। তুমি এটাকে আমার ম্যানিয়া বলতে পারো। কিন্তু ভ্যাম্পায়ারদের হাত থেকে বাঁচার জন্যে এটা একটা জরুরি নিরাপত্তা ব্যবস্থা।'

নিলি অনেকক্ষণ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর ওর আলতো কথা শোনা গেল : 'চলুন, বাগানে যাই...।'

সিঁড়ি নামতে-নামতে আমার বেশ খারাপ লাগছিল। সেই খারাপ লাগা ভাবটা কমাতে নিলিকে বললাম, 'তুমি নিশ্চয়ই এই ম্যানিয়ার কারণটা বুঝবে। মনে আছে, প্রথম আলাপে তুমি আমাকে বলেছিলে, ভ্যাম্পায়ার নিয়ে তুমি মোর অর লেস ডিসটার্বড্...।'

নিলি কোনও জবাব দিল না। ওর গলার রুমালটা একবার নেড়েচেড়ে ঠিক করল শুধু।

'একদিন রত্নাকর দোতলার ড্রয়িংরুমে বসে আমার সঙ্গে কথা বলছিল—কাজের কথা। কথাবার্তার মাঝেই বিকেল পড়ে এল। আকাশের দিকে তাকিয়ে আমি ওকে বলেছি, "নীচে চল।" ও জিগ্যেস করেছিল, "কেন?" আমি বলেছিলাম, "আলো পড়ে আসছে। সন্ধে হতে আর দেরি নেই...।" তারপর আমরা নেমে এসেছিলাম। রত্নাকর আরও বলেছিল...।'

রত্নাকরের কথাগুলো মনে পড়ছিল।

'কিরণ, আমি তোর বন্ধু। আমাকে তুই বিশ্বাস করিস না!' ওর গা থেকে সিগারেটের বিশ্রী গন্ধ বেরোচ্ছিল।

'এ ব্যাপারে আমি মা-বাবা, ভাই-বোন, বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন কাউকে বিশ্বাস করি না।' রত্নাকরের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে তারপর : 'এমনকী তোকেও বিশ্বাস করি না। এতে তুই কিছু মনে করলে করতে পারিস—আমার কিচ্ছু করার নেই...।'

রত্নাকরের মুখের আহত ভাবকে আমি মোটেই পাত্তা দিইনি।

একতলায় এসে বাড়িটাকে পাশ কাটিয়ে আমরা পেছনের বাগানে এলাম।

পশ্চিমের পড়ন্ত আলো গাছপালার পাতায় এসে পড়েছে। আকাশে, বাতাসে বেশ আদরের আভাস। মনে হচ্ছিল না, ভ্যাম্পায়ার নামে কোনও বিচ্ছিরি জিনিস পৃথিবীতে কোথাও আছে।

বাগানের মাটিতে পা ফেলে আমরা হাঁটছিলাম। বিশাল মাপের ছড়ানো বাগান। এখানে-সেখানে বড়-বড় গাছ। দেবদারু, কৃষ্ণচূড়া, আম, কাঁঠাল আর লিচু গাছ। বাগানের পাঁচিল ঘেঁষে সার বেঁধে সুপুরি গাছ। এ ছাড়া আমি চিনি না এমন অনেক গাছও আছে।

এই বাগানটায় বাবার হাতের ছোঁওয়া লেগে আছে। বাবা ফুলগাছের চেয়ে ফলমূলের গাছ বেশি ভালোবাসত, কারণ, বড়-বড় গাছ ছিল বাবার পছন্দ—যেসব গাছ ছায়া দেয়।

এই বাগানটার নিয়মিত যত্ন করার কোনও বালাই নেই। শুধু মাঝে-মধ্যে লোক ডেকে আগাছার ঝাড় পরিষ্কার করাতে হয়।

গতকাল অনেকক্ষণ ধরে বৃষ্টি হয়েছে। তাই বাগানের মাটি ভেজা। সেখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে অসখ্য ঝরাপাতা। সেগুলোর নানারকম রং ঃ কোনওটা সবুজ, কোনওটা হলদে, আবার কোনওটা বাদামি।

হঠাৎই নিলি বলল, 'নাঃ, আপনার একা-একা লাগার কথা নয়...।'

'কেন?' ওর দিকে তাকালাম।

'এত সুন্দর-সুন্দর গাছ আপনাকে ঘিরে রেখেছে, এত পাখি ডাকাডাকি করছে...।'

পাখির ডাক শুনতে পাচ্ছিলাম। আকাশের আলো কমে যেতেই ওরা ওড়াউড়ির কাজ সেরে ঘরে ফিরে এসেছে। ডাল-পাতার আড়ালে বসে নিজেদের মধ্যে কথা বলছে।

গাছের ফাঁকে-ফাঁকে অলসভাবে পা ফেলে ঘুরে বেড়াচ্ছিল নিলি। আমি একটা গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে ওকে দেখছিলাম। ওর বাঁ পায়ের দ্বিতীয় আঙুলে একটা রুপোর বিছে চকচক করছে।

তখনই আমার চোখ গেল বাগানের মাটির দিকে। মাটিটা কেমন ঝুরো-ঝুরো, আলগা। পিঁপড়ের দল মাটি তুললে যেমন দেখায়।

এর কারণটা যখন বোঝার চেষ্টা করছি তখনই নজর পড়ল একটা অদ্ভুত জিনিসের দিকে ঃ নিলির পায়ের কাছ থেকে হাতদুয়েক দূরে ওই ঝুরো মাটি ভেদ করে একটা আঙুল বেরিয়ে আছে।

একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের বাঁ-হাতের বুড়ো আঙুল।

তা হলে কি কেউ আমার বাগানে এসে একটা লাশ কবর দিয়ে গেছে?

লক্ষ করলাম, আকাশের আলো কখন যেন অন্ধকারে সীমানায় এসে দাঁড়িয়েছে। সেই আলোতেই নজরে পড়ল, মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে থাকা বুড়ো

আঙুলটার নখ রুপোলি, আর সামান্য চোখা।

আমার বুকের ভেতরে পাগলাঘণ্টি বেজে উঠল।

ভ্যাম্পায়ার! কাউন্ট ড্রাকুলা ক্লাসের। যারা একটা শিকারকে বারবার ব্যবহার করে। তারপর রয়েসয়ে খতম করে। তখন শিকারের অবস্থা হয় রক্তহীন ছিবড়ে।

এই ধরনের ভ্যাম্পায়ারদের হাতের-পায়ের নখ রুপোলি রঙের হয়। আর নখের ডগাগুলো শিকারি পশুর মতো ছুঁচলো হয়। তা ছাড়া এই ক্লাসের ভ্যাম্পায়ারদের শক্তির কথাও আমি জানি। আর এও জানি, রুপোর ছুরি এদের খতম করার জন্যে মোক্ষম অস্ত্র।

চোখের পলকে ঝুরো মাটির আবরণ সরিয়ে ভ্যাম্পায়ারটা এক ঝটকায় উঠে বসল। ওটার গা বেয়ে মাটির গুঁড়ো ঝরে পড়তে লাগল।

ভ্যাম্পায়ারটার মুখ লম্বাটে। সারা গা ফ্যাকাশে সাদা। চোখ আর ঠোঁট লাল। মাথা ভরতি ঢেউখেলানো ঝাঁকড়া চুল। গায়ে কাদামাটি মাখা একটা ফুলস্লিভ শার্ট, আর গাঢ় ছাই রঙের চকচকে একটা প্যান্ট।

একটা দাঁড়াশ সাপ যেভাবে গাছ বেয়ে ওঠে ঠিক সেভাবে নিলির গা বেয়ে সড়সড় করে উঠে দাঁড়াল ভ্যাম্পায়ারটা। এক ঝাপটায় ছিঁড়ে নিল নিলির গলার রুমাল।

নিলি চোখ বড় করে চিৎকার করতে শুরু করল।

একটা মুহূর্তের মধ্যে সমস্ত ঘটনা ঘটে গেল। আর আমি কোন জাদুমন্ত্রে পাথর হয়ে গিয়ে স্লো-মোশানে সবকিছু দেখতে লাগলাম।

ভ্যাম্পায়ারটা চাপা গলায় হিসহিস করে বলল, 'নিলি, তুমি আমাদের! আর কারও না! শুধু আমাদের!'

তারপর নিলিকে জাপটে ধরে ওর গলার খাঁজে ঠোঁট নামিয়ে নিয়ে এল। ততক্ষণে বিকেল শেষ হয়ে ছাই রঙের অন্ধকার ডানা মেলেছে।

আমি যেন হঠাৎই চেতনা ফিরে পেলাম। আক্রোশের এক ভয়ঙ্কর চিৎকার করে ভ্যাম্পায়ারটার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়লাম। ডানহাতের মুঠোয় ধরা রুপোর স্টিলেটো।

ওটার শরীরে কত জায়গায় যে ছুরিটা বসালাম তার হিসেব নেই।

প্রথমবার ছুরির আঘাত করার সঙ্গে-সঙ্গে ওটার মাথা ছিটকে হেলে গেল পেছনে। পিশাচটার মুখ দিয়ে লালা গড়িয়ে পড়ছিল।

যতবার ছুরিটা ওটার অভিশপ্ত শরীর ভেদ করল ততবারই 'ছ্যাঁক' শব্দে

পুড়ে যাওয়ার শব্দ হল। পিশাচটার শরীর বেঁকেচুরে ছটফট করতে লাগল। ওটা ফ্যাঁসফেঁসে গলায় চাপা আর্তনাদ করতে লাগল। সেই অবস্থাতেই বারবার বলতে লাগল, 'নিলিকে আমরা ছাড়ব না। ও আমাদের! ও আমাদের! ও...।'

ওটার খসখসে চাপা গলা ধীরে-ধীরে আরও বসে গেল। প্রাণীটা নিলির গা থেকে খসে পড়ল বাগানের মাটিতে। ওটার দেহ কুঁকড়ে ক্রমশ ছোট হয়ে যেতে লাগল। তারপর একসময় বাগানের মাটিতে পড়ে রইল শুধু কয়েক মুঠো কালো ছাই।

আমি হাতের ছুরিটার দিকে তাকালাম। কালো রঙের রক্তমাখা। কিন্তু সেই দাগ ধীরে-ধীরে মিলিয়ে যাচ্ছে।

পাখির ঝাঁক যে প্রবল কিচিরমিচির করছে সেটা এতক্ষণ আমার কানে ঢোকেনি। এখন যেন আচমকা শুনতে পেলাম।

আমার অফিসের লোকজন নিলির চিৎকার শুনে ছুটে আসছে। ওদের কারও-কারও হাতে জ্বলন্ত টর্চ। টর্চের আলোর বর্শা আমাদের ওপরে চঞ্চলভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

নিলি এতক্ষণ কাঠের পুতুলের মতো দাঁড়িয়ে ছিল। হঠাৎই জ্ঞান হারিয়ে টলে পড়ে যেতে লাগল।

আমি চট করে ওর পড়ন্ত দেহটা ধরে ফেললাম। ততক্ষণে অভিরূপ, রত্নাকর, সুমিতেশরা টর্চ নিয়ে আমাদের খুব কাছে চলে এসেছে। সেই আলোয় দেখলাম, নিলির গলার পাশে দুটো দাঁতের দাগ। পুরোনো ক্ষতচিহ্ন। রক্তের লেশমাত্র নেই সেখানে।

এই কথা ভেবে ভালো লাগল যে, শয়তান ভ্যাম্পায়ারটা নিলির গলায় কোনও কামড় বসাতে পারেনি।

কিন্তু ওর গলায় পুরোনো কামড়ের দাগটা এল কোথা থেকে? ও তো আমাকে এটার কথা কখনও বলেনি! প্রথম দিনের পরিচয়ে ও শুধু বলেছিল, ভ্যাম্পায়ারে ও ইন্টারেস্টেড। আর ভ্যাম্পায়ার নিয়ে মোর অর লেস ডিস্টার্বড্।

আমার মনে পড়ল, সেই প্রথমদিন থেকেই আমি নিলির গলায় একটা রঙিন স্কার্ফ কিংবা রুমাল জড়ানো দেখেছি।

নিলির অচেতন মুখের দিকে তাকিয়ে এসব কথা ভাবছিলাম। হঠাৎই খেয়াল করে দেখি, রত্নাকর নিজে থেকেই পরিস্থিতির দায়িত্ব নিয়ে ফেলেছে এবং তদারকির হাঁকডাক শুরু করে দিয়েছে।

নিলির গলার ক্ষতচিহ্নে চোখ পড়তেই রত্নাকর থমকে গেল। আমার দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে প্রশ্ন করল, 'এ কী, কিরণ! এটা কীসের দাগ বল তো?'

আমি ওর চোখের দিকে তাকিয়ে বললাম, 'তুই-ই বল্...।'

চার

'আকাশে তখন ফিনিক ছিল না,
তুমি এসেছিলে কাছে—
কিন্নরীর বেশে।
শরীরে তোমার আগল ছিল না,
ছিল শুধু ভালোবাসার গন্ধ,
আমরা দুজন হয়েছিলাম মন্দ।'

রত্নাকরের হাতে সিগারেট, মুখে কবিতা। গাড়ির জানলা দিয়ে ছুটে আসা বাতাসের ঝাপটা চোখের পলকে সিগারেটের ধোঁয়ার রেখাকে ছিন্নভিন্ন করে দিচ্ছিল। ফলে আমার ততটা অস্বস্তি হচ্ছিল না।

রত্নাকর ওর সদ্য লেখা কবিতাটা আমাকে শোনাচ্ছিল যদিও গাড়িতে বসা সকলেই ওর কবিতা শুনতে পাচ্ছিল।

আমরা সবাই মিলে ফিল্ড ট্রিপে চলেছি। আমি, রত্নাকর, নিলি—আমরা তিনজন তো আছিই, তার সঙ্গে রয়েছে বীরেন নাগ, অমিতা নাগ, সনাতন মাইতি আর প্রসেনজিৎ বিশ্বাস।

সনাতন মাইতির বয়েস ষাটের কাছাকাছি। আমাদের সোসাইটির সিনিয়ার মেম্বার। ফিল্ড ট্রিপের ব্যাপারে বরাবরই খুব উৎসাহী। ফিল্ড ট্রিপকে ভদ্রলোক সবসময় 'পিকনিক' বলেন। বেশ মজার মানুষ।

প্রসেনজিতের বয়েস সাতাশ কি আটাশ, কিন্তু কথাবার্তা বারো-চোদ্দোর মতন। রোগা, ফরসা চেহারা। চোখে চশমা। মাথার চুল ছোট করে ছাঁটা।

ভ্যাম্পায়ার নিয়ে প্রসেনজিতের ঊনকোটি প্রশ্ন। সেসব প্রশ্নের কোনও মা-বাপ নেই। ও যে কেন আমাদের সোসাইটির মেম্বার হয়েছে আমি জানি না। তবে সদস্য পদ খারিজ করলে যেহেতু সোসাইটির বদনাম তাই ও এখনও

সোসাইটির মেম্বার হয়ে টিকে আছে। নইলে কবে ওকে ছাঁটাই করে দিতাম! এককথায় প্রসেনজিৎ আমাদের সোসাইটির পশ্চাদ্দেশে এক বিরক্তিকর টিউমার।

একটা টাটা সুমো করে আমরা চলেছি। আজকের ফিল্ড ট্রিপের জন্যে গাড়িটা ভাড়া নিয়েছি। খাবার-দাবার, জলের বোতল সব গাড়িতেই নেওয়া আছে। ফলে রান্নাবান্নার কোনও ঝঞ্ঝাট-ঝামেলা নেই।

আমাদের গন্তব্য পুনিপুকুর নামে একটা গ্রাম। কলকাতা থেকে ডায়মন্ডহারবার যাওয়ার পথে প্রায় চল্লিশ কিলোমিটার দূরে গ্রামটা পড়ে। ওখানে ভ্যাম্পায়ারের আস্তানা আছে কি না জানি না, তবে একুশ দিন আগে ওই গ্রামের আশেপাশে একজন মাঝবয়েসি লোকের ডেডবডি পাওয়া গিয়েছিল। সেই ডেডবডিটার গলায় দাঁতের দাগ ছিল, এবং শরীরে কোনও রক্ত ছিল না।

পুলিশ ব্যাপারটাকে মার্ডার বলতে পারেনি। লোকাল থানার রিপোর্টে 'কিল্‌ড বাই অ্যানিম্যাল' লিখে ফাইল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এসব ব্যাপার আমি পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করে জেনেছি।

রত্নাকরের কবিতা শেষ হওয়ার পর ও আমাকে জিগ্যেস করল, 'কিরণ, কেমন লাগল?'

'দেখ, কবিতা-টবিতা আমি খুব একটা বুঝি না। তবে শেষটা তো ভালোই লাগল।'

হাতের সিগারেটের টুকরোটা জানলা দিয়ে বাইরের বাতাসে ভাসিয়ে দিয়ে ও বলল, 'আমি জানতাম, শেষটা তোর ভালো লাগবে।'

আমি কোনও জবাব দিলাম না।

প্রসেনজিৎ হঠাৎ জিগ্যেস করল, 'আচ্ছা, রত্নাকরবাবু, ফিনিক মানে কি রক্তের ফিনকি?'

রত্নাকর একটু গম্ভীরভাবে বলল, 'না—আলো।'

'আর লাস্টের দিকে ওই যে বললেন, "শরীরে তোমার আগল ছিল না—", ওই আগলের সঙ্গে কি পাগলের কোনও রিলেশান আছে?'

চোখের কোণ দিয়ে লক্ষ করলাম, নিলি আর সনাতন মাইতি প্রসেনজিতের প্রশ্নের ধরন শুনে মিটিমিটি হাসছেন।

তাই দেখে আমি জবাব দিলাম, 'হ্যাঁ, ভালোরকম রিলেশান আছে। আগল ছিল না মানে শরীরটা পাগল-পাগল লাগছিল...।'

এ-কথায় নিলি আর সনাতন মাইতি জোরে হেসে ফেললেন। বীরেন আর অমিতা সৌজন্য বজায় রেখে চাপা হাসি হাসছিলেন।

রত্নাকর আমার দিকে ব্যাজার মুখে তাকিয়ে বলল, 'আমাকে কবিতা লেখাটা ছাড়তে হবে—।'

প্রসেনজিৎ এ-কথা শুনে উৎসাহিত হয়ে বলল, 'কবিতা তোমায় দিলাম আজকে ছুটি...।' তারপর জোরে-জোরে হেসে উঠল।

আমি একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম। আজ অন্তত একটা দিন রত্নাকর কবিতাকে ছুটি দিক। কারণ, রত্নাকরের কবিতার ওই আঠালো ব্যাপারগুলো আমার ভালো লাগে না। ওগুলোর মধ্যে আমি চাপা ইশারার গন্ধ পাই। যেমন এই কবিতাটায়।

ঘণ্টাদেড়েকের মধ্যে আমরা পুনিপুকুর পৌঁছে গেলাম। বেলা তখন বারোটার কাছাকাছি। আস্তানা হিসেবে মার্ডার স্পটের কাছাকাছি একটা লোকাল বাড়ির বন্দোবস্ত করা হয়েছিল। একতলা বাড়ি। টালির চাল। সেখানেই আমরা সামান্য তল্পিতল্পা নিয়ে উঠলাম।

অল্পস্বল্প গোছগাছ সেরে নিয়ে আমরা মার্ডার স্পটটা দেখতে রওনা হলাম। রত্নাকর ওর প্যাড-পেন আর ল্যাপটপ বগলদাবা করে নিল।

সবাইকে বললাম যে, ঘটনার একুশ দিন পর আমরা এখানে পুলিশি সূত্র খুঁজতে আসিনি। আমরা এসেছি ভ্যাম্পায়ারের অ্যাটাকের সিচুয়েশানটাকে অনুভব করতে। পরিবেশটা নিজের চোখে দেখতে। আর যদি কোনও চিহ্ন পাওয়া যায়, তো সেটাকে নোট করতে, রেকর্ড করতে।

খুনের জায়গাটা ঝোপঝাড় আর আগাছার মধ্যে। যে-লোকটি মারা গেছে সে হয়তো এখানে বাথরুম-টাথরুম কিছু একটা করতে এসেছিল। সেই সময়ে তেষ্টায় পাগল ভ্যাম্পায়ারটা হয়তো ওকে অ্যাটাক করে।

সবাই নিজেদের মধ্যে ভ্যাম্পায়ার নিয়ে নানান কথাবার্তা বলছিল। আগাছা ভেদ করে এদিক-ওদিক ঘোরাফেরা করছিল।

প্রসেনজিৎ দেখলাম কোথা থেকে একটা গাছের ডাল কুড়িয়ে নিয়েছে। সেটা দিয়ে মাঝে-মাঝেই আগাছার জঙ্গলে খোঁচাখুচি করছে আর বলছে, 'এখানে নির্ঘাত সাপ-খোপ আছে। কেয়ার ফুল না হলে পট করে দাঁত বসিয়ে দেবে।'

রত্নাকর ল্যাপটপ চালু করে অবজারভেশানের নানান ডেটা বোতাম টিপে কম্পিউটারে ঢোকাচ্ছিল। একইসঙ্গে একটা বড় বটগাছের গুঁড়িতে খুব খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে ভ্যাম্পায়ারের কোনও চিহ্ন খুঁজছিল। কিন্তু একুশ দিন আগে রেখে যাওয়া কোনও চিহ্ন কি আজ আর খুঁজে পাওয়া যাবে?

প্রসেনজিৎ হঠাৎই রত্নাকরের পিঠে টোকা মেরে বলল, 'মিস্টার চৌধুরী, আমার মনে একটা কোশ্চেন জেগেছে—।'

দেখলাম, নাগদম্পতি আর সনাতন মাইতি একটু আতঙ্কের চোখে প্রসেনজিতের দিকে তাকালেন।

নিলি আমার পাশেই ছিল। আমার কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে চাপা গলায় বলল, 'সেরেছে!'

রত্নাকর প্রসেনজিতের দিকে ফিরে তাকিয়েছিল। প্রসেনজিৎ আর দেরি না করে ওর প্রশ্ন ফায়ার করল : 'আচ্ছা ভ্যাম্পায়ারকে সাপে কাটলে কী হবে?'

রত্নাকর গম্ভীর গলায় বলল, 'ভ্যাম্পায়ারটা প্রথমে পাগল হয়ে যাবে—তারপর মরে যাবে...।'

প্রসেনজিৎ মেয়েলি ঢঙে হাত নেড়ে বলল, 'যাঃ! তাই?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

নিলি আমার হাত খামচে ধরে খিলখিল করে হেসে উঠল। আমি মন-প্রাণ দিয়ে নিলিকে অনুভব করছিলাম।

নিলি হঠাৎ আমাকে জিগ্যেস করল, 'আচ্ছা, একুশ দিন পরে কী ভ্যাম্পায়ারের কোনও চিহ্ন পাওয়া পসিব্‌ল?'

'ভিকটিমের গায়ে পাওয়া যাবে। গলায় দাঁতের দাগ থাকবে...।' ওর দিকে কয়েক পলক তাকিয়ে থেকে বললাম, 'যেমন, তোমার গলায় আছে...।'

নিলির বাঁ-হাত চলে গেল ওর গলায়। ওর রঙিন স্কার্ফে। কেমন এক ব্যথাতুর চোখে ও আমার দিকে চেয়ে রইল। কোনও উত্তর দিল না।

ওর চোখ দুটো মেঘলা আকাশের মতো মনে হল।

আমি ওকে আঘাত দিতে চাইনি। শুধু ওর দাঁতের দাগের ইতিহাসটা জানতে চাইছিলাম। আমি চাইছিলাম, ও নিজে থেকে গল্পটা আমাকে বলুক।

একটু চুপ করে থেকে ওকে বললাম, 'ভ্যাম্পায়ারের আর-একটা চিহ্ন পাওয়ারও পসিবিলিটি আছে। সেটা আমি জানি—রত্নাকর জানে না। আমি একটু নজর চালিয়ে দেখি।'

আমি খুঁজতে শুরু করলাম।

আগাছার ডালপালা সরিয়ে, গাছের গুঁড়ির চারপাশ ঘুরে-ঘুরে, অনুসন্ধান চালালাম।

আকাশ মেঘলা, তবে বৃষ্টি নেই। গাছের সবুজ পাতা জলে ধুয়ে চকচক করছে। পিছনে তাকিয়ে দেখি আমাদের দলের বাকি সবাই এদিক-ওদিক ঘুরে

বেড়াচ্ছে। সনাতন মাইতি প্রসেনজিৎকে সঙ্গে নিয়ে হাঁকডাক ছেড়ে খাওয়াদাওয়ার আয়োজন শুরু করছেন।

হঠাৎই আমি চিহ্নটা খুঁজে পেলাম।

সবুজ রঙের। চকচক করছে। আর-একটু হলেই ওটা আগাছার সবুজ পাতার আড়ালে হারিয়ে গিয়েছিল।

ভ্যাম্পায়াররা যখন শিকার ধরে তখন ওদের মুখ থেকে একরকম লালা বেরোয়। শিকার ধরার আগে এই লালা বেরোনোর ব্যাপারটা শুরু হয়। তারপর, শিকার ধরার পরেও, এই ব্যাপারটা চলতে থাকে।

সবুজ রঙের এই লালা মোটামুটিভাবে চব্বিশ ঘণ্টা পরই জমাট বেঁধে শক্ত ক্রিস্ট্যালের মতো হয়ে যায়। একটু দূর থেকে দেখলে এই স্বচ্ছ ক্রিস্ট্যালকে পান্না বলে ভুল হয়।

একটা গাছের ভেজা গুঁড়ির গায়ে আমি কয়েকটা সবুজ টুকরো দেখতে পেলাম। তাড়াতাড়ি রত্নাকরকে ডেকে ওগুলোর ফটো তুলতে বললাম। আরও বললাম, ছবি তোলা হয়ে গেলে রত্নাকর যেন দানাগুলো পলিথিন পাউচে কালেক্ট করে নেয়।

রত্নাকর সঙ্গে-সঙ্গে ওর ডিজিটাল ক্যামেরা নিয়ে কাজে নেমে পড়ল।

আমি সবাইকে সবুজ লালার ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলতে লাগলাম। আমার কথা শোনার পর বীরেন নাগ বললেন, 'আমার রাজুনের ডেডবডির কাছেও এইরকম কয়েকটা চকচকে সবুজ দানা পড়ে ছিল। ওগুলো যে ঠিক কী সেটা পুলিশ বুঝতে পারেনি...।'

মোটামুটিভাবে ভ্যাম্পায়ার নিয়ে আলোচনা করেই আমাদের সময় কাটছিল। তার মধ্যে সনাতন মাইতি নানারকম মজার-মজার কথা বলছিলেন। যেমন, খাওয়াদাওয়া যখন চলছে তখন তিনি হঠাৎ বললেন, 'প্রফেসর মিত্র, এই জায়গাটা পিকনিক স্পট হিসেবে কিন্তু দারুণ।'

আমি ওঁর কথায় সায় দিতে না দিতেই নিলি আর প্রসেনজিৎ বিশ্বাস প্রায় একইসঙ্গে বলে উঠল, 'সত্যি, দারুণ! ফ্যানট্যাস্টিক স্পট।'

সনাতন মাইতি মাথা নেড়ে বললেন, 'ঠিক বলেছেন। এবারে বলুন তো, ভ্যাম্পায়াররা পিকনিক করতে গেলে ওদের ফেভারিট পিকনিক স্পট কোনটা হতে পারে—?'

আমরা উত্তরের খোঁজে মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগলাম।

কিছুক্ষণ পর মিস্টার মাইতিকে জানালাম যে, উত্তরটা আমরা ভেবে পাচ্ছি

না। তিনি যেন সেটা আমাদের বলে দেন।

সনাতন শূন্যে চোখ ঘুরিয়ে মজার মুখ করে বললেন, 'ভ্যাম্পায়ারদের হট ফেভারিট পিকনিক স্পট হল ব্লাড ব্যাঙ্কের পাশের মাঠ—।'

এ-কথায় হাসির ফোয়ারা ছুটল।

খাওয়াদাওয়ার পর আমরা এদিক-ওদিক ছড়িয়ে গেলাম। মাঠের একদিকে বেশ কয়েকটা নারকোল গাছ ছিল। আমি আর নিলি পায়ে-পায়ে সেদিকে হাঁটা দিলাম।

দূরে বড় রাস্তা চোখে পড়ছে। মাঝে-মাঝে গাড়ি, বাস, লরি ছুটে যাচ্ছে। আকাশ এখন মোলায়েম মেঘে ঢাকা। কয়েকটা পাখি এদিক-ওদিক উড়ে যাচ্ছে। গাছগাছালির আড়াল থেকে পাখির মিষ্টি ডাক শোনা যাচ্ছিল। আমি আর নিলি চুপচাপ পা ফেলছিলাম। মনে হচ্ছিল, আমাদের অনেক কথা বলার আছে, কিন্তু কী এক অজানা কারণে কিছুই বলছি না।

'কিরণ!' রত্নাকর আমাকে পেছন থেকে ডাকল।

আমি জানতাম ও ডাকবেই। নিলিকে আমার সঙ্গে অন্যদিকে হেঁটে যেতে দেখেছে যে!

আমি পেছন ফিরে তাকালাম। রত্নাকর আমার কাছ থেকে বেশ কিছুটা দূরে। তবুও ওর মুখে অপছন্দের হাবভাব পড়ে নিতে আমার কোনও অসুবিধে হল না।

'কী হল? ডাকছিস কেন?' বুঝতে পারছিলাম, আমার ভুরুতে ভাঁজ পড়ে গেছে।

'যেসব ডেটা কালেক্ট করেছি সেগুলো তোকে একবার দেখাব—।'

'কাল অফিসে গিয়ে দেখব। এখন আমি নিলির সঙ্গে ঘণ্টাদুয়েক ব্যস্ত থাকব। তুই বাকিদের খেয়াল রাখ...।' বলে আমি আবার হাঁটতে শুরু করলাম।

নিলি বলল, 'মিস্টার চৌধুরী আপনার ওপরে বড্ড বেশি ডিপেন্ডেন্ট।'

'হুঁ, সবসময় চিপ্‌কে থাকতে চায়। ডিসগাস্টিং।'

নারকোল গাছগুলোর কাছে গিয়ে আমরা দাঁড়ালাম।

নিলি আমার দিকে তাকিয়ে ছিল, আর আমি তাকিয়ে ছিলাম ওর গলায় বাঁধা রঙিন স্কার্ফের দিকে।

সেখান থেকে চোখ সরিয়ে আমি ওর চোখে তাকালাম। বললাম, 'তোমাকে একটা পারসোনাল কথা জিগ্যেস করতে পারি?'

অন্যসময় হলে নিলি খোলাখুলি হেসে উঠত—হয়তো মজা করে পালটা প্রশ্ন ছুড়ে দিত। কিন্তু এখন সেরকম কিছু করল না। ও বোধহয় বুঝতে পারল আমি কী প্রশ্ন করতে চাই। তাই ছোট্ট করে বলল, 'হ্যাঁ—করুন।'

'তোমার গলায় দাঁতের দাগ কীভাবে এল?'

ও উদাসভাবে দূরের রাস্তার দিকে তাকাল। তারপর আকাশের দিকে কিছুক্ষণ। সবশেষে আমার চোখের দিকে।

আমি সেখানে ব্যথার বাষ্প দেখতে পেলাম। তাই বললাম, 'তোমার কষ্ট হলে থাক। কিছু বলতে হবে না...।'

ও আলতো করে বলল, 'না—বলব। কষ্ট কমানোর জন্যেই তো আপনার লেকচার শুনতে গিয়েছিলাম। তারপর...আপনাদের সোসাইটির মেম্বার হয়েছি। অনেক ভেবে দেখেছি—এটাই একমাত্র পথ...দ্য ওনলি ওয়ে...।'

নিলি বলতে শুরু করল। আমি ওর চোখের দিকে সম্মোহিতের মতো তাকিয়ে রইলাম।

যে-ছেলেটিকে ও পাগলের মতো ভালোবাসত তার নাম সুতীর্থ। স্লিম, লম্বা, পেটানো চেহারা। মাথায় কোঁকড়া চুল, চোখে রিমলেস চশমা। ঠোঁটে সবসময় হিন্দি গানের কলি, কানে মোবাইলের ইয়ার প্লাগ গোঁজা। ইলেকট্রনিক্সে এম. এসসি. ছিল সুতীর্থ। একটা নামি সফ্‌টওয়্যার কোম্পানিতে চাকরি করত।

পুজোর পরেই ওদের বিয়ে হবে এমনটাই ঠিকঠাক ছিল। কিন্তু মাসচারেক আগে একদিন একটা সাংঘাতিক দুর্ঘটনা ঘটল।

অফিসে ছুটি পাওয়ার কোনওরকম স্কোপ থাকলেই সুতীর্থ নিলিকে ডেকে নিত। তারপর দুজনে মিলে কলকাতার নানান জায়গায় ঘোরাঘুরি করে প্রেম করত।

ওরা আপনমনে বকবক করত। সেটা কী করে যেন বকবকম হয়ে যেত। ভালোবাসার খই ফুটত কথায়-কথায়।

আর ছোঁওয়া-ছুঁয়ি? সেটাও ছিল—তবে দু-হাতের দশ আঙুল, কিংবা বড়জোর আঙুল ছাড়িয়ে কবজি। ব্যস, ওই পর্যন্ত! কারণ, ওরা ঠিক করেছিল আপাদমস্তক ছোঁওয়া-ছুঁয়ির জন্যে বিয়ে পর্যন্ত অপেক্ষা করাটা দারুণ থ্রিলিং।

এইরকম একটা বকবকম প্রেমের বিকেলে ওরা আউটরাম ঘাটের কাঠের বেঞ্চিতে বসে ছিল।

সেদিনটা ছিল ঘ্যানঘেনে বৃষ্টির দিন। সকাল থেকে টিপটিপ করে বৃষ্টি। নিম্নচাপ না ঊর্ধ্বচাপ—কী একটা ছিল যেন। আকাশে গাঢ় ছাইরঙা মেঘ—তার জায়গায়-জায়গায় থমকে দাঁড়িয়ে থাকা জলভরা সাদা মেঘের স্তূপ।

আউটরাম ঘাটের কাঠের বেঞ্চি ভেজা ছিল। মাথায় ছেয়ে থাকা গাছের পাতা থেকে টপটপ করে জলের ফোঁটা পড়ছিল। ভেজা পাতার আড়াল থেকে পাখি ডাকছিল। সামনের বৃষ্টিভেজা ঘোলাটে গঙ্গায় ভোঁ বাজিয়ে স্টিমার ভেসে যাচ্ছিল।

সবমিলিয়ে বিকেলটা ওদের সুন্দর লাগছিল।

ওদের বেঞ্চির পেছনে ছিল উঁচু লোহার রেলিং। রেলিং ঘেঁষে আগাছার ঝোপঝাড়, আর তারই মাঝে কয়েকটা বড়-বড় গাছ।

আগাছার জঙ্গলের পরই ছিল চক্ররেলের লাইন।

'...সেই লাইন দিয়ে কখনও-কখনও ট্রেন ছুটে যাচ্ছিল। আমরা ঘাড় ঘুরিয়ে পিঠ ঘেঁষে ছুটে যাওয়া ট্রেন দেখছিলাম।

'সত্যি, খুব রোম্যান্টিক ছিল সেই মেঘলা বিকেলটা।

'আমাদের সঙ্গে ছাতা ছিল, কিন্তু কী যে পাগলামি কাজ করছিল আমাদের মধ্যে! কখনও ছাতা মাথায় দিচ্ছিলাম, কখনও দিচ্ছিলাম না। কথা বলতে-বলতে আমরা কল্পনায় বিয়ে পার করে সংসারের গল্পে ঢুকে পড়েছিলাম। আর তাই নিয়ে দুজনে খুনসুটি করছিলাম।

'এমন উদ্দাম আর চঞ্চলভাবে সময় কাটছিল যে, কখন সন্ধে নেমে গেছে খেয়ালই করিনি।

'পেছনের লাইন দিয়ে একটা ট্রেন যাচ্ছিল। আমরা ঘাড় ঘুরিয়ে ট্রেনটাকে দেখছিলাম। ট্রেনের কামরার আলো টিমটিম করে জ্বলছে। ফাঁকা ট্রেন, তবুও দরজার মুখে দু-তিনজন করে লোক দাঁড়িয়ে। লাইনে ট্রেনের চাকা গড়ানোর ঘটঘট শব্দ উঠছিল। সেই শব্দ ছাড়া চারপাশে আর কোনও শব্দ ছিল না।

'ট্রেন চলে যাওার পর আমি মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলাম, কিন্তু সুতীর্থ তখনও ওদিকে তাকিয়ে কী যেন দেখার চেষ্টা করছিল। তারপর...।'

সুতীর্থ হঠাৎই একটা অদ্ভুত জিনিস দেখতে পেল।

পেছনের রেলিঙের ওপাশে রেলিঙের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে রয়েছে কালো জমাট অন্ধকার দিয়ে তৈরি একটা ছায়ামূর্তি। তার সেই অন্ধকার স্তম্ভের মতো দাঁড়িয়ে থাকা শরীরের ওপরে বসানো একটা ফ্যাকাশে সাদা মুখ—মূকাভিনয় যারা করে অনেকটা তাদের পেইন্ট করা মুখের মতো। হঠাৎ করে দেখলে মনে হয় যেন মুখটা অন্ধকারের মধ্যে শূন্যে ভেসে আছে।

নিলির গায়ে ছোট্ট খোঁচা মেরেই সুতীর্থ বেঞ্চি ছেড়ে উঠে গেল রেলিঙের কাছে।

নিলিদের কাছাকাছি সেরকম লোকজন ছিল না। ডানদিকে, খানিকটা দূরে, একটা চা-বিস্কুটের স্টল, আর তার কাছ থেকে আরও কিছুটা তফাতে একটা সিগারেট আর চিপ্‌সের স্টল। কিন্তু দুটো স্টলই ফাঁকা। এই নাছোড়বান্দা বৃষ্টির জন্যে কোনও খদ্দেরপাতি ছিল না।

সুতীর্থ খোঁচা মারতেই নিলি পেছনে তাকিয়েছিল। অন্ধকারে ভেসে থাকা মুখটা ও পলকের জন্যে দেখতে পেয়েছিল। তারপরই সুতীর্থর শরীরে মুখটা কিছুক্ষণের জন্যে আড়াল হয়ে গিয়েছিল।

এরপর যা ঘটে গেল তার জন্যে নিলি মোটেই তৈরি ছিল না।

যেমন করে দু-বগলের খাঁজে হাত দিয়ে ছোট বাচ্চাকে লোকে শূন্যে তুলে নেয়, ঠিক সেইভাবে সুতীর্থর লম্বা শক্তপোক্ত শরীরটাকে শূন্যে তুলে নিল ওই কালো ছায়াটা। অনায়াস সাবলীল ছন্দে ওকে রেলিঙের ওপর দিয়ে নিয়ে গেল ওপারে। তারপর এক ঝাপটায় যেন অন্ধকারের বিশাল ডানা মেলে ওকে জড়িয়ে নিল।

কিন্তু সেই অল্প সময়ের মধ্যেই নিলি লক্ষ করেছিল, কালো ছায়াটার আঙুলের নখগুলো রুপোলি।

সুতীর্থ একটা হাত শূন্যে তুলেছিল। হাতের পাঁচটা আঙুল প্রতিবাদে ছড়ানো। কিন্তু ওই পর্যন্তই। তারপর ওর গোটা শরীরটা গাঢ় আঁধারে ঢেকে গিয়েছিল।

আমি চিৎকার করে উঠেছিলাম। আমার চিৎকারে দুজন দোকানদার ছুটে এসেছিল। কোথা থেকে এসে হাজির হয়েছিল দুজন টহলদার পুলিশ। আমার কান্নাকাটিতে ওদের তিনজন রেলিং ডিঙিয়ে রেললাইনের দিকে নেমে পড়েছিল। ঝোপঝাড়ের মধ্যে, রেললাইনের ওপারে, অনেক খোঁজাখুঁজি করেছিল। কিন্তু সুতীর্থকে কোথাও পাওয়া যায়নি।

'পুলিশ ব্যাপারটা নিয়ে অনেক দূর পর্যন্ত চেষ্টা করেছিল, কিন্তু সুতীর্থকে, কিংবা ওর ডেডবডি—কিছুই আর পাওয়া যায়নি।

'সুতীর্থ যেন সেই রাতে বাতাসে মিলিয়ে গিয়েছিল।

'কিন্তু কেন পাওয়া যায়নি সেটা বুঝেছিলাম মাসখানেক পর।

'সুতীর্থকে হারানোর পর থেকে আমি ভ্যাম্পায়ার নিয়ে পড়াশোনা করতে শুরু করি। আমি বেশ বুঝতে পেরেছিলাম, ওকে নিয়ে স্বপ্ন দেখার ব্যাপারটা পুরোপুরি শেষ হয়ে গেছে।'

নিলির চোখের ওপরে জলের স্তর তৈরি হয়ে গিয়েছিল। এই বুঝি চোখের

জলের ফোঁটা গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ল! কিন্তু জল মুছে নেওয়ার কোনও চেষ্টাই করল না। শুধু শূন্যচোখে দূরের রাস্তার দিকে তাকিয়ে রইল।

আমি চুপ করে রইলাম। মেয়েটাকে কী সান্ত্বনা দেব! এইজন্যেই ও বলেছিল, ভ্যাম্পায়ারে ও ইন্টারেস্টেড এবং ভ্যাম্পায়ারের জন্যে ও ডিস্টার্বড়।

আমি ওকে দেখছিলাম। মেঘলা আকাশের ঘষা আলো ওর মুখ ঘিরে এক মায়া তৈরি করেছে। দেখে মনে হচ্ছিল, নিলি দু-চোখ মেলে ঘুমিয়ে আছে। আকাশের মেঘের মতো।

ওই রুপোলি নখের ব্যাপারটা শুনেই আমি বুঝতে পেরেছিলাম, সুতীর্থ ড্রাকুলা ভ্যাম্পায়ারের খপ্পরে পড়েছে। এরা কাউকে অ্যাটাক করলে সে মরে না—ড্রাকুলা ভ্যাম্পায়ার হয়ে যায়। তারপর রক্তের তেষ্টা পেলে পাগলের মতো শিকার খুঁজে বেড়ায়। অনেক সময় এরা ইচ্ছে করে কোনও শিকারকে একবারে শেষ করে না—তিলে-তিলে শেষ করে। আর কোনও শিকার যদি কখনও এদের হাত থেকে ফসকে যায়, তা হলে এরা ঘুরে-ফিরে বারবার সেই শিকারের কাছে আসে—মরণ কামড় দেওয়ার সুযোগ খোঁজে। মানুষখেকো বাঘ যেভাবে বারবার তার মড়ির কাছে ফিরে আসে।

আমি নিলির কাহিনিটা এবার যেন আঁচ করতে পারছিলাম।

ড্রাকুলা ভ্যাম্পায়ারের আক্রমণে সুতীর্থর উধাও হওয়া। নিলির গলায় দাঁতের দাগ। আমার বাড়ির বাগানে লুকিয়ে ওত পেতে থাকা ড্রাকুলা ভ্যাম্পায়ার। তা হলে কি তা হলে কি..?

'আমার গলায় দাঁতের দাগ কীভাবে এল সে-কথা এখনও বলিনি।' ধরা গলায় বলল মেয়েটা, '...এবার বলছি...শুনুন। তা হলে বুঝতে পারবেন, কেন আমি আপনার সেমিনার শুনতে গিয়েছিলাম, কেনই-বা আপনার সোসাইটির মেম্বার হয়েছি—।

'সুতীর্থকে হারানোর পর প্রায় একটা মাস আমি শোকে-দুঃখে উথালপাথাল হয়ে গিয়েছিলাম। রোজই ভাবতাম, সুতীর্থ আমার কাছে ফিরে আসবে। ওর ফটোর দিকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাকিয়ে বসে থাকতাম। ওর মোবাইল ফোনে ফোন করতাম বারবার। কিন্তু ফোন বেজেই যেত—কেউ সে-ফোন ধরত না। তারপর একদিন...।'

একদিন সন্ধেবেলা সুতীর্থর ফোনে ফোন করেছিল নিলি। এবং ফোনটা ধরে ও-প্রান্ত থেকে সুতীর্থ জবাব দিয়েছিল।

নিলি বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গিয়েছিল। কিছুক্ষণ কোনও কথা বলতে

পারেনি ও।

সুতীর্থ! সুতীর্থ! ওর সুতীর্থ বেঁচে আছে!

আনন্দ আর খুশিতে নিলির চোখে জল এসে গিয়েছিল। ও কান্না-চাপা গলায় বারবার সুতীর্থর নাম ধরে ডেকে উঠেছিল।

লাজবন্তীর কথা মনে পড়ে গেল আমার। যেন আমার জীবনকাহিনি নিলির মুখ থেকে শুনছি।

বৃষ্টি-ভেজা সন্ধ্যায় সুতীর্থকে হারিয়ে নিলি একবার পাগল হয়েছিল, ফোনে সুতীর্থর গলা শুনে ও দ্বিতীয়বার পাগল হল।

সেই একইরকম পুরোনো কণ্ঠস্বর। সেই একইরকম গাঢ়, নেশা ধরানো।

'নিলি, আমি হারিয়ে যাইনি।' শব্দগুলো ধরে-ধরে উচ্চারণ করেছিল সুতীর্থ ঃ 'তোমার সঙ্গে দেখা করার তেষ্টায় বুক ফেটে যাচ্ছে...। তুমি আমার সঙ্গে দেখা করতে এসো...প্লিজ...।'

'কোথায়? কোথায়?' আকুল গলায় জানতে চেয়েছিল নিলি। কলকাতার বহু জায়গার সঙ্গে ওদের ভালোবাসাবাসির মাধুরী মিশে আছে।

কার্জন পার্কের কাছে ওকে ডেকেছিল সুতীর্থ। সন্ধের পর। সাতটায়। বলেছিল, নিলি যে সুতীর্থর সঙ্গে দেখা করতে আসছে সে-কথা যেন কাউকে না বলে।

না, কাউকে বলেনি নিলি। সুতীর্থর সঙ্গে দেখা করতে ও একাই এসেছিল। ঠিক সাতটায়।

কার্জন পার্কের কাছে আসার পর ওর মোবাইলে ফোন এসেছিল।

সুতীর্থ।

ফোনে ওকে ইনস্ট্রাকশন দিচ্ছিল। কোনদিকের রাস্তা ধরে পার্কের ভেতরে ঢুকতে হবে। তারপর পায়ে-পায়ে পথ চলে ঠিক কোন জায়গাটায় আসতে হবে।

জায়গাটা আলোছায়াময়। একটু দূরের বিল্ডিং থেকে বিজ্ঞাপনের লাল আর সবুজ আলো ছিটকে আসছিল। নাকে আসছিল ভেজা গাছপালার স্যাঁতসেঁতে গন্ধ।

হঠাৎই কানের খুব কাছে সুতীর্থর গলা পেয়েছিল নিলি। এতই কাছে যে, ওর আচমকা মনে হয়েছিল, সুতীর্থ ওর সঙ্গে বুঝি ফোনে কথা বলছে।

কিন্তু না। সুতীর্থ কথা বলেছে নিলির ঠিক পেছনে দাঁড়িয়ে—ওর কানের কাছে মুখ এনে।

চমকে ঘুরে দাঁড়িয়েছিল নিলি। আর তক্ষুনি ওর গলায় শ্বদন্ত বসিয়ে দিয়েছে ওর ভালোবাসার মানুষ।

সেই দংশনে নেশা করা মাতালের মতো বুঁদ হয়ে গিয়েছিল নিলি। ওর চোখ বুজে গিয়েছিল কী এক আবেশে। মাথা ঝিমঝিম করছিল।

এক সময় সুতীর্থ মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল। গাঢ় চোখ তাকিয়েছিল নিলির চোখে।

নিলি যেন সম্মোহিত হয়ে গিয়েছিল। মনে হচ্ছিল, এখুনি ও টলে পড়ে যাবে। কিন্তু ও যে পড়ে যায়নি তার কারণ, সুতীর্থ শক্ত হাতে ওর দু-কাঁধ আঁকড়ে ধরে ছিল।

আচ্ছন্ন চোখে সুতীর্থকে দেখছিল নিলি।

কিন্তু এ কোন সুতীর্থ!

ফ্যাকাশে সাদা মুখ। টুকটুকে লাল ঠোঁট। কালো দুটো চোখের তারায় লাল আলোর বিন্দু। ওর শরীর থেকে হালকা পারফিউমের গন্ধ ভেসে আসছে।

আর সুতীর্থর পেছনে ওর গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে ওরা কারা?

দেখতে সুতীর্থরই মতো। ঠিক যেন ওর দুই যমজ ভাই। একইরকম ফ্যাকাশে রক্তহীন মুখ। ঠোঁট লাল। লোভাতুর চোখে তাকিয়ে আছে নিলির দিকে। অপেক্ষা করছে, যেন সুতীর্থর পরেই ওদের তেষ্টা মেটানোর পালা। গ্যাং রেপের বেলায় যেমনটা হয়।

এমনসময় খুব কাছেই ট্রামের ঘণ্টি বেজে উঠল।

চমকে উঠল নিলি। ওর সম্মোহনের ঘোর কেটে গেল পলকে।

ও চিৎকার করে উঠল। তখনই দেখতে পেল সুতীর্থর হাতের নখ। রুপোলি। ছুঁচলো।

নিলি আতঙ্কে পাগল হয়ে গেল। ও চিৎকারের পর চিৎকার করে চলল। রাতের অন্ধকারে সেই তীক্ষ্ণ চিৎকার ধারালো ছুরির মতো কেটে বসতে লাগল বারবার।

সুতীর্থরা তিনজন চট করে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। তার আগে সুতীর্থ ফিসফিস করে বলে গিয়েছিল, 'আবার আসব। আবার দেখা হবে। তুমি এখন আমাদের...আমাদের...আমাদের...।'

কথা বলতে-বলতে একটা নারকোল গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়েছিল নিলি। এখন ওর মুখটা হঠাৎ ঘুরিয়ে কনুইয়ের খাঁজে গুঁজে দিল।

আমি বুঝতে পারছিলাম, ও ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদছে। তাই ওকে সময় দিতে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। ওর কথা ভাবতে লাগলাম। ওর যন্ত্রণা আমার প্রায় কাছাকাছি।

কিছুক্ষণ পর মুখ তুলে তাকাল নিলি। বলল, 'তারপর থেকে আমার গলায় এই দাঁতের দাগ। ডাক্তার, ওষুধপত্র, অনেক করেছি, কিন্তু দাগ দুটো যায়নি। তাই গলায় সবসময় স্কার্ফ জড়িয়ে রাখি। আর...আর...।'

'আর কী?'

'সুতীর্থরা আরও দুবার আমাকে অ্যাটাক করার চেষ্টা করেছে। সেদিন তো আপনার বাড়ির বাগানে, আপনার সামনে। প্রথম অ্যাটাকে আমি চিৎকার চেঁচামেচি করে ছুটে পালাতে পেরেছিলাম। আর সেকেন্ডবার তো আপনি আমাকে সেভ করলেন...।'

হাতের পিঠ দিয়ে চোখের জল মুছে নিল নিলি। তারপর ধরা গলায় বলল, 'প্রফেসর মিত্র, এই হল আমার গলার দাঁতের দাগের মিস্ট্রি। এখন... বলুন কী বলবেন...।'

আমি নরম গলায় বললাম, 'তোমাকে লাজবন্তীর কথা বলব। শুনবে?'

'শুনব—।' নাক টানল নিলি। একবার কাশল।

'সেদিন তুমি দোতলায় আমার শোওয়ার ঘরে লাজবন্তীর ফটো দেখেছ। সুতীর্থ তোমার জীবনে যা ছিল, লাজবন্তী আমার জীবনে ছিল ঠিক সেইরকম—বা তার চেয়েও বেশি। অথচ ওর সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল মাত্র এক বছর। কিন্তু ওই একবছরেই ও আমার জীবনে ছেয়ে গিয়েছিল...।'

'তারপর?' ফিসফিস করে জিগ্যেস করল নিলি।

আমি অকারণেই দূরে চোখ মেলে দিয়েছিলাম। কিন্তু যেদিকে তাকাই সেদিকেই লাজোর মিষ্টি মুখের ছায়া ভাসছে।

ওর সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল ফুলবাগানের মোড়ে। খুবই সামান্য একটা ঘটনায়।

আমি সেদিন গাড়ি নিয়ে বেরোইনি। তাই ফুলবাগানের মোড় থেকে একটা ট্যাক্সি ধরার চেষ্টা করছিলাম। খালি ট্যাক্সির খোঁজে এপার-ওপার ছুটোছুটি করছিলাম। তখনই নজরে পড়ল, একজন অটোওয়ালার সঙ্গে একজন তরুণীর কথাকাটাকাটি চলছে। দু-চারজন পাবলিক তাদের ঘিরে দাঁড়িয়ে স্রেফ মজা দেখছে।

মেয়েটির গলা প্রায় কাঁদো-কাঁদো। সে পাবলিকের দিকে ইশারা করে কাতর সুরে বিচার চাইছে, কিন্তু পাবলিক পাথরের মূর্তি।

তাই দেখে আমি ব্যাপারটায় নাক গলিয়েছিলাম।

যা শুনলাম, মেয়েটি নাকি অটো থেকে নেমে ভাড়া মেটাতে একটা দশ টাকার নোট দিয়েছে। তাতে অটোওয়ালা বলেছে, 'খুচরো দিন।' মেয়েটি বলেছে, তার কাছে খুচরো নেই। সে-কথা শুনে অটোওয়ালা নাকি খুব রাফভাবে বলেছে, 'খুচরো সঙ্গে নিয়ে উঠতে পারেন না? যান, বাড়ি থেকে খুচরো নিয়ে আসুন—।'

ব্যস, এ থেকেই যত কথাকাটাকাটির শুরু!

আমি মেয়েটির পক্ষ নিয়ে রুখে দাঁড়িয়েছিলাম এবং অভদ্র অটোওয়ালার সঙ্গে তর্কে জড়িয়ে পড়েছিলাম।

শেষ পর্যন্ত অটোওয়ালা পিছু হটতে বাধ্য হয় এবং মেয়েটিকে দশটাকা ভাঙিয়ে ভাড়া মিটিয়ে নেয়।

আলাপটার এইরকমই মামুলি সূত্রপাত। কিন্তু তা থেকে যে আমরা ধীরে-ধীরে এতটা কাছাকাছি চলে আসব সেটা আমরা কেউই ভাবিনি।

দেখতে-দেখতে একটা বছর গড়িয়ে গেল! আমরা দুজনে একেবারে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে গেলাম।

নিলি জিগ্যেস করল, 'তারপর...?'

আমার আর লাজোর সুন্দর একটা বছরের কথা নিলিকে বললাম। তারপর বললাম লাজবন্তীর আমাকে ছেড়ে যাওয়ার দিনটার কথা।

আমার ভ্যাম্পায়ার নিয়ে গবেষণার কথা লাজো জানত। জানত আমার মিশনের কথা। এই লড়াইয়ে লাজো আমার পাশে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়িয়েছিল। আমার বাড়ির দোতলায় সন্ধের পর ও-ই ছিল একমাত্র অতিথি। ওর ক্ষেত্রে কোনওকিছুই বারণ ছিল না। আমরা একসঙ্গে অনেকটা সময় দোতলায় কাটিয়েছি। একে অপরকে উদ্দামভাবে ভালোবেসেছি।

বেশ মনে আছে, দিনটা ছিল রবিবার। আমি আর লাজো আমার গাড়িতে করে লং ড্রাইভে বেরিয়েছিলাম। আমাদের নির্দিষ্ট কোনও গন্তব্য ছিল না। যদি বলি ছিল, তা হলে তার নাম হয়তো ছিল অচিনপুর, অথবা অলীকপুর।

আমি গাড়ি চালাচ্ছিলাম, আর লাজো আমার গায়ে হেলান দিয়ে গুনগুন করে গান গাইছিল ঃ

'মনের রুপোলি পাতে প্রেম রামধনু-রং ছবি,
জীবনের লাভ-ক্ষতি
প্রেমে জেনো ভুল হয় সব-ই।
তবু প্রেম অবিনশ্বর এই কথা বলেছেন কবি।'

কয়েক ঘণ্টা স্বর্গে বাস করার পর আমরা ফেরার পথ ধরেছিলাম। পশ্চিমের আকাশে তখন চাপ-চাপ মেঘ, আর তাদের ঘিরে কমলা, লাল আর সোনালি রং। সেসব রঙের তেজ ক্রমশ ক্ষয়ে যাচ্ছে। ধীরে-ধীরে অন্ধকারের দখলে চলে যাচ্ছিল পৃথিবী।

কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়েতে এসে বাথরুম পেয়ে গেল আমার। তাই লাজবন্তীকে বলে গাড়ি সাইড করলাম। হেডলাইট জ্বেলে রাখলাম, যাতে অন্য গাড়ি আমার গাড়িটাকে সহজে দেখতে পায়।

রাস্তাটার দুপাশে আখ খেতের মতো এক-মানুষ উঁচু ঝোপঝাড়। ঠিক যেন গাছের পাঁচিল। হেডলাইটের আলো সেই গাছগুলোর ওপরে গিয়ে পড়েছে।

গাড়ি থামানোর সময় আমার যেন মনে হল, কয়েকটা গাছ সামান্য নড়ছে। কেউ গাছপালা ঠেলে সরিয়ে ভেতরে হঠাৎ ঢুকে গেলে যেমনটা হয়।

গাড়ি থেকে নেমে সন্দেহের চোখে সেদিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলাম। টের পেলাম, বাতাস নেই। সুতরাং বাতাসের ঝাপটায় যে গাছগুলো নড়ে উঠবে তার কোনও উপায় নেই

তা হলে?

আর কোনও নড়াচড়া চোখে পড়ল না। কে জানে! হয়তো কোনও শেয়াল বা ভাম-টাম হবে।

আকাশে কখন যেন একটা চাঁদ উঠে গিয়েছিল। সেটার দিকে চোখ পড়তেই আমি মুগ্ধ হয়ে গেলাম। চাঁদটাকে সত্যিই রুপোলি থালার মতো লাগছিল তার ওপরে রামধনুর রং বুলিয়ে ছবি আঁকতে ইচ্ছে করছিল আমার।

রাস্তার পাশে জংলা ঝোপের গায়ে দাঁড়িয়ে বাথরুমের কাজ সারতে লাগলাম। কিন্তু আমার একটা হাত প্যান্টের পকেটে, রুপোর ছুরির বাঁটে। আমি তৈরি আছি।

আমি বারবারই গাড়ির দিকে তাকাচ্ছিলাম। কারণ, একটা অস্বস্তি থেকে-থেকেই মনের মধ্যে খোঁচা দিচ্ছিল।

হঠাৎ দেখি, লাজবন্তী গাড়ি থেকে নেমে পড়েছে। আমার নাম ধরে চেঁচিয়ে ডাকছে ঃ 'কিরণ! কিরণ! কিরণ!...আই লাভ য়ু...আই লাভ য়ু...আই লাভ য়ু...।'

ওর পাগলামো দেখে আমার হাসি পেয়ে গেল। মেয়েটা সত্যি ছেলেমানুষ!

আমিও চিৎকার করে বললাম, 'আমি লাভ য়ু টু, লাজো!'

লাজো তখন নাচের ভঙ্গিতে পা ফেলে গাড়ির হেডলাইটের আলোর বৃত্তে গিয়ে দাঁড়িয়েছে।

'কী করছ, লাজো? ইট ইজ নট সেফ। যাও, শিগগির গাড়িতে গিয়ে বোসো!' আমি ওকে সাবধান করতে চাইলাম। কিন্তু ও তখন আমার কথা শুনলে তো!

'লুক। সাচ আ লাভলি মুন।' খুশিতে বিভোর হয়ে আকাশের চাঁদের দিকে আঙুল দেখাল লাজবন্তী। চাঁদের জন্যে উড়ন্ত চুমু ছুড়ে দিয়ে চিৎকার করে বলল, 'আই লাভ য়ু, মুন! আই লাভ য়ু, কিরণ!'

এইরকম পাগলামি করতে-করতে মেয়েটা হাত-পা-শরীর দুলিয়ে নাচের মুদ্রা ফুটিয়ে তুলল—তার সঙ্গে বিভঙ্গ আর ছন্দ।

আমি ততক্ষণে বাথরুম সেরে গাড়ির দিকে ফিরছি।

ঠিক তখনই ঘটনাটা ঘটল।

কালো রঙের একটা কী যেন আগাছার ঝোপ থেকে ছিটকে বেরিয়ে এল। কুমীরের মতো ক্ষিপ্র হামাগুড়ি দিয়ে ওটা লাজবন্তীর কাছে চলে এল। তারপরই অদ্ভুত সরীসৃপটা লাজবন্তীর গা বেয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল। এবং একটা মানুষের চেহারায় পালটে গেল। রোগা, লম্বা। গায়ে কালো রঙের পোশাক।

ঘটনাটা এতই আচমকা ঘটে গেল যে, লাজবন্তী ভয়ে আতঙ্কে কোনও চিৎকার করতে পারেনি।

কিন্তু আমি চিৎকার করতে শুরু করলাম। আর লাজবন্তীকে লক্ষ্য করে পাগলের মতো ছুট লাগালাম।

'লাজো! লাজো! লাজো...!'

রহস্যময় মানুষটার মাথা ঝুঁকে পড়েছিল লাজবন্তীর গলার কাছে। তারপর

ওর টুঁটি কামড়ে ধরে কালো পোশাক পরা ভ্যাম্পায়ারটা এক ঝটকায় আবার সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তখন লাজবন্তীর শরীরটা ভ্যাম্পায়ারটার দাঁত থেকে ঝুলছিল। লাজো যন্ত্রণায় হাত-পা ছুড়ছিল। ওর মুখ দিয়ে কর্কশ গোঙানির আওয়াজ বেরিয়ে আসছিল।

গাড়ির হেডলাইটের আলো থিয়েটারের স্পটলাইটের মতো দেখাচ্ছিল। সেই আলোয় পুরো ব্যাপারটা খুব হিংস্র আর নিষ্ঠুর লাগছিল।

ভ্যাম্পায়ারটা চোখের পলকে একটা বিশাল কালো নেকড়ের চেহারায় পালটে গেল। বেশ বুঝতে পারলাম, লাজবন্তী শেপ শিফ্‌টারের খপ্পরে পড়েছে।

নেকড়েটা তখনও একইভাবে লাজোকে গলায় কামড়ে ধরে রেখেছে।

আমার শরীর অবশ হয়ে আসছিল, মাথা ঝিমঝিম করছিল। তবুও আমি প্রাণপণে ছুটে যাচ্ছিলাম লাজোর দিকে।

লাজোকে মুখে ধরে রাখা অবস্থাতেই নেকড়েটা আগাছার জঙ্গল লক্ষ্য করে লাফ দিল। এবং ওরা উধাও হয়ে গেল গাছপালার আড়ালে।

আমি খ্যাপা কুকুরের মতো সেই আগাছার জঙ্গলে ঝাঁপিয়ে পড়লাম। সর্বহারা মানুষের মতো হাউমাউ করে কাঁদতে লাগলাম। সেই অবস্থাতেই পাগলের মতো খুঁজতে লাগলাম লাজবন্তীকে।

একসময় হেডলাইটের আলোর তেজ কমে এল। চাঁদ আরও হেলে গেল পশ্চিম দিকে। ক্লান্ত-শ্রান্ত অবস্থায় আগাছার জঙ্গল থেকে রাস্তায় বেরিয়ে এলাম আমি। কাঁদতে-কাঁদতে রাস্তার ওপরে বসে পড়লাম।

লাজো নেই! লাজো আর নেই।

আমার সবকিছু হারানোর কাহিনি বলতে-বলতে চোখ ঝাপসা হয়ে গিয়েছিল। নিলি যে কখন আমার বাঁ-হাতের কবজিটা আলতো করে চেপে ধরেছে সেটা খেয়ালই করিনি।

আকাশের আলো কমে গিয়ে অন্ধকার নেমে আসছে। একটা চাঁদ দেখা যাচ্ছে আকাশে।

'ডক্টর মিত্র। ডক্টর মিত্র!' কে যেন ডাকছে দূর থেকে।

নিলি নরম গলায় বলল, 'চলুন—আপনাকে ডাকছে। আমাদের এবার ফিরতে হবে...।' আমার হাতটা ছেড়ে দিল ও।

প্রসেনজিৎ বিশ্বাস আমাকে ডাকতে-ডাকতে কাছে এগিয়ে এল।

'ডক্টর মিত্র, চলুন, গাড়িতে উঠে পড়ি। সন্ধে হয়ে গেছে। ভ্যাম্পায়ারগুলোর উৎপাত এবার বাড়বে। ওরে বাবা! ভাবতেই কেমন লাগছে!'

'আপনি গাড়িতে গিয়ে বসুন—আমরা যাচ্ছি...।'

প্রসেনজিৎ নিলির দিকে একবার তাকাল। তারপর আমাকে লক্ষ্য করে সায় দিয়ে মাথা নাড়ল। রওনা হয়ে গেল খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে থাকা টাটা সুমোর দিকে।

আমি নিলির সঙ্গে পা মিলিয়ে গাড়ির দিকে হাঁটা দিলাম। পকেট থেকে রুমাল বের করে চোখ মুছে নিলাম। প্রসেনজিৎ ছেলেটি হয়তো আমার চোখে জল দেখে ফেলেছে। সে ফেলুক গে!

নিলি ফিসফিস করে বলল, 'আমাদের গল্প দুটো কী সাংঘাতিক একরকম।'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললাম, 'হ্যাঁ। সেইজন্যেই হয়তো ওই সেমিনারে আমাদের দেখা হয়েছে। কে জানে!'

হঠাৎই খেয়াল করলাম, গাড়ির কাছে দাঁড়িয়ে রত্নাকর আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। হাতে সিগারেট।

গাড়িতে ওঠার সময় সনাতন মাইতি বললেন, 'আজকের পিকনিকটা খুব ভালো জমেছে। কাল থেকেই আর-একটা পিকনিকের কথা ভাবুন, প্রফেসর মিত্র...।'

আমি লাজবন্তীর সর্বনাশের ঘটনার ঘোরের মধ্যে ছিলাম। চমকে উঠে সনাতন মাইতির দিকে তাকালাম, বললাম, 'হ্যাঁ—দেখি। আমি আর রত্নাকর বসে একটু ডিসকাস করে নেব...।'

গাড়ি স্টার্ট দিল। তারপর ছুটতে শুরু করল। রত্নাকরের গা থেকে সিগারেটের গন্ধ ভেসে আসছিল। আমি নাক কুঁচকে বসে রইলাম।

বীরেন নাগ রত্নাকরকে বললেন, 'মিস্টার চৌধুরী, আজকের চাঁদটা দেখেছেন? মনে হচ্ছে, অষ্টমী কি নবমীর চাঁদ...।'

রত্নাকর গাড়ির জানলা দিয়ে চাঁদের দিকে একবার দেখল।

আমিও দেখলাম। তারপর মিস্টার নাগের দিকে তাকালাম : 'আপনার পয়েন্টটা কী?

'বলছি, ফুল মুন—মানে পূর্ণিমায় একটা ফিল্ড ট্রিপের অ্যারেঞ্জমেন্ট করলে হয় না? সন্ধেবেলা ফুটফুটে জ্যোৎস্নার মধ্যে ঘুরে বেড়ানো যাবে...।'

সনাতন মাইতি বললেন, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ। অ্যারেঞ্জ করুন, স্যার। জ্যোৎস্নায় দারুণ

অ্যাডভেঞ্চার হবে। জ্যোৎস্নার আলোয় ভ্যাম্পায়ার শিকার করব...।'

অমিতা নাগ অনুযোগের সুরে বললেন, 'ব্যাপারটা একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে না? আপনার বইতেই তো পড়েছি, পূর্ণিমার সময় ভ্যাম্পায়ারদের দাপট বাড়ে। তো তখন ওদের কাছাকাছি যাওয়ার কী দরকার?'

আমি হেসে বললাম, 'আপনি ভুল করছেন, মিসেস নাগ। ভ্যাম্পায়াররা সবসময়েই আমাদের কাছাকাছি আছে। ওরা যে কখন কোথায় থাকে কেউ জানে না। ওদের নির্দিষ্ট কোনও এলাকা নেই। নইলে আপনার ছেলে হঠাৎ বাইপাসে মেট্রো রেলের নীচে ভ্যাম্পায়ারের ভিকটিম হতে যাবে কেন? ওই এলাকায় ভ্যাম্পায়াররা ঘোরাঘুরি করে এমন রেকর্ড তো আমার কাছে নেই! আসলে গোটা ওয়েস্ট বেঙ্গলে ভ্যাম্পায়াররা গ্র্যাজুয়ালি সংখ্যায় বাড়ছে। যদি আমরা এখন থেকেই রুখে না দাঁড়াই তা হলে একদিন কী সাংঘাতিক অবস্থা হবে বুঝতে পারছেন?'

অমিতা নাগ কী একটা বলতে গিয়েও চুপ করে গেলেন।

আমি বললাম, 'মিসেস নাগ, ভ্যাম্পায়ারের এগেইনস্টে এই যে লড়াইটা আপনি আর মিস্টার নাগ লড়ছেন, এটা আপনাদের ছেলে রাজনকে আপনাদের গিফ্‌ট...।'

বীরেন নাগ আমার কথায় সায় দিয়ে বললেন, 'ঠিক বলেছেন, প্রফেসর মিত্র—।'

সনাতন মাইতি মন্তব্য করলেন, 'এই স্পিরিটটাই আসল, ডক্টর মিত্র। এই স্পিরিটটাই ভ্যাম্পায়ারদের খতম করতে পারবে।'

নিলি এতক্ষণ চুপচাপ ছিল। এখন একটু উৎসাহ দেখাল : 'একদম ঠিক। এটাই রাইট স্পিরিট—।'

ও বোধহয় সুতীর্থকে গিফ্‌ট দেওয়ার কথা ভাবছিল। আর আমি লাজবন্তীকে।

প্রসেনজিৎ হঠাৎ বলে উঠল, 'দারুণ বলেছেন! এই স্পিরিট ভ্যাম্পায়ারের বডিতে ঢেলে দিয়ে আগুন ধরিয়ে দেব। ব্যস, তখন শুধু দাউদাউ আর দাউদাউ...'

নিলি আমার কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে বলল, 'সত্যি, একজন মেম্বার জোগাড় করেছেন বটে!'

আমি কোনও জবাব দিতে পারলাম না। কারণ, আমি তখন হাসি চাপতে চেষ্টা করছিলাম।

পাঁচ

'কেমন আছ, কিরণ?'

'এতদিন পরে তোমার ফোন করার সময় হল!'

'বিশ্বাস করো, সময় পাইনি। এই এলাকা ছেড়ে বহুদূরে আমাদের যেতে হয়েছিল। অনেকটা মাইগ্রেট করার মতন...।'

'মাইগ্রেট? যাযাবর পাখির মতো? কেন?'

'অনেক সময়...বাঁচার জন্যে...আমাদের দেশ-দেশান্তরে যেতে হয়। যাকগে, বলো, কেমন আছ?'

'ভালো না। তুমি চলে যাওয়ার পর থেকে একদম ভালো না...।'

'আমিও—।'

'তুমি কেমন আছ?'

'ভালো না। অন্ধকার জগতে যেমন থাকা যায়। এ-জগতের সবকিছুই আলাদা। সব নিয়মকানুনই অন্যরকম...।'

'তুমি আমার কাছে এসো, লাজো।'

'শুধু টেলিফোনে আসতে পারি—তার বেশি কিছু নয়...।'

'কেন? নয় কেন?'

'আমি এখন যা তাতে তোমার আমার বন্ধুত্ব অসম্ভব। আমি এক জগতের প্রাণী, আর তুমি আর-এক জগতের। বাকি জীবনটা আমাদের ফোন-ফ্রেন্ড হয়েই থাকতে হবে।'

'তোমাকে খুব দেখতে ইচ্ছে করে—।'

'আমারও।'

'পুরোনো কথা খুব মনে পড়ে। প্রথম চুমু খাওয়ার দিন। প্রথম আদরের রাত...।'

'আমারও মনে পড়ে। সেসব কি ভোলা যায়।'

'না, কোনও কথা শুনব না। তুমি আমার কাছে এসো। একদিন অন্তত এসো...।'

'বাচ্চা ছেলের মতো বায়না কোরো না, কিরণ। সেটা হয় না।'

'কোনও উপায় কি নেই?'

'না গো। দিনের আলো আমি আর সইতে পারি না। আমাদের যত চলাফেরা সব রাতে। কিন্তু রাতে তোমার সঙ্গে আমার দেখা হওয়ার কোনও উপায় নেই।'

'কেন?'

'তোমার বাড়ির দোতলায় ইলেকট্রনিক সেফটি সিস্টেমের ব্যবস্থা রয়েছে কেন?'

'সে তো তুমি জানো—।'

'তা হলে? সেইজন্যেই রাতে তোমার সঙ্গে আমার দেখা হওয়া অসম্ভব। আমি রাতে তোমার কাছে গেলে তোমার...তোমার...ক্ষতি হবে, কিরণ...।'

আমি চুপ করে রইলাম। জানলা দিয়ে আকাশের দিকে চেয়ে রইলাম। সেখানে বাঁকা চাঁদ শূন্যে ভাসছে। কোনও অবলম্বন নেই। আমার জীবনের মতো।

লাজবন্তী বলল, 'তোমার ক্ষতি হবে। কিন্তু তাতে আমার লাভ হবে।'

'কেন?'

'কারণ, তখন তুমি আমাদের দিকে চলে আসবে। আমাদেরই একজন হয়ে যাবে। তখন...তখন আমার আর কোনও কষ্ট থাকবে না। কোনও...কষ্ট...থাকবে না। একটুও না...।'

লাজবন্তীর গলাটা কেমন আচ্ছন্ন আর লোভাতুর শোনাল। ও আর এপারে আসতে পারবে না। তাই আমাকে ওপারে পেতে চাইছে। এই চাওয়া যদি পাওয়ায় বদলে যায় তা হলে আমার ভ্যাম্পায়ার মিশন শেষ।

এইভাবে আমি ব্যাপারটা আগে কখনও ভাবিনি। লাজোও এভাবে কখনও বলেনি।

মানসিক টানাপোড়েনের ঢেউ আমার ওপরে আছড়ে পড়ল।

কী করব আমি? এপারে থাকব? নাকি পাড়ি দেব ওপারে?

সেখানে গিয়ে কি আমার লাজোকে ফিরে পাব? কোমল, মিষ্টি, ভালোবাসায় মাখানো লাজবন্তী?

নাকি তার বদলে দেখতে পাব অপরূপ সুন্দরী হিংস্র এক নিশাচর ভ্যাম্পায়ারকে?

কিন্তু তখন আমিও তো তাই! একইরকম হিংস্র, একইরকম নিশাচর, রক্তপিপাসায় একইরকম পাগল!

তারপর...তারপর...সেই অন্ধকার জগতে আমি মৃত্যুহীন এক অমানুষ হয়ে

বেঁচে থাকব। যদি অবশ্য তার নাম বেঁচে থাকা হয়।

'কী হল, কিরণ? কিছু বলো—।'

আমার ভেতরে একটা কষ্ট হচ্ছিল। মায়ের কথা মনে পড়ছিল। মা অনেক কষ্ট পেয়ে মারা গিয়েছিল। মা! মা আমার!

আমার চোখে জল এসে গেল। ভাগ্যিস মায়ের সৎকার করা হয়েছিল! না হলে লাজোর হাতছানিতে আমি ওপারের জগতে চলে গেলে অন্য এক মায়ের সঙ্গে আমার দেখা হত। যে-মায়ের মধ্যে কোনওরকম স্নেহ-মায়া-মমতা নেই। যে-মা লাজবন্তীর মতোই হিংস্র, নিষ্ঠুর, রক্তপিপাসু, নিশাচর।

কথাগুলো ভেবে আমি শিউরে উঠলাম। যে-দেওয়ালে মায়ের ফটো সেদিকে আন্দাজে তাকালাম। কারণ, ঘর অন্ধকার। শুধু জানলা দিয়ে একটুকরো রাতের আকাশ চোখে পড়ছে।

'লাজো, আমার খুব কষ্ট হচ্ছে।'

'কেন?'

'তোমার কাছে যেতে না পারার কষ্ট—।'

হাসল লাজবন্তী ঃ 'তা হলে আমাকে তোমার কাছে যেতে দাও...রাতে...।'

'ন্-না, সেটা হয় না।'

'কেন?'

'আমার এখনও অনেক কাজ বাকি। সেগুলো শেষ করার জন্যে সময় দরকার...।'

'কাজ মানে তো ভ্যাম্পায়ার নিয়ে ওই ছাতার রিসার্চ!' ব্যঙ্গের হাসি হাসল লাজো।

কী আশ্চর্য! একসময় এই রিসার্চের ব্যাপারে ওর অনেক শ্রদ্ধা ছিল। আমার পাশে দাঁড়িয়ে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ও আমাকে রিসার্চে সাপোর্ট দিয়েছে। মোটিভেট করেছে। অথচ আজ ওর কথার সুরে শুধু তাচ্ছিল্য আর ব্যঙ্গ!

'কিরণ, সব ছেড়ে তুমি আমাদের মধ্যে চলে এসো। তারপর যত খুশি প্রাণ ভরে রিসার্চ করো। ভ্যাম্পায়ারদের সম্পর্কে বহু ইনফরমেশান তোমার জানা নেই। সেগুলো জানার জন্যে তুমি বোকার মতো ধস্তাধস্তি করে মরছ। আমাদের মধ্যে চলে এলে এক পলকে তুমি সব জেনে যাবে। তোমার তাতে দারুণ আনন্দ হবে—দেখো...।'

লাজবন্তীর কথাগুলোর আমার কানে সাপখেলানো সুরের মতো বাজছিল।

শব্দগুলো শুনতে-শুনতে আমার কেমন যেন নেশা ধরে যাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল, ও আমাকে হিপনোটাইজ করে ফেলছে।

লাজো কখনও এভাবে আমার সঙ্গে কথা বলেনি।

আমি মনের সমস্ত শক্তি এক জায়গায় জড়ো করলাম। তারপর ধীরে-ধীরে বললাম, 'লাজো, আমরা দুজনে যার-যার জগতে থাকি, সেটাই বরং সবচেয়ে ভালো।'

ও তীক্ষ্ণভাবে জবাব দিল, 'কিন্তু তুমি তো জানো, কিরণ, এই দুটো জগৎ একে অপরের শত্রু...।'

'হ্যাঁ, জানি। সোজা কথায় বলতে গেলে, তুমি আমার শত্রু, আমি তোমার শত্রু।'

'তা হলে? আমি তোমাকে কাছে পাব কেমন করে?'

'তা হলে এই ফোনে কথা বলাটাই সবচেয়ে ভালো। তুমি আমার কাছে চিরকাল সেই আগের লাজবন্তী হয়েই বেঁচে থাকবে...। হয়তো আমিও তোমার কাছে...।'

'তোমার ডিসিশানটা কিন্তু ঠিক হচ্ছে না, কিরণ...।'

'লাজো, তুমি আর আগের মতো নেই—পালটে গেছ।'

'মানুষ যেমন পালটায়, তেমনি ভ্যাম্পায়াররাও পালটায়।'

হ্যাঁ, পালটায়। নিলির কথা মনে পড়ল আমার। মনে পড়ল পালটে যাওয়া সুতীর্থর কথা।

আমি আর কোনও কথা বলছিলাম না। শুধু পুরোনো লাজোর কথা ভাবছিলাম।

আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে লাজবন্তী বলল, 'আমার কথাগুলো ভেবে দেখো, কিরণ। তোমাকে ছেড়ে থাকাটা আমার কাছে ইম্‌পসিব্‌ল। আমি যতক্ষণ পারি তোমার কাছে-কাছে থাকার চেষ্টা করি...তোমাকে দেখি...তোমাকে ফিল করি...।'

'তার মানে?'

'আমি নিলির কথা জানি—' হাসল লাজবন্তী।

আমি কী বলব ভেবে পাচ্ছিলাম না। নিলির কথা লাজবন্তী জানল কেমন করে? ও কি আমার ওপরে নজরদারি চালাচ্ছে?

'চুপ করে গেলে কেন, কিরণ? অবাক হলে?'

'না...মানে...।'

'আমি আরও অনেক কিছু জানি। যেমন, চারদিন আগে বৃহস্পতিবার তুমি কয়েকজন মেম্বারকে সঙ্গে নিয়ে পুনিপুকুর নামে একটা গ্রামে ফিল্ড ট্রিপে গিয়েছিলে।'

'তুমি এসব জানলে কী করে?' আমি কেমন যেন দিশেহারা হয়ে পড়ছিলাম।

'জানি, এটা তুমি জেনে রাখো। আর এও জেনে রাখো, আমি একা নই—আমরা সব একসঙ্গে একজোট হয়ে থাকি। আমরা অনেক হলেও আসলে এক। মানুষের মতো কোনও বিভেদ নেই আমাদের।'

আমি বিভ্রান্ত হলেও লাজবন্তীর দেওয়া তথ্যগুলো মাথায় ঢুকিয়ে নিতে চেষ্টা করছিলাম। আমার গবেষক সত্তা মাথাচাড়া দিচ্ছিল।

আমি চুপ করে ছিলাম। কী বলব ভেবে পাচ্ছিলাম না।

'আজ রাখছি, কিরণ।' লাজবন্তী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল : 'আমার কথাগুলো ভেবে দেখো...।'

আমি বললাম, 'নতুন করে ভাবার কিছু নেই...।'

'যেটা তুমি ভালো বোঝো।' একটু চুপ করে থাকার পর : 'নিলির সঙ্গে তোমার ব্যাপারটাও আমার ভালো লাগছে না—।'

কথাটা বলেই ফোন কেটে দিল লাজবন্তী।

অদ্ভুত এক যন্ত্রণায় কয়েকটা দিন কেটে গেল আমার।

একদিকে লাজবন্তীকে চাওয়া। আর একদিকে লাজবন্তীর বদলে যাওয়া। এ দুটো দিক ছাড়া সম্পূর্ণ নতুন আর একটা তৃতীয় দিকে আমার ভ্যাম্পায়ার রিসার্চ।

এই তিনরকম টানের টানাপোড়েনে আমি ছিন্নভিন্ন হয়ে গেলাম।

আমার রাতের ঘুম চলে গেল। একদিকে চোখে জল আর জ্বালা। অন্যদিকে বুকের ভেতরে শপথ আর সাহসের উত্তাপ।

নিলির সঙ্গে কথা বললে আমার মনটা একটু ভালো লাগে। একদিন সকালবেলা দশটা নাগাদ দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে নিলির সঙ্গে কথা বলার সময় হঠাৎই ও বলল, 'আচ্ছা, একটা কথা বলুন তো! আপনার কি কিছু হয়েছে?'

'কেন? কী হবে?'

'না...। মনে হচ্ছে...আপনি একটু ডিসটার্বড...।'

'ন্-না তো।' আমি ওর সঙ্গে দাঁড়িয়ে কথা বলছিলাম। ওর কথায় আচমকা পা দুটো কেমন উইক লাগল। আমি একটা টুল টেনে নিয়ে বসে পড়লাম।

'আমাকে লুকোবেন না। আপনার হাবভাব, ইচ্ছে-অনিচ্ছে, পছন্দ-অপছন্দ—সব আমি বুঝতে পারি...। বলুন, কী হয়েছে?'

কী যে হল মনের মধ্যে, ওকে লাজবন্তীর সব কথা খুলে বললাম। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার হল, সেসব কথা বলার সময় আমার বুকের মধ্যে কোনও পাথর ভাঙল না, চোখে এককোঁটাও জল এল না।

আমার কথার মাঝে নিলি শুধু একবার বলেছিল, 'আমার সুতীর্থর কথাটা একবার ভাবুন! ও কী থেকে কী হয়ে গেল! সত্যিই আমাদের দুটো জগৎ একেবারে আলাদা। এই দুটো জগৎ কখনও এক হবে না—হতে পারে না—কোনওদিনও না...। আমি তো অনেকদিন আগেই চোখের জল মুছে নিয়েছি, মন শক্ত করে নিয়েছি।'

নিলিকে সব কথা খুলে বলার পর আমার একটু হালকা লাগল।

সব শুনে নিলি মন্তব্য করল, 'আপনার কথা থেকে একটা ইম্পরট্যান্ট ইনফরমেশান পাওয়া গেল : ভ্যাম্পায়ারদের মধ্যে জেলাসি আছে।'

আমি অল্প হাসলাম। বললাম, 'হ্যাঁ—আছে।'

'যাকগে, এবারে আপনার মনটা একটু ঠিক করুন তো! আপনি কোনও চিন্তা করবেন না। আমি ফোন করে-করে আপনার মন ঠিক করে দেব...।'

'হ্যাঁ—তাই কোরো। সেটা আমার দারুণ লাগবে।'

'শুনুন, এবার অকাজের কথা বলি। ওই যে আর্টিক্‌লটা লিখতে বলেছিলেন, আপনার সোসাইটির বুলেটিনের জন্যে—ওটা অনেকটা লেখা হয়ে গেছে। কাল আপনাকে একবার দেখাব। অফিসে থাকবেন তো?'

'তুমি যদি সকাল-সকাল আসো তা হলে দোতলায় বসে নিরিবিলিতে দেখতে পারি। যদি অবশ্য তোমার কোনও অসুবিধে না থাকে—।'

খিলখিল করে হেসে উঠল নিলি। মনে হচ্ছিল যেন ফোনের ও-প্রান্তে ও হেসে গড়িয়ে পড়ছে।

হাসি থামার পর ও বলল, 'আমার আবার কীসের অসুবিধে! আমি ভাবছি অন্য কথা...।'

'কী কথা?'

'আপনি আমাকে ভয় পান হয়তো—।'

'ভয় পাব কেন? তোমাকে ভ্যাম্পায়ার ভেবে?'

'না, বরং এগজ্যাক্টলি উলটো—আমাকে ভ্যাম্পায়ার না ভেবে।' কারণ, আমি ভ্যাম্পায়ারের চেয়েও ইন্টারেস্টিং।'

'তুমি এসো তো, তারপর দেখা যাবে কে কাকে ভয় পায়।'

পরদিন নিলি এল। গায়ে সাদার ওপরে বাদামি বুটি দেওয়া একটা চুড়িদার। সালোয়ারটা বিস্কুট রঙের। কাঁধে বাদামি সাইড ব্যাগ। সব মিলিয়ে বেশ মানিয়েছে।

দোতলায় নিরিবিলিতে বসে ওর 'ভ্যাম্পায়ার ঃ সাধারণ মানুষের চোখে' লেখাটার খসড়া নিয়ে আলোচনা শুরু করলাম।

না, ওর লেখার হাত খারাপ নয়। লেখাটার কয়েক জায়গায় কারেকশান করলাম। দু-জায়গায় মেটিরিয়াল অ্যাড করতে বললাম। আরও বললাম যে, আর্টিক্‌লের শুরুটা আরও একটু ইন্টারেস্টিং হওয়া দরকার।

এসব করতে-করতে দেড়ঘণ্টা সময় কখন যে গড়িয়ে গেছে খেয়ালই করিনি।

একসময় লেখার খসড়াটা গুছিয়ে নিয়ে ও উঠে দাঁড়াল। ঠিক তখনই আমার ফোন বেজে উঠল।

রত্নাকর।

ফোন ধরতেই ও বলল, আমার সঙ্গে ওর নাকি খুব জরুরি কথা আছে। আমি যেন তাড়াতাড়ি অফিসে নামি।

নিলি দোতলায় আসার পর রত্নাকর আমাকে এই নিয়ে তিনবার ফোন করল। তিনটে ফোনেরই আসল উদ্দেশ্য আমাকে তাড়াতাড়ি অফিসে নামানো।

আমিও এই নিয়ে ওকে তিনবার জবাব দিলাম যে, একটু পরে নামছি—কারণ, নিলির সঙ্গে আমি কয়েকটা জরুরি ব্যাপারে কথা বলছি।

ফোন রেখে দিয়ে নিলিকে বললাম, 'রত্না আবার ফোন করেছিল...।'

ও অবাক হয়ে বলল, 'কে রত্না?'

আমি হেসে বললাম, 'আমার প্রেমিকা রত্না—রত্নাকর।'

সঙ্গে-সঙ্গে নিলির কী হাসি! হাসি আর থামতেই চায় না।

'তুমি আর আমি কাছাকাছি হলেই রত্নার ব্লাডপ্রেশার চড়ে যায়।'

'কেন?' কোনওরকমে হাসি থামিয়ে ও বলল।

'যদি আগুন জ্বলে যায়—।'

'তাই?' বলে হাত বাড়িয়ে আমার গাল ছুঁয়ে দিল মেয়েটা।

আমি আর থাকতে পারলাম না। এক হ্যাঁচকায় ওকে আমার গায়ের ওপরে টেনে নিলাম। আমার ঠোঁট দিয়ে ঢেকে দিলাম ওর ঠোঁট। সঙ্গে-সঙ্গে আমার শরীরের ভেতরে দাউদাউ আগুন জ্বলে গেল।

আগুন জ্বলে গেল নিলির ভেতরেও। ও আমাকে আঁকড়ে দরে খ্যাপা সাইক্লোনের মতো বলগাহীন হয়ে গেল। আমার জামা ছিঁড়েখুঁড়ে আমাকে আঁচড়ে-কামড়ে একেবারে শেষ করে দিল।

আমি ওকে জাপটে ধরে বেডরুমের দিকে নিয়ে গেলাম।

আমার ভেতরে বন্দি খ্যাপা চিতাবাঘটা চেন ছিঁড়ে বেরিয়ে এল। পাগলের মতো দাপাদাপি শুরু করল।

শরীরের ঝড়ে আমরা দুজন লন্ডভন্ড হয়ে গেলাম। দুজন একা মানুষ এক হয়ে গেল।

ঝড়ের শেষে আমরা একে অপরকে অনেকক্ষণ ধরে দেখলাম। আরও অনেক আদর করলাম। অনেক কথা বললাম। সেসব কথার বেশিরভাগটাই হয়তো অর্থহীন, তবে আন্তরিক।

কিছুক্ষণ পর আমরা বিছানা ছেড়ে উঠলাম। জামাকাপড় পরে নিলাম।

নিলি লাফিয়ে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরে মুখে, গালে, ঠোঁটে চার-পাঁচটা চুমু খেল। আমি একটুও দেরি না করে চুমুগুলো ওকে সুদে-আসলে শোধ দিলাম।

আমার মনে হচ্ছিল, আমি লাজবন্তীকে আদর করছি—আমার পুরোনো লাজবন্তীকে। জানি না, নিলি আমাকে সুতীর্থ ভাবছে কি না।

আচমকা আমার মোবাইল ফোন বেজে উঠল।

বিছানার পাশেই একটা ছোট টেবিলের ওপরে ছিল ফোনটা। এগিয়ে গিয়ে ওটা তুলে নিলাম।

'হ্যালো—।'

'আমরা বলছি।' সেই কোরাস কণ্ঠস্বর।

আমার নিয়ন্ত্রণকে আমল না দিয়ে একটা ঠান্ডা স্রোত আমার শিরদাঁড়া বেয়ে বইতে শুরু করল।

'বলুন...।'

'আপনি তো আমাদের কথা শুনছেন না। তা হলে বলুন আমরা এখন কী করব—।'

'আমি তো শুধু রিসার্চ করছি—ভ্যাম্পায়ার নিয়ে।'

'হ্যাঁ। সেজন্যেই তো বলছি। আমরা না চাইলে আপনি আমাদের নিয়ে খেয়ালখুশি মতো রিসার্চ করতে পারেন না।'

আমি চুপ করে রইলাম।

'আপনার মতো পণ্ডিত বুদ্ধিমান মানুষকে এতবার কেন বোঝাতে হয়?' কোরাস গলায় বেশ বিরক্তির ছোঁওয়া, 'এরপর তো আমাদের স্টেপ নিতে হবে। তা ছাড়া কোনও উপায় দেখছি না।'

অনেক সাহস জোগাড় করে উত্তেজিতভাবে বলে উঠলাম, 'আমি মরতে ভয় পাই না—।'

কোরাস গলা যেন মজা পেয়ে হেসে উঠল।

একটু পরে হাসি থামিয়ে বলল, 'প্রফেসর মিত্র, আপনি এত বোকা জানতাম না। আরে, মরার কথা কে বলছে!'

'তা হলে? আপনাদের কথা আমি বুঝতে পারছি না...।'

'আরে গাধা, তোকে আমরা আমাদের দিকে টেনে নেব! তোর হাতে আর বেশি সময় নেই—।'

কথা শেষ করে হেসে উঠল ওরা। তারপরই ফোন কেটে দিল।

ঠান্ডা স্রোতটা আমি আবার টের পেলাম। আমার চোখ গেল লাজবন্তীর ফটোর দিকে।

আমার হাতে আর বেশি সময় নেই?

আমাকে ঘামতে দেখে নিলি জিগ্যেস করল, 'কী হয়েছে? কে ফোন করেছে?'

আমি বিছানায় বসে পড়লাম। কিছুক্ষণ কোনও কথা বলতে পারলাম না।

আমাকে ওদের দিকে টেনে নেবে?

একটু পরে ধাতস্থ হয়ে নিলিকে বললাম, 'নিলি, আমার পাশে এসে বোসো—।'

ও এসে বসল। কাঁপা গলায় আবার প্রশ্ন দুটো করল, 'কী হয়েছে? কে ফোন করেছে?'

আমি মনে-মনে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললাম ঃ নিলিকে সব খুলে বলব। তা না হলে এরপরে হয়তো আর সময় পাব না। আমি হয়তো আমাদের দিক থেকে ওদের দিকে চলে যাব।

আমি নীচু গলায় ওকে বলতে শুরু করলাম। নিলি চুপচাপ বসে শুনতে লাগল আমার কথা। ঘড়ির কাঁটা ঘুরতে লাগল।

সব কথা শোনার পর নিলি ছিটকে চলে এল আমার কাছে। আমাকে জাপটে ধরে আমার ঘাড়ের কাছে মুখ গুঁজে দিল। বিড়বিড় করে বলল, 'আপনাকে আমি ছাড়ব না। কিছুতেই ছাড়ব না!'

আবার বেজে উঠল আমার ফোন।

রত্নাকর।

'কী রে, নীচে আয়! ওপরে এতক্ষণ কী করছিস? আমি তো তখন থেকে ওয়েট করছি! এ ছাড়া "টাইমস অফ ইন্ডিয়া" নিউজপেপার থেকে দুজন ভদ্রলোক এসেছেন—একটা ইন্টারভিউর ব্যাপারে তোর সঙ্গে একটু কথা বলতে চায়...।'

'যাচ্ছি—' বলে আমি বিরক্তভাবে মাথা নাড়লাম। মোবাইল ফোন পকেটে রেখে নিলিকে বললাম, 'রত্না আমাকে দারুণ মিস করছে। এতক্ষণ দেখতে না পেয়ে পাগল হয়ে গেছে...।'

নিলি হেসে বলল, 'চলুন, চটপট নীচে যাই। নইলে উনি সত্যি-সত্যি পাগল হয়ে যাবেন...।' ছোট টেবিল থেকে ও সাইড ব্যাগটা তুলে দিল।

সিঁড়ি নামতে-নামতে আমি বললাম, 'রত্নাকরটা যে "হোমো স্যাপিয়েন্স-এর অর্ধেক" সেটা অনেক দেরিতে বুঝেছি। তবে ও শুরু থেকেই নানান ছলছুতোয় আমার গায়ে হাত দিয়ে কথা বলে। লেকচারের পর জড়িয়ে ধরে কনগ্র্যাট্স জানায়...।'

'সবই তো বুঝলাম, কিন্তু হোমো স্যাপিয়েন্স মানে তো মানুষ! তা হলে অর্ধেক "হোমো স্যাপিয়েন্স" মানে?'

'শুধু হোমো—স্যাপিয়েন্স বাদ।' আমি বললাম।

নিলি হাসি চাপতে মুখ ঘুরিয়ে নিল।

একতলার সিঁড়ির মুখে রত্নাকর উৎকণ্ঠা নিয়ে আমার জন্যে অপেক্ষা করছিল। আমাকে দেখেই ওর মুখে হাসি ফুটল। বলল, 'চল্, চল্। ওঁরা অনেকক্ষণ ধরে ওয়েট করছেন...।'

আমি সিগারেটের গন্ধ ঠেকাতে নাকে হাত চাপা দিলাম। রত্নাকর 'সরি—' বলে একটু তফাতে সরে গেল।

আমি চেম্বারের দিকে হাঁটা দিলাম। নিলিকে বললাম, 'তুমি লাইব্রেরিতে গিয়ে আর্টিক্‌লটা ফেয়ার করে লেখো। আমি গেস্টদের সঙ্গে কাজ সেরে লাইব্রেরিতে যাচ্ছি।'

ও লাইব্রেরির দিকে এগোল। আমি চেম্বারে ঢুকলাম। ঢোকার সময় আমার

পিঠে রত্নাকরের হাত টের পেলাম।

'তুই বোস, আমি ওঁদের তোর কাছে পাঠাচ্ছি...।'

ওঃ! আবার সেই ছুতোনাতায় গায়ে হাত! অসহ্য!

প্রায় ঘণ্টা দেড়েক পর কাজের সবরকম ঝামেলা মিটিয়ে লাইব্রেরিতে এলাম। রত্নাকর আমার পেছন-পেছন ঢুকল।

লক্ষ করলাম, দূরে ঘরের একেবারে কোণের একটা টেবিলে নিলি কাগজপত্র ছড়িয়ে বসে আছে। মাঝে-মাঝে মাথা ঝুঁকিয়ে লিখছে।

আর-একটা টেবিলে সনাতন মাইতি বসেছিলেন। হাতে কলিন উইলসনের লেখা 'অকাল্ট'।

এ ছাড়া অন্য দুটো টেবিলে তিনজন মেম্বার বসে পড়াশোনা করছে।

নিলি আমাকে দেখে হাসল। ছোট্ট করে হাত নাড়ল।

আড়চোখে তাকিয়ে দেখলাম, রত্নাকর ব্যাপারটা খেয়াল করেছে।

সনাতন মাইতি আমাকে দেখে ইশারা করলেন এবং একইসঙ্গে উঠে দাঁড়ালেন।

আমি থমকে দাঁড়ালাম। রত্নাকরও দাঁড়িয়ে পড়ল।

'প্রফেসর মিত্র, আপনার সঙ্গে একটু কথা ছিল।'

ভদ্রলোকের মাথায় ছোট-ছোট চুল—তার বেশির ভাগটাই সাদা। কপালে সমান্তরাল কয়েকটা ভাঁজ। চোখে চশমা। চেহারা রোগাটে, লম্বা। সংসারে আর কেউ নেই—একেবারে একা। ওঁর শখ হচ্ছে অকশন ব্রিজ।

সনাতন হালকা নীল রঙের হাফশার্ট পরে আছেন। পায়ে সাদা প্যান্ট। বাঁ-হাতে একটা নস্যি রঙের রুমাল।

ওঁর গা থেকে সিগারেটের আবছা গন্ধ ভেসে আসছিল। তাতে অবশ্য আমার তেমন অসুবিধে হচ্ছিল না।

আমি বললাম, 'আপনি বসুন, আমি রত্নাকরবাবুর সঙ্গে একটু কাজ সেরে নিয়েই আসছি—।'

আমি রত্নাকরকে হাতের ইশারায় ডেকে ওর বসার টেবিলের দিকে এগোলাম। যেতে-যেতে ওকে বললাম, 'তোর সঙ্গে রিসার্চের ব্যাপারে একটু ডিসকাশন আছে। তুই সেদিন ভ্যাম্পায়ারদের সোশ্যাল স্ট্রাকচারের প্যাটার্ন নিয়ে আমাকে বলছিলি, মনে আছে?'

'হ্যাঁ—' ও বলল।

'আফ্রিকায় মং বাটু নামে একটা ট্রাইব আছে। ওদের সোশ্যাল স্ট্রাকচারের সঙ্গে ভ্যাম্পায়ারদের স্ট্রাকচারের কিছু-কিছু মিল আমি খুঁজে পেয়েছি। সেটা নিয়ে তোর সঙ্গে একটু ডিসকাস করব...।'

রত্নাকর সায় দিয়ে মাথা নাড়ল।

আমি চাই, ও এখন অন্তত ওর রিসার্চ নিয়ে ব্যস্ত হোক। নইলে নিলি যতক্ষণ সোসাইটির অফিসে থাকবে ততক্ষণ ও আমার গায়ে এঁটুলির মতো সেঁটে থাকতে চাইবে।

সুতরাং, রত্নাকরের টেবিলে বসে আমরা রিসার্চ নিয়ে আলোচনা করতে শুরু করলাম। তারপর ওকে পড়াশোনার মধ্যে আটকে রাখার মতো বেশ কিছু কাজ দিলাম।

ওর টেবিল ছেড়ে ওঠার সময় জানালাম, 'শোন, নিলি আমার কাছে পার্ট টাইম রিসার্চে জয়েন করছে। তুই একটু ওকে হেল্‌প করিস—।'

রত্নাকর কোনও কথা বলতে পারল না। শুধু হাঁ করে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

'তুই কাজ কর। আমি আসি—' বলে আমি সনাতন মাইতির কাছে গেলাম।

ওঁর টেবিলে গিয়ে বসতেই উনি বললেন, 'প্রফেসর মিত্র, একটা ইন্টারেস্টিং খবর পেয়েছি। আমার এক ক্লোজ ফ্রেন্ড আধঘণ্টা আগে ফোন করে খবরটা দিল...।'

'কী খবর?' আমি সনাতনের দিক থেকে নজর সরিয়ে দূরে নিলির দিকে তাকালাম। ও কাগজে মনোযোগ দিয়ে লিখে চলেছে।

'বর্ধমান কর্ড লাইনে চন্দনপুর নামে একটা স্টেশান আছে। আমার ওই বন্ধু—কলেজের বন্ধু—নিমাই শেঠ, চন্দনপুরে থাকে। সেখানে পরশুদিন একটা পোড়ো মন্দিরের কাছে একজন লোকের ডেডবডি পাওয়া গেছে। গলার পাশে দুটো দাগ। সবাই বলছে, সাপে কেটেছে। পুলিশ বডি পোস্ট মর্টেমে পাঠিয়েছে—।'

'পোস্ট মর্টেম করে কিছু পাওয়া যাবে না। আগের সব কেসে তাই হয়েছে।' আমি বললাম।

'প্রফেসর মিত্র—' আমার দিকে ঝুঁকে এলেন সনাতন ঃ 'ওখানে একটা পিকনিকের ব্যবস্থা করলে হয় না?'

'পিকনিক?'

'হ্যাঁ—মানে, আমাদের ফিল্ড ট্রিপ।' হাসলেন।

আমি কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললাম, 'করলেই হয়। আপনারা রাজি থাকলে আমার আর প্রবলেম কী! আর আপনারা যদি যেতে সাহস না পান...মানে, শেষ পর্যন্ত যেতে না চান, তা হলেও আমাকে ওখানে যেতেই হবে। এই খবরটাকে বেস করে রিসার্চের জন্যে—।'

'না, না, স্যার। এরকম ভাববেন না। আর কেউ যাক না যাক আমি আপনার সঙ্গে আছি—।'

আমি সনাতন মাইতির চোখের দিকে তাকালাম। একটা শপথের ছোঁওয়া পেলাম সেখানে। ওঁর ফ্যামিলির কেউ কিংবা খুব কাছের কেউ ভ্যাম্পায়ারের অ্যাটাকে মারা গেছে কি না জানি না। সনাতন সে-কথা কখনও আমাকে বলেননি। সংসারে উনি বরাবর একা, নাকি একা হয়ে গেছেন?

'ঠিক আছে। তা হলে পিকনিক হবে।'

'থ্যাংক য়ু, স্যার।' কৃতজ্ঞতার হাসি ওঁর মুখে ছড়িয়ে গেল।

'আপনি তা হলে একটা কাজ করবেন। চন্দনপুরের ওই জায়গাটার লোকেশান ডিটেইল্‌স আর ঘটনার একটা পুরো রিপোর্ট আমাকে দেবেন। তারপর আমি আর আপনি মিলে সব অ্যারেঞ্জমেন্টের স্টেপ নেব।'

আমি চেয়ার ছেড়ে উঠতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু সনাতন বললেন, 'আর-একটা ছোট্ট রিকোয়েস্ট আছে, স্যার...।'

'কী রিকোয়েস্ট?'

'আমাদের ফিল্ড ট্রিপটা পূর্ণিমার সময়ে হলে ভালো হয়। মিস্টার নাগ সেদিন যেমন বলছিলেন...।'

'ঠিক আছে, দেখি। তা ছাড়া কারা-কারা এই ট্রিপটায় যেতে চান সেটাও দেখা দরকার।'

'আপনি আমাকে গ্রিন সিগন্যাল দিলেই আমি নিমাইকে ধরে চন্দনপুরে থাকা-খাওয়ার সমস্ত বন্দোবস্ত করে ফেলব। তারপর পূর্ণিমায় পিকনিক...।'

আমি হেসে উঠে দাঁড়ালাম। নিলির দিকে তাকিয়ে দেখি ও আমারই দিকে তাকিয়ে আছে।

ওকে ইশারা করে বললাম যে, আমি আমার চেম্বারে যাচ্ছি।

নিলি হাসল। মাথা নেড়ে জানাল যে, ও বুঝেছে।

আমি চেম্বারে গিয়ে আমার চেয়ারে বসলাম। চুপচাপ বসে নিলির কথা

ভাবতে লাগলাম। বিশেষ করে আজ সকাল আর দুপুরের কথা। সত্যি, কখনও ভাবিনি যে, আমি নিলির এত কাছাকাছি এসে পড়তে পারি।

আমার টেবিলে রাখা ডেস্কটপ কম্পিউটারে নানারকম রঙিন মাছ ঘুরে-ফিরে খেলা করছে। একটা পাথরের গায়ে আজকের তারিখ আর বার ফুটে উঠে মিলিয়ে যাচ্ছে বারবার। স্ক্রিনসেভারটার দিকে তাকিয়ে আমি পূর্ণিমার রাতের কথা ভাবছিলাম আর ভ্যাম্পায়ারদের কথা ভাবছিলাম। যদি সত্যি-সত্যি পূর্ণিমার রাতে চন্দনপুরে গিয়ে অভিযান চালাতে হয় তা হলে আমাকে সবরকম প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সঙ্গে করে নিয়ে যেতে হবে। কোনওরকম ঝুঁকি নেওয়া চলবে না।

কিবোর্ডের 'এসকেপ' বোতাম টিপে স্ক্রিনসেভারটাকে সরালাম। তারপর নেট চালিয়ে পূর্ণিমার রাতে ভ্যাম্পায়ারদের বিহেভিয়ার নিয়ে পুরোনো পড়াশোনা ঝালিয়ে নিতে লাগলাম। আর একইসঙ্গে আমার ডায়েরিতে ইম্‌পরট্যান্ট পয়েন্টগুলো নোট করতে লাগলাম।

কতক্ষণ এভাবে মগ্ন ছিলাম জানি না, হঠাৎ খেয়াল করে দেখি, নিলি আমার ঘরে ঢুকেছে।

ওর সঙ্গে প্রথমে আর্টিক্‌ল নিয়ে কথা বললাম। তারপর বললাম, দুজন মেম্বারের কাছ থেকে কীভাবে পূর্ণিমায় 'পিকনিক' করার সাজেশান এসেছে।

নিলি বলল, 'আমিও রাজি। পূর্ণিমায় ফিল্ড ট্রিপ করলে দারুণ থ্রিলিং হবে—।'

'ঠিক আছে, দেখছি ব্যাপারটা অ্যারেঞ্জ করা যায় কি না।' জানলার দিকে তাকালাম। দিনের আলো পড়ে আসছে।

ঘড়ি দেখলাম। সাড়ে পাঁচটা। অফিস বন্ধ হওয়ার সময়।

নিলিকে জিগ্যেস করলাম, 'কবে আবার দেখা হচ্ছে?'

ও হেসে বলল, 'কেন, কাল...।'

আমি মাথা নেড়ে বললাম, 'সরি, নিলি। আমার ব্যাড লাক। কাল আমাকে একটু ইন্ডিয়ান মিউজিয়ামে যেতে হবে। সেখানে ডিরেক্টরের সঙ্গে একটা মিটিং আছে। মিটিংটা বেশ লম্বা হতে পারে। পরশু কি তোমার অসুবিধে?'

'একদম না।'

এ-কথার পর নিলিকে অফিসের দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিলাম। তারপর দোতলায় উঠে গেলাম।

রত্নাকর, সুমিতেশ, অভিরূপরা অফিস বন্ধের তোড়জোড় করতে লাগল।

দোতলায় গিয়ে সেফ্‌টি সিস্টেম অ্যাক্টিভেট করলাম। তারপর জামাকাপড় ছেড়ে বসবার ঘরের জানলার কাছে একটা চেয়ার নিয়ে বসলাম। রিমোট কন্ট্রোল ইউনিটের বোতাম টিপে অডিয়োসিস্টেম অন করে দিলাম।

জলতরঙ্গের মিষ্টি সুর ঘরের বাতাসে ভেসে বেড়াতে লাগল।

বাইরের অন্ধকার নেমে এসেছে, কিন্তু আমি ঘরের আলো জ্বালালাম না। অন্ধকার ঘরটাই বেশি ভালো লাগছিল।

জানলা দিয়ে তাকিয়ে দেখি রত্নাকর অফিস থেকে বেরোচ্ছে।

একতলায় দরজার কাছে একটা স্টিলের তৈরি ড্রপ-বক্স আছে। তাতে কম্বিনেশান লক লাগানো। অফিস বন্ধ করে বেরোনোর সময় রত্নাকর চাবিটা রোজ ওই ড্রপ-বক্সে ফেলে যায়। রোজ সকালে অফিস খোলার সময় কম্বিনেশান লক খুলে চাবিটা রত্নাকরকে আমি বের করে দিই।

দেখলাম, রত্নাকর মেন গেট খুলে বেরিয়ে গেল। বেরোনোর আগে ঘুরে দোতলার দিকে একবার তাকাল, কিন্তু অন্ধকার থাকায় আমাকে দেখতে পেল না।

ওর হিজিবিজি হরমোনের পিকিউলিয়ার সমস্যাটার কী সমাধান করা যায় সেটা ভাবতে শুরু করলাম।

সুরের সাগরে কতক্ষণ ভেসে গেছি জানি না, হঠাৎই দেখি, আমার পাঁচিলের বাইরে একটা শিমুল গাছের নীচে অন্ধকার ছায়ায় কে যেন দাঁড়িয়ে আছে।

মানুষটাকে ঠিক স্পষ্ট দেখা না গেলেও তার টাকমাথার খানিকটা চকচক করছিল, আর ভুঁড়িটাও ঠাহর করা যাচ্ছিল।

রত্নাকর কি এখনও দাঁড়িয়ে আছে? ও বাড়ি যায়নি?

কিন্তু ওর জামার রংটা পালটে গেছে বলে মনে হচ্ছিল।

মনে পড়ল, আগেও কয়েকদিন এরকম ব্যাপার আমি লক্ষ্য করেছি।

ছয়

শেষ পর্যন্ত সব ব্যবস্থা করা গেল। আমরা রওনা হলাম পূর্ণিমার পিকনিকে। ব্যাপারটা আমার কাছে নতুন। আগে আমি কখনও পূর্ণিমার রাতে ভ্যাম্পায়ারের খোঁজে বেরোইনি।

কাজটায় ঝুঁকি আছে আমি জানি। তাই সঙ্গে নিয়েছি আক্রমণ প্রতিরোধের কয়েকটা নতুন অস্ত্র।

ট্রিপের খরচ কমাতে বড় গাড়ি ভাড়া করিনি। তার বদলে দুটো অ্যামবাসাডর নিয়েছি।

একটা গাড়িতে আমি, রত্নাকর আর নিলি। রত্নাকর ড্রাইভারের পাশে বসেছে। পেছনের সিটে আমি আর নিলি।

রত্নাকর আমার পাশে বসতে চেয়েছিল, কিন্তু আমি ওকে সামনে বসতে বলেছি। কারণ, আমার পাশে বসলে ওর রত্নাকর থেকে রত্না হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল।

গাড়ির জানলার বাইরে কখনও খোলা মাঠ, কখনও ধানখেত, কিংবা এলোমেলো গাছপালা। সব পেছনদিকে ছুটছে। ওদের চেহারা মলিন, কারণ, বিকেলের ব্যাটারি ফুরিয়ে আসছে।

আমার একটা হাত সিটের ওপরে এলানো। নিলির পোশাক সামান্য ছুঁয়ে আছি। জানলা দিয়ে হু-হু করে হাওয়া ঢুকছে। আমার চুল উড়ছে।

রত্নাকরের আঙুলের ফাঁকে জ্বলন্ত সিগারেট। ওরও পাতলা চুল উড়ছে।

'ভ্যাম্পায়ারদের ওপর তোর কি কোনও আক্রোশ আছে?' হাতের সিগারেটে টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়ল রত্নাকর। মুখ ঘুরিয়ে আমার দিকে তাকাল। নিলিকেও একবার দেখল।

আমি হেসে বললাম, 'আছে। কিন্তু কারণটা জানতে চাস না—ওটা সিক্রেট...।'

রত্নাকর একটু গুম হয়ে গেল।

আমার খারাপ লাগছিল। কারণ, ও আমার খুব কাছের মানুষ।

রত্নাকর মাঝে-মাঝে যেমন উৎসাহে টগবগ করে ওঠে, তেমনই হঠাৎ-হঠাৎ গুম হয়ে যায়। তবে সবসময় আমার কাজের ওপর খুঁটিয়ে লক্ষ রাখে। আর আমার আশেপাশে ঘুরঘুর করে।

কিছুক্ষণ পর রত্নাকর জিগ্যেস করল, 'এই ট্রিপটায় কিছু ইম্‌পরট্যান্ট ডেটা পাওয়া যাবে বলে মনে হয়?' সিগারেটের ছোট হয়ে আসা টুকরোটা জানলা দিয়ে বাইরে ছুড়ে দিল।

'কে জানে! পেতেও পারি। কারণ, পূর্ণিমার সময়ে আগে কখনও আমরা ফিল্ড করতে যাইনি। তা ছাড়া তুই তো জানিস, আমি খুব অপটিমিস্ট। নতুন একটা অভিজ্ঞতা ঝুলিতে ভরার জন্যে আমার লোভ হচ্ছে।'

নিলির মধ্যে কোথায় যেন একটা লুকোনো চুম্বক ছিল। আর আমি যে একটা লোহার টুকরো সেটা টের পেয়েছি ওর সঙ্গে আলাপ হওয়ার শুরু থেকেই। তারপর তো আমরা রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটিয়ে ফেলেছি। রত্নাকর এই রাসায়নিক বিক্রিয়াটা ভালোভাবে নিতে পারছিল না। হয়তো ও চাইছিল না, একটা অল্পবয়েসি টগবগে মেয়ে এভাবে আমাকে এসে দখল করুক। ওর রাজত্বে ভাগ বসাক।

একদিন ও আমাকে হেসে মজা করে বলেছে, 'তুই এখন ঠিক কী নিয়ে রিসার্চ করছিস বল তো? ভ্যাম্পায়ার, না নিলি?'

আমি বলেছি, 'দুটোই—।'

কয়েক লহমা চুপ করে থেকে হেসেছে রত্নাকর। তারপর : 'দেখিস, নিলির ম্যাজিকে দিশেহারা হয়ে ব্ল্যাক ম্যাজিক ভুলে যাস না যেন...।'

সেসব কথা নিয়ে আমি অনেক সময় নিলির সামনেই রত্নাকরের সঙ্গে ঠাট্টা করেছি।

নিলির সঙ্গে আমার সম্পর্ক নিয়ে এখন অবশ্য আর লুকোচুরির কোনও ব্যাপার নেই। রত্নাকরের 'ঈর্ষা' আমি সামলে নেব।

মেজাজটা বেশ হালকা লাগছিল। রত্নাকর মাঝে-মাঝে গম্ভীর হয়ে গেলেও আমি ব্যাপারটাকে খুব একটা আমল দিচ্ছিলাম না।

চন্দনপুরে এসে আমরা একটা দোতলা বাড়িতে উঠলাম। বাড়িটা সনাতনবাবুর বন্ধু নিমাই শেঠ বেশ কম ভাড়ায় ঠিক করে দিয়েছেন। একটা হ্যারিকেন ফ্যাক্টরির পাশে পুরোনো জোড়াতালি দেওয়া দোতলা বাড়িটা কোনওরকমে খাড়া হয়ে রয়েছে।

খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা করে বাড়িতে ঢুকতে-ঢুকতে আমাদের সন্ধে হয়ে গেল। তাতে অবশ্য কোনও অসুবিধে নেই। কারণ, আমরা রাতে গাড়ি নিয়ে এখান থেকে তিন কিলোমিটার দূরে আসল স্পটে যাব। জায়গাটা খুঁটিয়ে দেখব। ভ্যাম্পায়াররা সেই স্পটে কোনও চিহ্ন রেখে গেছে কি না তার খোঁজ করব।

আধঘণ্টার মধ্যেই আমরা বেরিয়ে পড়লাম। সনাতনবাবু এ-অঞ্চলে আগে এসেছেন, তাই তিনি আমাদের গাইড। গাড়িতে করে স্পটে পৌঁছতে আমাদের লাগল মাত্র কুড়ি মিনিট।

আজ পূর্ণিমা। চাঁদ আকাশে সোনার থালা। রত্নাকর সেদিকে হাঁ করে তাকিয়ে আছে। ও এভাবে তাকাতেই পারে। কারণ, ও কবি। ওর কবিতা

আমি পড়েছি, ওর মুখে দু-একটা শুনেওছি। সব মিলিয়ে ওকে সত্যিই কবি বলা যায়।

যেদিকে তাকাই সেদিকেই জ্যোৎস্নার ফিনিক ফুটেছে। জ্যোৎস্নার যে এত তেজ সেটা এরকম একটা অন্ধকার খোলামেলা জায়গায় না এলে বোঝা যেত না। দেখে মনে হচ্ছিল, জ্যোৎস্নার তেজ দিনের আলোর চেয়ে কিছু কম নয়।

সনাতন মাইতি জায়গাটা আমাদের চেনাচ্ছিলেন।

বিশাল একটা খোলা মাঠের মতো। মাঠ যে ঠিক বলা যাচ্ছে না, তার কারণ, মাঠের যেখানে-সেখানে আগাছার ঝোপ আর জঙ্গল। আর কোথাও-কোথাও বড়-বড় গাছ। এবড়োখেবড়ো মাঠের ওপর দিয়ে অনেকটা এগোলে একটা ভাঙাচোরা পোড়ো মন্দির। তার কাছাকাছি বিশাল মাপের একটা পুকুর।

জুতসই একটা জায়গায় গাড়ি রেখে আমরা হেঁটে এগোচ্ছিলাম।

সনাতন বললেন, 'স্যার, পোড়ো মন্দিরের কাছাকাছি পড়ে ছিল ডেডবডিটা—একটা বটগাছের নীচে।'

আমি মাথা নেড়ে 'হুঁ—' বললাম।

আজকের অভিযানে বিশেষ ব্যবস্থা হিসেবে আমি প্রত্যেককে একটা করে হাই-পাওয়ার টর্চ দিয়েছি। আর দিয়েছি একটা করে ছোট পলিপ্যাক—যার মধ্যে রয়েছে শুকনো রসুনের গুঁড়ো আর হিং। এই মিশ্রণের গন্ধ বেশিরভাগ ভ্যাম্পায়ারের কাছে অসহ্য। এই গন্ধে ওরা দূরে সরে যায়।

আমি সবাইকে সাবধান করছিলাম। বলছিলাম যে, এপাশ-ওপাশ ঘুরে বেড়ানোর সময় সবাই যেন খুব কেয়ারফুল থাকেন। কখনও যেন অসাবধান না হন।

সনাতন মাইতি পোড়ো মন্দিরটার ইতিহাস আমাদের বলেছেন। সবটাই ওর নিমাই শেঠের কাছে শোনা। মন্দিরটা নাকি চণ্ডীমায়ের মন্দির। সেভেনটিন্থ সেঞ্চুরিতে হরেরাম ঢালি নামে একজন ডাকাত সর্দার এটা তৈরি করিয়েছিল। তার ছেলের নাম ছিল চন্দন। সে থেকেই এ-এলাকার নাম চন্দনপুর।

আমরা একটু ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিলাম। কৌতূহলী নজরে এদিক-ওদিক দেখছিলাম। হঠাৎই রত্নাকর চাঁদের দিকে আঙুল তুলে আমাকে ডাকল : 'কিরণ, দেখ, দেখ! মনে হচ্ছে, চাঁদটা যেন লালিপপ। ওটার লোভ দেখিয়ে অন্ধকার আমাদের ডাকছে...।'

আমি বললাম, 'এখন কবিতা রাখ। ফিল্ড ইন্সপেক্‌শান চলছে—।'

রত্নাকর আমার কথায় থামল না। বিড়বিড় করে আবৃত্তি করল ঃ

'আঁধার তোমার কোমল অঙ্গসজ্জা,
কালো চোখের তারায় তারায় তারায়—
তোমায় দেখতে চাঁদের ওপিঠে পাড়ি,
তোমারই জন্য ছেড়েছি লাজ ও লজ্জা—'

'ওয়ান্ডারফুল—! কার লেখা কবিতা? আপনার?' পেছন থেকে বলল নিলি। হাততালিও দিল।

আমি পেছনে ঘুরে তাকালাম। রত্নাকরও। লজ্জা মেশানো গলায় ও বলল, 'হ্যাঁ—আমারই বানানো। চাঁদ দেখে লাইনগুলো হঠাৎ মাথায় এসে গেল।'

'ভ্যাম্পায়ার আর কবিতা।' হাসল নিলি। জ্যোৎস্নায় ওর মুখ আবছাভাবে দেখা যাচ্ছিল। একটু থেমে তারপর বলল, 'অদ্ভুত কম্বিনেশান—।'

দেখলাম, নিলি একা নয়। ওর একটু পেছনে রয়েছেন সনাতন মাইতি, আর মিস্টার অ্যান্ড মিসেস নাগ। চন্দনপুরে পৌঁছোনোর পর থেকেই মিসেস নাগ সবসময় স্বামীর ভালো-মন্দ খেয়াল রাখছিলেন।

হাঁটতে-হাঁটতে কখন যেন আমরা পুকুরটার কাছাকাছি পৌঁছে গেছি। ঠিক তখনই আমি একটা গন্ধ পেলাম। ভ্যাম্পায়ারের গন্ধ।

এ-গন্ধ আমি চিনি, জানি। সাধারণ মানুষ একে নাম-না-জানা ফুলের গন্ধ ভেবে ভুল করবে।

আমার বুকের মধ্যে বিগ ড্রাম বাজানোর শব্দ উঠল ঃ গুম-গুম।

সনাতন মাইতির খবরটা তা হলে ঠিক! কিছু একটা এখনও আছে এখানে।

আমি শান্ত থাকার চেষ্টা করলাম। 'স্পট' বলতে যা বোঝায় সেটাকে একবার চোখ বুলিয়ে দেখে নিলাম।

পুকুরটা মাপে বেশ বড়। তার চার দিকের পাড় অনেকটা ঢালু হয়ে গভীরে নেমে গেছে। তারপর জল। পাড়ে দাঁড়িয়ে পুকুরের জলকে কালো কাচের প্লেট বলে মনে হচ্ছে। তাতে গোল চাঁদের ছায়া ফুটেছে। চারপাশে শোনা যাচ্ছে ঝিঁঝির ডাক।

পুকুরপাড়ে অনেক লম্বা-লম্বা গাছ। গাছের আড়ালে হরেরাম ডাকাতের চণ্ডী মন্দির। তার সারা গায়ে বট-অশ্বত্থের চারা। মাথায় বড় মাপের দুটো ত্রিশূল। চাঁদের আলোয় কালচে দেখাচ্ছে।

আমাদের সকলের হাতে টর্চ জ্বলছে। আর আমার পকেটে সতর্কতার বাড়তি ব্যবস্থা হিসেবে আলট্রাভায়োলেট আলোর দুটো স্পেশাল টর্চ আছে। একটা বড়, একটা ছোট আলট্রাভায়োলেট আলো ভ্যাম্পায়ারদের চিহ্ন খুঁজে পেতে কাজে লাগে। এ ছাড়া রুপোর ছুরি আর রসুন-হিঙের প্যাকেট তো আছেই!

আমাকে চারপাশে তাকাতে দেখে নিলি বলল, 'এ-জায়গাটা ভ্যাম্পায়ারদের কাছে ফেভারিট হলে আমি কিন্তু অবাক হব না।'

মিসেস নাগ একটু ভিতু টাইপের। তিনি বললেন, 'আমি না কখনও ভ্যাম্পায়ার দেখিনি। তবে দেখলে বেশ দূর থেকে দেখতে চাই...। সেফ্‌টি আগে, তাই না?'

হৃষ্টপুষ্ট মিস্টার নাগ সিরিয়াস টোনে মন্তব্য করলেন, 'প্রফেসর মিত্রের বইতে পড়েছি, পূর্ণিমার রাতে ভ্যাম্পায়াররা এক্সাইটেড হয়ে পড়ে। তাই তাদের দেখা পাওয়ার পসিবিলিটি বেশি।'

'ওরে বাবা! ওসব কথা মুখে এনো না—।' ভদ্রমহিলা বেশ ভয়ের গলায় বলে উঠলেন, 'তুমি দেখছি একটা বিপদ ডেকে আনবে!'

'এত ভয় পান তো রাতে ফিল্ড করতে এলেন কেন?' নিলি হেসে প্রশ্ন করল।

'কী বলব, বলো। ভয়ও করে, আবার অ্যাডভেঞ্চারের লোভে আসতেও ইচ্ছে করে। তা ছাড়া রাজন যে আসতে বলল...।'

রাজনের কথা নিলি আমার কাছে শুনেছে। তাই ও চুপ করে রইল। একটু পরে বলল, 'হ্যাঁ, প্রফেসর মিত্রের বইতে ব্যাপারটা আমিও পড়েছি।' তারপর আমার দিকে তাকিয়েঃ 'কথাটা নিশ্চয়ই সত্যি?'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ, সত্যি।'

নিলির পায়ে ব্লু জিনস। গায়ে স্কাই ব্লু টপ। গলায় কালো স্কার্ফ। এখন জ্যোৎস্নার আলোয় ওকে অদ্ভুত ছায়া-ছায়া দেখাচ্ছে।

ভ্যাম্পায়ারের গন্ধ নাকে এসেছে। তাই আমি খুব খুঁটিয়ে চারপাশটা দেখছিলাম।

জ্যোৎস্নাভাসি রাত। আকাশে তারাদের সঙ্গে নিয়ে চাঁদ সপরিবারে হাজির। পুকুরপাড়ের একপাশে গাঢ় ছায়া, অন্ধকার। বাকিটা রুপোলি জ্যোৎস্না। এদিক-ওদিক দাঁড়িয়ে থাকা গাছপালাগুলো যেন চুপ করে কোনও কিছুর জন্যে অপেক্ষা করছে।

মিসেস নাগ আমার কাছাকাছি চলে এলেন : 'প্রফেসর মিত্র, একটা ফুলের গন্ধ টের পাচ্ছেন?'

আমি ওঁর দিকে তাকালাম। বাকি সবাইকেও একনজর দেখলাম। জ্যোৎস্নার আলোয় সবার মুখগুলো কেমন বিবর্ণ ফ্যাকাশে দেখাচ্ছিল। ঠিক যেন মরা মানুষের মুখ।

আমি একটু হোঁচট খেয়ে বললাম, 'হ্যাঁ...ইয়ে...মানে একটু-একটু পাচ্ছি—।' আপনারা কিন্তু অ্যালার্ট থাকবেন।

নিলি গুনগুন করে গান গাইছিল। বীরেন নাগ ওকে কী যেন বলছিলেন। কথাগুলো ঠিক বোঝা যাচ্ছিল না। অমিতা নাগ বারবার ঘাড় ঘুরিয়ে স্বামীর দিকে দেখছিলেন। হয়তো নজর রাখছিলেন।

আমি রত্নাকরের দিকে তাকালাম। পুকুরপাড় ধরে হেঁটে যাচ্ছে। খামখেয়ালি পা ফেলছে। মাঝে-মাঝে মুখ তুলে চাঁদের দিকে দেখছে। নাঃ, কবিদের ব্যাপারস্যাপারই আলাদা!

আমি মিস্টার এবং মিসেস নাগকে দেখছিলাম। প্রায় চার বছর ধরে ওঁরা আমার সেমিনারে হাজিরা দেন। আমাদের সোসাইটির মেম্বার হয়েছেন বছর তিনেক। ফিল্ড ট্রিপের অ্যাডভেঞ্চার ওঁরা অপছন্দ করেন না। এর আগে আরও চারবার আমার আর রত্নাকরের সঙ্গে ফিল্ড করতে বেরিয়েছেন। ওঁদের জীবনে আর কোনও এক্সাইটমেন্ট নেই। ছেলে রাজর্ষির মৃত্যুশোক ভুলতে আমাদের সোসাইটিতে নাম লিখিয়েছেন।

আমি ভ্যাম্পায়ারদের সিক্রেটগুলোর কথা ভাবছিলাম। ওদের গন্ধ। এ ছাড়া আলট্রাভায়োলেট আলো ভ্যাম্পায়ারদের বুকের ওপর ফেললে নানারকম রং দেখা যায়। তবে সব ভ্যাম্পায়ারের মধ্যে এই সাইনটা পাওয়া যায় না। তাই কোনও-কোনও সময় ভ্যাম্পায়ার চেনার ব্যাপারটা রিস্কি হয়ে যায়।

আমি এইরকম সব সিক্রেটের কথা ভাবছিলাম। হঠাৎই কে যেন আমার জামা ধরে টান মারল।

চমকে ফিরে তাকিয়ে দেখি নিলি।

'অ্যাই, চলুন না, একটু ভ্যাম্পায়ার খুঁজি—।'

এ কী বিচিত্র প্রস্তাব!

কিন্তু বিচিত্রই-বা কেন? আমরা তো এখানে ভ্যাম্পায়ার নিয়ে খোঁজখবর করতেই এসেছি!

আমি বললাম, 'চলো। তুমি কোথাও ভ্যাম্পায়ারের খোঁজ পেলে?'

'হ্যাঁ, পেলাম। ওই ভাঙা মন্দিরটায়—' আঙুল তুলে মন্দিরটা দেখাল। হাসল।

'তোমার ভয় করবে না তো?'

'মোটেই না। সঙ্গে টর্চ আছে। আর আপনিও তো আছেন!'

মেয়ের সাহস আছে বটে!

লক্ষ করলাম, নাগদম্পতি টর্চ জ্বেলে একটা ঝুপসি বটগাছকে পরীক্ষা করছেন। সেই গাছে ঘুমিয়ে থাকা পাখি আলোর পরশ পেয়ে ডাকাডাকি করে উঠল। তার মধ্যে কাকের গলাও পেলাম।

এদিক-ওদিক তাকিয়ে সনাতন মাইতি কিংবা রত্নাকরকে চোখে পড়ল না।

'বাগানের সেই কেসটা ছাড়া আপনি আর কখনও ভ্যাম্পায়ার দেখেছেন?'

'দেখেছি তো বটেই—শুনেওছি।' আমরা মন্দিরের দিকে পা বাড়ালাম।

'তার মানে! কীভাবে শুনলেন?'

ওকে কি ভয়-দেখানো ফোন-কলের কথা বলব? খুব বলতে ইচ্ছে করছে।

'টেলিফোনে শুনেছি—।'

'কী করে বুঝলেন যে, ওটা ভ্যাম্পায়ারের ভয়েস?'

'ও শুনে বোঝা যায়...।'

নিলি অবাক হয়ে আমার দিকে তাকাল। আমি হাসলাম। টর্চের আলোটা মন্দিরের দরজা লক্ষ্য করে ফেললাম।

পাঁচিলের মধ্যে এক বিশাল ভাঙাচোরা হাঁ। ওটাই বোধহয় দরজা। নিলি টর্চের আলো এদিক-ওদিক ঘোরাচ্ছিল। বলল, 'দেখছেন, মন্দিরটার কী প্যাথেটিক অবস্থা!'

সত্যিই তাই। যেখানে-সেখানে জট পাকানো বটের ঝুরি। ভাঙা পাঁচিলের খাঁজে একটা প্যাঁচা বসে আছে। ওটার জ্বলজ্বলে সবুজ চোখের মণি চকচক করছে। মন্দিরের মেঝেতে গাছের শুকনো পাতা আর ডালপালা। দুটো ইঁদুর কিংবা অন্য কিছু তার ওপর দিয়ে খড়মড় করে ছুটে চলে গেল।

মন্দিরের ভেতর থেকে ভ্যাপসা গন্ধ ভেসে আসছিল। তার সঙ্গে ভ্যাম্পায়ারের গন্ধটা মিশে যাচ্ছিল। তবে রসুন আর হিঙের গন্ধ সেই বিশেষ গন্ধটাকে প্রায় চাপা দিয়ে দিচ্ছিল।

নিলি হঠাৎই পাশ থেকে আমার হাত আঁকড়ে ধরল। বলল, 'এইসব রিসার্চ ছাড়া আপনার লাইফ বলে কিছু নেই?'

হেসে বললাম, 'আমিও তো মনে-মনে এই প্রশ্নটার আনসার খুঁজি—।'

'আপনি আমাকে নিয়ে রিসার্চ করবেন?' নিলি সরে এসে আমার মুখোমুখি দাঁড়াল। খিলখিল করে হেসে বলল, 'আমি কিন্তু ভ্যাম্পায়ারের চেয়েও ইন্টারেস্টিং...। আর এই রিসার্চে আপনাকে দারুণ মোটিভেশান নিয়ে হেল্প করব।'

'তোমাকে নিয়ে রিসার্চ করছি তো।'

আমি নিলিকে অনুভব করতে পারছিলাম। রত্নাকর ঠিকই বলেছে। আমি কখন যেন ব্ল্যাক ম্যাজিক ছেড়ে নিলিকে নিয়ে গবেষণা করতে শুরু করেছি।

নিলি আমার আরো কাছে সরে এল। আমার জামার বুকের কাছটা আচমকা খামচে ধরল। খসখসে গলায় বলল, 'ভ্যাম্পায়ারদের সিক্রেটগুলো আমাকে বলুন। তার এক্সচেঞ্জে আমার সিক্রেটগুলো আপনাকে বলব...।'

বলে দিই ওকে? বলা-না-বলার কিনারায় পৌঁছে গেলাম আমি। ভীষণ বলতে ইচ্ছা করছিল। ও যেন আমাকে হিপনোটাইজ করে ফেলছিল। ওর উষ্ণতায় আমি গলে যাচ্ছিলাম। ওর আঙুল এখন আমার জামার প্রথম বোতামে।

ঠিক তখনই চিৎকারটা শোনা গেল। কাঁপা গলায় সেই দীর্ঘ চিৎকার পূর্ণিমার জমাট জ্যোৎস্নাকে চিরে দিল। কোথায়-না-কোথায় ধাক্কা খেয়ে-খেয়ে সেই শব্দের প্রতিধ্বনির কয়েকটা টুকরো ছড়িয়ে গেল রাতের বাতাসে।

আমি এক ঝটকায় নিলির হাত সরিয়ে দিলাম। তারপর শব্দ লক্ষ্য করে ছুট লাগালাম।

উঁচু-নীচু জমি, গাছপালা, আর আগাছা পেরিয়ে সোজা পুকুরপাড়। পৌঁছে বুঝলাম একটা চাপা গোঙানির আওয়াজ পুকুরের ওপার থেকে ভেসে আসছে। সেখানে দুটো টর্চের আলো নড়াচড়া করছে। কয়েকটা ছায়ার জটলা। তার সঙ্গে উত্তেজিত কথাবার্তা।

আমি সেই জটলা লক্ষ্য করে টর্চের আলো ফেললাম। কিন্তু ভালো করে কিছু দেখা গেল না। তখন চেঁচিয়ে ডেকে উঠলাম, 'রত্নাকর! রত্নাকর! কী হয়েছে?'

'কিরণ, জলদি আয়!' রত্নাকরের গলা।

'প্রফেসর মিত্র, শিগগির আসুন। এখানে ডেঞ্জারাস ব্যাপার হয়েছে!' গলাটা বীরেন নাগের। থরথর করে কাঁপছে : 'আমার ওয়াইফের...আমার ওয়াইফের...।' শেষদিকে গলাটা কান্না-কান্না হয়ে গেল।

পাঁচ-দশ সেকেন্ডের মধ্যেই জটলার কাছে পৌঁছে গেলাম। টর্চের

আলো ফেললাম।

বীরেন নাগ অসহায় শিশুর মতো মাটিতে বসে রয়েছেন। অমিতা নাগের শরীরের অর্ধেকটা ওঁর কোলের ওপরে। অমিতা নাগের গলায় রক্তের দাগ। দুটো পাশাপাশি লাল কাচপোকা টিপ। ভদ্রমহিলা ভয়ে চোখ বুজে রয়েছেন, গুঙিয়ে চলেছেন। আর একইসঙ্গে ঝাঁকুনি দিয়ে কেঁপে উঠছেন।

ওঁদের দুজনের ওপরে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে রত্নাকর আর সনাতন মাইতি। দুজনেই খুব এক্সাইটেড।

আমি বসে পড়লাম অমিতা নাগের মাথার কাছে। টর্চের আলো জ্বেলে ক্ষতচিহ্নটা পরীক্ষা করলাম।

না, ক্ষতচিহ্নটা গভীর নয়। ভ্যাম্পায়ারটা সবে ওঁকে অ্যাটাক করেছিল—কাজ সারতে পারেনি। অমিতা নাগ যত না আহত হয়েছেন তার চেয়ে শক পেয়েছেন অনেক বেশি।

বীরেন নাগ কাঁপা গলায় বললেন, 'এত রক্ত! এত রক্ত!' ওঁর গলায় ভয়। মনে হল এখুনি কেঁদে ফেলবেন।

ভ্যাম্পায়ারের গন্ধটা এবার উগ্রভাবে নাকে এল।

আমি চারপাশে তাকালাম। টর্চের আলো ফেললাম। কোথায়? কোথায়?

একটু ধাতস্থ হয়ে বীরেন নাগ উত্তেজিতভাবে ঘটনাটা আমাদের বোঝাতে চাইলেন। ওঁরা দুজনে ঘুরে-ঘুরে জায়গাটা দেখছিলেন। তরুণ বয়েসের জ্যোৎস্নারাতের প্রেমের কথা মনে পড়ছিল। মিসেস নাগের বয়েস কমে যাচ্ছিল। তিনি অনেকটা নাচের ভঙ্গিতে তাড়াতাড়ি পা ফেলছিলেন। এইভাবে তিনি পাশাপাশি দাঁড়িয়ে থাকা একজোড়া গাছের আড়ালে চলে যান। ঠিক তখনই একটা কালো ছায়া ভুখা নেকড়ের মতো ওঁর ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ওঁকে এক ধাক্কায় মাটিতে পেড়ে ফেলে গলা কামড়ে ধরে। কপাল ভালো যে, তিনি চিৎকার করতে পেরেছিলেন। তাতেই কাছাকাছি যাঁরা ছিলের তাঁরা চটপট ছুটে আসেন।

একটা ভয়ের ছায়া নেমে এল সবার ওপরে। সনাতন মাইতি বললেন, 'আমি ভাবতাম, ভ্যাম্পায়ার ব্যাপারটা আসলে বোধহয় মিথ—মানে কিংবদন্তী গোছের...। চলুন, আমরা ফিরে যাই—।'

আমি রুক্ষভাবে বললাম, 'আপনি কেন এরকম ভাবতেন জানি না। আর ওরকম ভাবতেন বলেই কি "ব্ল্যাক ম্যাজিক রিসার্চ সোসাইটি"-র মেম্বার হয়েছিলেন?'

উত্তরে সনাতন মাইতি বিড়বিড় করে কী যেন বললেন। ওঁর মুখটা ছায়ায় ঢেকে গিয়েছিল।

মিসেস নাগকে ধাতস্থ করে বীরেন নাগ উঠে দাঁড়ালেন। পকেট থেকে রুমাল বের করে স্ত্রীর গলার ক্ষতের রক্ত মুছে দিলেন। তারপর স্ত্রীকে ধীরে-ধীরে দাঁড় করিয়ে আমাকে লক্ষ্য করে বললেন, 'চলুন, চলুন—আমার ভয় করছে!'

আমি শান্তভাবে বললাম, 'মিস্টার নাগ, আপনাদের ভয়টা মিথ্যে নয়। কিন্তু আমি তো আছি! রত্নাকরও আছে। আমাদের মানতেই হবে, এবারের ট্রিপটা কিছুটা সাকসেসফুল। কারণ, আমরা ডায়রেক্ট প্রুফ পেয়েছি। আমি আমার সেকেন্ড বইটায় প্লেইন অ্যান্ড সিম্প্‌ল ল্যাঙ্গুয়েজে লিখেছি : তেষ্টা পেলে ভ্যাম্পায়াররা পাগল হয়ে যায়। বিশেষ করে ফুল মুনের সময়। ওরা তখন যে-কোনওরকম রিস্ক নেয়। তবে বললাম তো, আপনাদের কোনও ভয় নেই—যতক্ষণ আমি আর রত্নাকর চৌধুরী আছি—' রত্নাকরের দিকে ফিরে তাকালাম : 'রত্নাকর, হোয়াট ডু য়ু সে?'

রত্নাকর আপসেট গলায় বলল, 'আমি তো...তোর পেছনে আছি—।'

মিস্টার ও মিসেস নাগ তবুও ইতস্তত করতে লাগলেন।

হঠাৎ নিলির কথা মনে পড়ল। এতক্ষণ ওর কথা খেয়াল হয়নি। এখন এপাশ-ওপাশ তাকালাম, কিন্তু ওকে দেখতে পেলাম না।

কোথায় গেল মেয়েটা? ওই ভাঙা মন্দিরের ভেতরে ঢুকে পড়ল না তো!

আমার চোখ যখন ওকে এদিক-ওদিক তাকিয়ে খুঁজছে তখনই হঠাৎ ওকে দেখতে পেলাম।

বেশ খানিকটা দূরে একটা গাছের পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ওর চোখে-মুখে চাঁদের আলো। জ্যোৎস্নায় চোখ চিকচিক করছে বলে মনে হল।

ও আমাদের কাছে এগিয়ে এল না। দূর থেকেই চেঁচিয়ে ডাকল আমাকে, 'প্রফেসর মিত্র, চলুন ভাঙা মন্দিরটার দিকে যাই। জায়গাটা খুঁজে দেখি। ওখানে কিছু লুকিয়ে থাকতে পারে...।'

আমার মনে হল, নিলি নির্জনতা খুঁজছে। আমাদের অসমাপ্ত কাজটা শেষ করতে চাইছে।

ওর ডাকে একটা অদ্ভুত টান ছিল। সেটা আমি কিছুতেই এড়াতে পারলাম না।

রত্নাকর আমার দিকে কিছুক্ষণ অপলকে তাকিয়ে রইল। তারপর হাল

ছেড়ে দেওয়া গলায় বলল, 'ঠিক আছে, তোরা ওদিকটা দেখ। আমি এপাশটা দেখছি...। কোথায় যেতে পারে শয়তানটা?' ওর গলায় বেশ উত্তেজনা।

বীরেন নাগ আর অমিতা নাগ গাড়ির দিকে হাঁটা দিয়েছিলেন। সনাতন মাইতি আমার কাছে এসে বললেন, 'আমি কি আপনাদের সার্চ পার্টিতে থাকব?'

'যদি সাহস থাকে তা হলে নিশ্চয়ই থাকতে পারেন। নইলে শুধু-শুধু একটা মিথের পেছনে...।'

আমার কথার খোঁচায় ওঁর বোধহয় আঁতে ঘা লাগল। বললেন, 'প্রফেসর মিত্র, আমার বয়েস হয়েছে। শরীর ক্ষয়ে গেছে। তবে সাহস কিন্তু খুব একটা ক্ষয়ে যায়নি। তা ছাড়া মিথটা যে সত্যি তা তো বলতে গেলে দেখতেই পেলাম।' একটু চুপ করে থেকে আরও বললেন, 'জানেন, আমার ভয় পাওয়ার কোনও মানে হয় না। সংসারে কে-ই বা আছে! আর ক'দিনই বা বাঁচব!'

আমি ওকে নজর করে দেখলাম। বয়েস হলেও শরীরটা এখনও সোজা।

আমাদের চারজনের হাতে টর্চ। দুটো জ্বলছে, দুটো নেভানো। টর্চের আলো আমাদের শরীরে ধাক্কা খেয়ে ঠিকরে পড়ছে আমাদেরই মুখে। জ্যোৎস্নার আলোর সঙ্গে টর্চের আলোর আভা মিশে গেছে। দূর থেকে শেয়ালের ডাক কানে এল।

নিলি আবার ডাকল আমাকে : 'কই, আসুন—?'

আমি নিলির দিকে এগোলাম। রত্নাকর আর সনাতন মাইতি পেছনে পড়ে রইল।

নিলির কাছে গিয়ে দেখি ও কেমন অস্বাভাবিকভাবে ছটফট করছে। গুনগুন করে গান গাইছে।

ও হঠাৎই আমার দিকে মুখ তুলে তাকাল : 'জ্যোৎস্নার আলো অনেক কিছু বদলে দেয়। নেচারের চেহারা বদলে দেয়। আমাদের মন বদলে দেয়। তার সঙ্গে মানুষ বদলে যায়...।'

আমি হেসে যোগ করলাম, 'ভ্যাম্পায়াররাও বদলায়...।'

'কীভাবে?'

আমি ওর হাত আঁকড়ে ধরলাম : 'বলা যাবে না। সিক্রেট...।'

ওর হাতটা বেশ ঠান্ডা লাগছিল। আমি জিগ্যেস করলাম, 'তুমি কোথায় হারিয়ে গিয়েছিলে? আমি চিন্তায় পড়ে গিয়েছিলাম...।'

ও হেসে বলল, 'চিন্তার কী আছে! আমি মন্দিরের ভেতরে গিয়েছিলাম। ভেতরটা খুব ইন্টারেস্টিং...।'

আমরা মন্দিরের কাছে এসে পড়েছি। চারপাশে চোখ বোলাতে-বোলাতে নিলি বলল, 'আপনি কেন যে এত রিস্‌ক নেন!' ঠোঁট ওলটাল ও ঃ ভ্যাম্পায়ারদের সিক্রেট জানাটাও যে ডেঞ্জারাস সেটা বোঝেন না?'

'বুঝি। কিন্তু এই রিসার্চ আমি বন্ধ করতে পারব না। এটা আমার, বলতে পারো, একরকম মিশন...।'

আমরা ভাঙা মন্দিরে ঢুকে পড়েছি। আবার সেই ভ্যাপসা গন্ধ। তার সঙ্গে মিশে আছে নাম-না-জানা ফুলের গন্ধ। ভাঙা পাঁচিলে অনেকটা জ্যোৎস্না লেপটে আছে। তার পাশেই অন্ধকার। অন্ধকারে আবার চোখে পড়ল সবুজ চোখ। প্যাঁচা।

নিলি আমার কাছে সরে এল। ওর হাতের টর্চটা নিভিয়ে দিল। ওটা খসে পড়ল শুকনো পাতার ওপরে। ওর হাতের আঙুল আমার গলার কাছে বিলি কাটতে লাগল।

ও প্রায় ফিসফিস করে বলল, 'সত্যি বলছি, আমি ভ্যাম্পায়ারের চেয়েও ইন্টারেস্টিং। তাই ভ্যাম্পায়ারের সিক্রেটগুলো আমাকে এখন বলতে পারেন...।'

ওর কথা আমাকে হিপনোটাইজ করে দিচ্ছিল। আগে কখনও এরকম হয়নি। আমি ওকে সবকিছু উজার করে বলতে চাইছিলাম। বলতে চাওয়া কথার ফোয়ারা আমার ভেতরে উথলে উঠছিল।

অন্ধকারে আমার জামার বোতাম খুলে যাচ্ছিল। আমার আঙুলও আর আমার বশে রইল না। কাঁকড়াবিছের দাঁড়া হয়ে সড়সড় করে নিলির টপের বোতামে পৌঁছে গেল।

নিলির নিশ্বাস আমার গালে পড়ছিল। আমি চোখ বুজে ফেললাম। অচেনা ফুলের গন্ধ আমাকে মাতাল করে দিচ্ছিল।

হঠাৎই নিলি ফিসফিস করে বলল, 'তুমি তোমার ভ্যাম্পায়ার রিসার্চ থামাও, প্রফেসর...।'

আমি তাজ্জব হয়ে গেলাম। নিলি এ-কথা বলছে!

'কেন, থামাব কেন?' ওর মুখটা দেখতে চাইলাম আমি। কোন নিলি এসব কথা বলছে?

টর্চের আলো ফেললাম ওর মুখে।

সেই একইরকম মুখ। সরলতা আর প্রগলভতা মাখানো। তারুণ্যে টগবগে,

উজ্জ্বল। শুধু চোখ দুটো মরা মাছের মতো।

ওর গলার স্কার্ফের দিকে চোখ গেল আমার। এ কী! স্কার্ফের কিনারায় টাটকা রক্তের দাগ। আমি চট করে হাত বাড়িয়ে স্কার্ফটা টেনে সরালাম।

পুরোনো ক্ষতচিহ্ন এখন দগদগে, নতুন।

আমি ওকে ঝাঁকুনি দিয়ে বললাম, 'নিলি, কী হয়েছে? কী হয়েছে তোমার?'

চাপা ফিসফিসে গলায় ও বলল, 'প্রফেসর, সুতীর্থর সঙ্গে আমার একটু আগে দেখা হয়েছে। মন্দিরের পেছনে...।'

আমার হাত থেকে জ্বলন্ত টর্চ খসে পড়ে গেল। ওটার আলো দুবার দোল খেয়েই নিভে গেল।

অন্ধকার। শুধু অন্ধকার।

'সুতীর্থরা ওদের কাজ শেষ করেছে, প্রফেসর আলোকিরণ মিত্র। আমি...আমি এখন ওদের দিকে চলে গেছি...।'

নিলির চোখের তারায় দুটো উজ্জ্বল লাল আলোর বিন্দু ফুটে উঠল। ঠিক যেন দুটো জ্বলন্ত ধূপকাঠির আগুন।

চৈতন্যের ছুরি ঝলসে উঠল আমার ভেতরে। অন্ধকারে হাতে চটপট পকেট থেকে ছোট আলট্রাভায়োলেট টর্চটা বের করে নিলাম।

নিলির আধখোলা বুকের ওপরে ইউ-ভি টর্চের আলো ফেললাম। রঙিন আলোর টুকরো ওর ফরসা বুকে ক্যালাইডোস্কোপের ছবি তৈরি করেছে। ছবিটা ক্রমাগত রং পালটাচ্ছে, নকশা বদলে যাচ্ছে।

ঠিকরে পড়া আলোয় নিলির দাঁত দেখা গেল। শ্বদন্ত দুটো এখন কত লম্বা! লালা মাখানো। ঝকঝক করছে।

নিলি হাসল, বলল, 'বুড়ো খোকা, ওই আলট্রাভায়োলেট আলোয় আমাদের কিছু হয় না, জানো না?'

ও আমাকে জাপটে ধরল। আমার গলার বাঁ-দিকে ওর ঠোঁট নেমে এল। টের পেলাম, কেউ যেন গলায় পিন ফোটাতে চাইছে।

আমার হাত থেকে দু-নম্বর টর্চটা পড়ে গেল। মরিয়া ডানহাত ঢুকে গেল পকেটে। বেরিয়ে এল রুপোর ধারালো ছুরি।

তারপর বাঁ-হাতে নিলিকে জোরে আঁকড়ে ধরলাম। ডানহাতে শক্ত করে ধরা ছুরির বাঁট। নিলির বুকের বাঁ-দিক আন্দাজ করে ছুরি গেঁথে দিলাম। একবার। দুবার।

পিশাচী ডুকরে কেঁদে উঠল। তীক্ষ্ণ কাঁপা গলায় সুর করে মরণডাক ভাসিয়ে দিল বাতাসে।

ভাঙা মন্দির থেকে একটা প্যাঁচা কর্কশ গলায় ডেকে ছিটকে উড়ে গেল। ঝিঁঝির ডাক থেমে গেল ক্ষণিকের জন্যে। আমার মনে পড়ল মায়ের কথা।

নিলির দেহ খসে পড়ে গিয়েছিল শুকনো পাতার ওপরে। ওর পা আমার পা ছুঁয়ে যাচ্ছে। টের পাচ্ছি ও ছটফট করছে। নড়ছে।

আমি উবু হয়ে বসে পড়লাম। অন্ধকারে হাতড়ে আলট্রাভায়োলেট টর্চটা খুঁজে পেলাম। ওটার আলো ফেললাম নিলির ওপরে। এবং সঙ্গে-সঙ্গে লাফিয়ে পিছিয়ে এলাম। কোনওরকমে উঠে দাঁড়ালাম।

নিলির শরীরটা অদ্ভুতভাবে বেঁকেচুরে ছটফট করছে। বিশাল হাঁ করে ও শুধু নাভিশ্বাস টানছে। রুপোর ছুরিটা ওর বুকে গেঁথে আছে। সেটা ঘিরে কালচে ভেজা দাগ।

আমি জানি, ওর দেহটা এখন ধীরে-ধীরে কুঁকড়ে যাবে। তারপর ছোট হতে-হতে একসময় পড়ে থাকবে শুধু কালো ছাই।

ওর জন্যে আমার কষ্ট হচ্ছিল। ওকে খুব মিস করব।

হঠাৎই একটা কথা মনে হওয়াতে আমি যেন ইলেকট্রিক শক খেলাম।

মিসেস নাগকে যখন ভ্যাম্পায়ার অ্যাটাক করে তখন তো নিলি আমার কাছে ছিল! কোনও ভ্যাম্পায়ারের পক্ষে একই সময়ে দু-জায়গায় হাজির থাকা অসম্ভব! তা হলে? তা হলে কি একের বেশি ভ্যাম্পায়ার এই জ্যোৎস্না রাতে এখানে এসে হাজির হয়েছে? সুতীর্থ, এবং অন্যান্যরা?

আমার প্রশ্নের উত্তরে মন্দিরের খোলা মুখের কাছে একটা ছায়া এসে দাঁড়াল। তার পেছনে সাবলীল জ্যোৎস্না। চারপাশে বট-অশ্বত্থের ঝুরি। সঙ্গে ঝিঁঝির ডাকের সাউন্ড এফেক্ট।

সেই ছায়াটা পায়ে-পায়ে আমার দিকে এগিয়ে এল। তারপর কোরাস গলায় বলল, 'আমরা একা নই। আমরা অনেক। আমাদের নিয়ে কেউ গবেষণা করুক আমরা চাই না। আমরা শান্তিতে থাকতে চাই। শান্তিতে বাঁচতে চাই। আমরা...।'

আরও কাছে এগিয়ে এল ছায়াটা। নাম-না-জানা ফুলের মিষ্টি গন্ধ আমার নাকে এল।

'কিরণ! আমার ভ্যাম্পায়ার ক্যাটিগরি অন্যরকম। তোমাকে বহুবার বারণ করেছি, কিন্তু তুমি শোনোনি। তোকে বলেছি, এই বিপজ্জনক গবেষণা তুই

বন্ধ কর, কিন্তু তুই সে-কথা শুনলে তো! তোমাকে এত ভালোবাসি, অথচ আমার আর কোনও পথ নেই...।'

ছায়াটাকে আমি চিনতে পারলাম।

রত্নাকর। অথচ সিগারেটের চেনা গন্ধটা টের পেলাম না।

কিন্তু ও এভাবে কথা বলছে কেন? একবার 'তুমি' করে বলছে, আর একবার 'তুই-তুই' করে?

ওর কোরাস গলা আমার শরীরে ঠান্ডা স্রোত বইয়ে দিল।

আমি অবাক হয়ে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। কোনওরকমে জিগ্যেস করলাম, 'তো- তোর কী হয়েছে, রত্নাকর? এরকম করে ক-কথা বলছিস কেন?'

রত্নাকর হাসল। বলল, 'চল, তোকে একটা জিনিস দেখাই। এসো, আমার সঙ্গে এসো...।' বলে ও মন্দিরের বাইরের দিক লক্ষ্য করে হাঁটা দিল।

আমি চট করে নীচু হলাম। কালো ছাইয়ের মধ্যে থেকে রুপোর ছুরিটা তুলে নিলাম।

রত্নাকর পেছন ফিরে তাকাল। ছোট্ট শব্দ করে হাসল : 'আয়...তাড়াতাড়ি আয়...।'

আমি কিছু বুঝতে পারছিলাম না। আমার মন ধাঁধিয়ে যাচ্ছিল।

নিশি পাওয়া মানুষের মতো রত্নাকরকে অনুসরণ করলাম।

মন্দিরের বাইরে আসতেই জ্যোৎস্নার আলো সারা গায়ে মাখামাখি হয়ে গেল। চারপাশটা বলতে গেলে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল।

রত্নাকর বলল, 'এদিকে এসো। দেখ, কে পড়ে আছে এখানে...।'

কাছে গিয়ে দেখলাম। গাছ-পাতার ওপরে একটা মানুষ চিত হয়ে পড়ে আছে।

রত্নাকর ওর হাতের টর্চ জ্বালল। ফেলল পড়ে থাকা শরীরটার ওপরে।

আমিও আলট্রাভায়োলেট আলোর টর্চ জ্বেলে সেদিকে তাক করলাম।

চমকে উঠলাম। হাই ভোল্টেজ শকে কেঁপে উঠল আমার শরীর।

মাটিতে যে পড়ে আছে সেই লোকটা রত্নাকর! ওর গলা রক্তে মাখামাখি।

আমি স্তম্ভিত হয়ে দুটো রত্নাকরকে দেখতে লাগলাম।

কে আসল? কে নকল?

নাকি এই দুজন রত্নাকর অবিকল দেখতে যমজ ভাই?

আমি ভয় পেলাম। আকাশের চাঁদ, ফুটফুটে জ্যোৎস্না, ছায়া-ছায়া গাছপালা

আমার ভয়ের সাক্ষী থাকল।

প্রথম রত্নাকর আমার মুখোমুখি ঘুরে দাঁড়াল। সঙ্গে-সঙ্গে বিপদের গন্ধ পেয়ে রুপোর ছুরিটা উঁচিয়ে ধরলাম আমি।

'গাধা কোথাকার!' বলেই ওর হাতের টর্চ দিয়ে আমার ছুরি ধরা হাতে প্রচণ্ড জোরে বাড়ি মারল রত্নাকর। আমার ছুরি ছিটকে পড়ল অন্ধকারে। তখন ও হেসে বলল, 'এবার থেকে জেনে রাখো, রুপোর ছুরিতে শেপ শিফ্‌টাদের কিছু হয় না। বহুরূপী ভ্যাম্পায়ারদের সম্পর্কে কতটুকু জানো তুমি, হুঁ?'

তাচ্ছিল্যের ঢঙে বলা শেষ কথাগুলো শেষ হতে না হতেই একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটল।

রত্নাকর আমার চোখের সামনে বদলাতে লাগল। যেভাবে হাতের চাপে একতাল নরম মাটির চেহারা বদলানো যায়, ঠিক সেইভাবে একজোড়া অদৃশ্য হাত রত্নাকরকে বদলাতে লাগল।

কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই রত্নাকর বদলে গিয়ে লাজবন্তী হয়ে গেল।

আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। আমার অবশ হাত থেকে ছোট ইউ-ভি টর্চ পড়ে গেল, নিভে গেল। ঠান্ডা স্রোতটা শিরদাঁড়া থেকে ছুটে এল মাথার মধ্যে। সেখান থেকে ছড়িয়ে গেল আমার স্নায়ুতন্ত্রে।

এবার বুঝতে পারলাম, 'তুই-তুই' আর 'তুমি'-র রহস্য।

হঠাৎ জোরে বাতাস বইল। লাজবন্তীর এলো চুল উড়তে লাগল। অন্ধকারে কোথায় যেন প্যাঁচা ডেকে উঠল।

'লাজো! লাজো!' আমার মুখ দিয়ে অজান্তেই বেরিয়ে এল আমার এককালের প্রিয়তম শব্দটা।

'কিরণ, তোমাকে আমি পাগলের মতো ভালোবেসে ফেলেছি। তুমি তো জানো না, ভ্যাম্পায়ারদের ভালোবাসা কত ইনটেন্‌স হয়। আমি তোমাকে সবসময় চেয়েছি। তোমার কাছে থাকতে চেয়েছি, তোমার পাশে থাকতে চেয়েছি। কতদিন রত্নাকরের চেহারায় তোমার বাড়ির আশেপাশে সন্ধের পর ঘুরে বেরিয়েছি।

'আজ সব টানাপোড়েন শেষ। তোমাকে এখন আমার দিকে...আমাদের দিকে টেনে নেব। শেষ কাজটা আমাকেই করতে হবে...আমাকেই...।' রত্নাকর অথবা লাজবন্তী ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। কান্না-ভাঙা গলায় বলল, 'আমার আর কোনও পথ নেই গো! পথের একেবারে শেষে আমি দাঁড়িয়ে আছি...।'

হাতের পিঠ দিয়ে ঘষে-ঘষে চোখ মুছল লাজবন্তী। তারপর হাঁ করল। ওর মুখের গুহায় লালচে আলোর আভা—টর্চ লাইট জ্বেলে কারও গালে চেপে ধরলে যেমন হয়। সেই আভায় ওর সুদীর্ঘ ছুঁচলো দাঁত দুটোয় যেন আগুন জ্বলছে।

আমার হাতে রুপোর ছুরি নেই। একটা আলট্রাভায়োলেট টর্চ মাটিতে পড়ে অকারণে জ্বলছে।

হঠাৎই বাতাসের ঝাপটা কোথা থেকে ছুটে এল। গাছের শুকনো পাতা জ্যোৎস্নায় উড়তে লাগল।

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর লাজো কোরাস গলায় বলল,

'আমার কোনও নাম নেই, আমাদের কোনও নাম নেই—
তবু আমরা ছিলাম, আছি, থাকব।'

আমাকে অবাক করে আমার প্রিয়জনের শ্বদন্ত আমার গলায় বসে গেল।